আকর্ষণ

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

পরিবেশক
নাথ ব্রাদার্স ।। ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

AKARSHAN

Nath Publishing
26B Panditia Place
Calcutta 700 029

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ১৯৬৪

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০ ০২৯

মুদ্রক
কাজল ভাওয়াল
ডায়নামিক প্রিন্টার্স
২৪এ বাগমারী রোড
কলকাতা ৭০০ ০৫৪

প্রচ্ছদশিল্পী
সুধীর মৈত্র

একেবারে আচমকাই ঘুম ভেঙে গেলো রূপসার।

এমন হঠাৎ করে ঘুম ভাঙলে শরীর ও মনে কিছু কিছু তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হয়। কখনও মনে প্রশ্ন জাগে, এ কোথায় শুয়ে আছি আমি? এটা কি আমারই সেই চেনা ঘর? আমারই বিছানা? তাহলে জানলাটা ঘরের ডান দিক থেকে বাঁ দিকে চলে গেলো কি করে? ড্রেসিং টেবিলটাই বা ওখানে কেন? এমনতরো অসংখ্য প্রহেলিকা তখন কয়েক মুহূর্তের জন্যে বিবশ করে রাখে চেতনাকে। মন বিহ্বল হয়ে ওঠে, মস্তিষ্ক সঠিকভাবে সক্রিয় হয় না, বুকের ভেতরটা কেমন যেন শূন্য বলে মনে হয়। ভীষণ অসহায় লাগে নিজেকে। তারপর আস্তে আস্তে সবকিছু আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়, বাস্তবের পারিপার্শ্বিকতা ঘা মেরে মেরে সজাগ করে তোলে অনুভূতিগুলোকে। তখন হাসি পায়। ভীষণ বোকা বলে মনে হয় নিজেকে।

এ ছাড়া আর যা হয়, সেগুলো মোটামুটিভাবে শারীরিক। কখনও সমস্ত কপাল জুড়ে দপদপে যন্ত্রণা, মুখের ভেতরটা তেতো বা বিস্বাদ। আবার কখনও মনে হয়, হৃৎপিণ্ডটা যেন রেসের ঘোড়ার মতো ছুটে চলেছে দুর্বার গতিতে এবং ওই প্রচণ্ড গতির সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে তার চলার ক্ষমতাটাই ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে, ফুরিয়ে যাচ্ছে অতি দ্রুত, এগিয়ে চলেছে অনিবার্য এক নিষ্ক্রিয় অবসন্নতার দিকে।

রূপসার কিন্তু এসব কিছুই হয়নি। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাবার পর ওর শুধু মনে হয়েছে, টেলিফোনটা বাজছিলো। বাজছিলো অনেকক্ষণ ধরে। এখন থেমে গেছে। কিন্তু পাতার আড়াল থেকে ভেসে আসা ঘুঘুর ডাকের মতো এখনও তার রেশটুকু রয়ে গেছে ঘরের আনাচে কানাচে। লেগে রয়েছে জানলা দরজার পর্দায়, বেড লাইটের অবগুণ্ঠিত নীলাভ আলোয় আর টাইমপিস ঘড়িটার সেকেণ্ডের কাঁটায়।

ঘড়ির দিকে তাকালো রূপসা। সাড়ে চারটে। কে টেলিফোন করবে এতো ভোরে? অনুভব? কি এমন খবর থাকতে পারে তার, যা জানাবার জন্যে আর সামান্য কয়েকটা ঘন্টা অপেক্ষা করা যায় না? নেই, থাকতে পারে না তেমন কোনো খবর। থাকলেও, অনুভব অপেক্ষা করবে। অপেক্ষা করবে ঠিক ততোটা সময়, যতোটা অতিবাহিত হলে দৃষ্টিকটু হবার কোনো আশঙ্কা থাকবে না। কেননা অনুভব পাগল নয়, সে পাগল হতে জানে না। তবে কি সোনালি কিংবা তুহিন? গড়িয়া থেকে মা বা বাপি টেলিফোন করেনি তো? এমনও তো হতে পারে যে ওঁদের কারুর শরীর খারাপ, এই মুহূর্তে রূপসাকে ওঁদের খুব প্রয়োজন?

নিজের অজান্তেই বুকটা ধক করে ওঠে রূপসার। পরক্ষণেই ওর মনে হয়, টেলিফোন নয়—ডোরবেল। ওটা ডোরবেলের আওয়াজ ছিলো। কিন্তু তাহলে এতোক্ষণেও ওটা ফের একবার বাজলো না কেন? বাজেনি তার কারণ, কেউ ওটা বাজায়নি। আসলে গোটা ব্যাপারটাই মনের ভুল। কিংবা কল্পনা।

এতোক্ষণে আশ্বস্ত হলো রূপসা।

মাথার ওপরে সিলিং ফ্যানটা ঘুরে চলেছে পূর্ণগতিতে। অক্লান্ত। কিন্তু একঘেয়ে। অস্পষ্ট একটা যান্ত্রিক আওয়াজ পাক খেয়ে খেয়ে মাথা ঠুকছে সারা ঘরে। দেয়ালে ঝোলানো বিদেশী ক্যালেণ্ডারটা তবু অনড়। গায়ে বাতাস যেন লাগছেই না। মুখ, শুধু মুখ কেন, সমস্ত শরীর জুড়ে শুধু চিটপিটে ঘামের অন্তরঙ্গ নৈকট্য। ক্লান্তি। ক্লান্তি আর বিরক্তি।

ক্লান্তি কেন রূপসা? গত কয়েকটা ঘন্টা তুমি তো না ঘুমিয়ে কাটাওনি! পরিশ্রমই বা করলে কোথায় যে ক্লান্তি আসবে? তবে কি বিরক্তি? এতো সহজে?

মোটেই না। ইটস নট দ্যাট ইজি।

কিন্তু কতোদিন, আর কতোদিন এভাবে কাটবে? আরও কতো দিন?

জানি না, আমি জানি না, সত্যিই আমি তা জানি না।

এখুনি একবার বাথরুমে যাওয়া দরকার। খাট থেকে নেমে এক পায়ের চটি খুঁজে পেলো না রূপসা। উবু হয়ে বসে খাটের নিচে তাকালো ও। ঠিক তাই। নীলাভ আলোর আবছা অন্ধকার গায়ে মেখে ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় পড়ে রয়েছে নিঃসঙ্গ চটিটা। এবারে হয় হামা দিয়ে খাটের তলায় গিয়ে ঢোকো, নয়তো ঝাঁটা-লাঠির খোঁজে এ ঘর-ও ঘরে ছুটোছুটি করো। হয়তো কখন অন্যমনস্ক পায়ের ধাক্কায় ওখানে পৌঁছে গেছে চটিটা, তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে অপেক্ষা করছে কখন তার খোঁজ পড়বে। চটিটার প্রাণ থাকলে কি করতো এখন? হাসতো মিটিমিটি? রূপসা জানে, অন্যমনস্কতা নয়—আসলে এটা সুদূরের কাজ। মেজাজ ভালো থাকলে কখনও সখনও ওর সঙ্গে এমনি খুনসুটি করতে ভালোবাসে মানুষটা, যা এখন প্রায় দুর্লভ। হয়তো তেমনি কোনো মুহূর্ত এসেছিলো মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে। এসেছিলো এবং চলে গেছে, কিন্তু রূপসা তা জানতে পারেনি। জানলেই বা কি হতো? কিংবা হয়তো আসেনি, হয়তো সবটাই রূপসাব কল্পনা। কল্পনা দিয়ে ছোটো ছোটো সুখের জাল বোনা। অহেতুক। অর্থহীন। জাগলারি।

বেসিনের কল খুলে চোখে মুখে ভালো করে জল দেয় রূপসা। আহা কি শান্তি, কি তৃপ্তি! আরশির দিকে তাকায় ও। স্টেপস করা এলোমেলো চুল, প্রায় ধূসর রঙের উদভ্রান্ত দুটি চোখ, পুরুষ্টু ঠোঁট। এতোটুকু মালিনা কি লেগে আছে কোথাও? অথবা কোনো গ্লানি? এতো সহজে! না, কিছুতেই না। হার মানার আগে আমি আরও দুরন্ত হয়ে উঠবো, ঝড় হয়ে বয়ে যাবো পর্বতে সমুদ্রে। তাতেও কি তুমি জাগবে না নিষ্ঠুর?

মুখে জলের স্পর্শ লেগে সাহারা হয়ে উঠেছে গোটা শরীর। স্নানঘরে ঢুকে ঘামে ভেজা রাত্রিবাস ছেড়ে, শাওয়ারের নবটা পুরোপুরি ঘুরিয়ে দেয় রূপসা। মুহূর্তের ব্যবধানে ঠাণ্ডা জলের কোমল ধারা ছড়িয়ে পড়ে ওর সর্বাঙ্গে। ঈষৎ আনত পুরুষ্টু দুটি স্তন, উরু, জঙ্ঘা, আর গোপন ত্রিকোণে। তারপর নরম তোয়ালের মৃদু সোহাগ। গা মুছে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে অনাবৃতা নারী। নতুন আবরণে শরীর আড়াল করার আগে ড্রেসিং টেবিলের কাছে গিয়ে সুগন্ধি পাউডার ছড়িয়ে দেয় দেহের আনাচে কানাচে। তারপর ক্ষণিকের অবকাশে যেন আবিষ্ট হয়ে তাকিয়ে থাকে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে।

এতো ঐশ্বর্য তোমার, রূপসা! একে তুমি বৃথা বঞ্চিত করে রাখবে? যা হয় না, যা হবে না, যা হবার নয় তা নিয়ে এখনও তোমার এতো আকুলতা? কেন? কিসের দায় তোমার? তুমি তো চেষ্টার কোনো ত্রুটি করোনি। তবে? তবে কেন মিথ্যে এই পিছুটান। বিবেক? শোনো রূপসা, বিবেকের অন্য নাম—প্রচলিত কিছু ধারণা, আরোপিত কিছু নিয়ম আর অর্থহীন কিছু সংস্কার। এখনও সময় আছে। এর পরে নিজেকে ছাড়া আর কাউকে তুমি দোষারোপ করতে পারবে না। এখনও সুযোগ আছে, এখনও সময় আছে তোমার।

বিছানার দিকে অপাঙ্গে তাকায় রূপসা। দেয়ার হি লাইজ। স্লিপিং লাইক আ চাইল্ড। শিশুর মতো। ঠিক যেন একটা শিশু। অথচ টল ফেয়ার অ্যাণ্ড হ্যাণ্ডসাম। যেমনটি ও চেয়েছিলো। যাকে চেয়েছিলো। সে। সেই মানুষটা। সবাই বলেছিলো, আ ইউনিক ম্যাচ। বিজ্ঞাপনের ভাষায়, মেড ফর ইচ আদার। কিন্তু সেইসব মন্তব্যের পেছনে কি শুধুই মুগ্ধতা ছিলো? ঈর্ষা ছিলো না এতোটুকুও? বিশ্বাস হয় না। কোনদিনও বিশ্বাস হয়নি। অথচ একদিন মিথ্যে জেনেও সেগুলোকে বিশ্বাস কবতে ইচ্ছে করেছিলো সমস্ত প্রাণ মন দিযে।

এগুতে গিয়েও থমকে দাঁড়ায় রূপসা। স্নানের পর ফের ওই ঘামে ভেজা ব্যবহৃত শয্যায় শরীর মেলতে ইচ্ছে করে না। ব্যবহৃত অথচ পূর্ণতার স্পর্শবিহীন। কন্টকশয্যা।

এখনও ঘুমোচ্ছে সুদূর। ঘুমোক। ওর মুখটা এদিকেই ফেরানো। এদিকে ফেরানো, অথচ ও আমাকে দেখছে না। দেখছে না ওর রূপসাকে। দেখলে ওর অভিব্যক্তিতে ফুটে উঠতো অনিবার্য এক বিপন্ন বিস্ময়। আবেশে মেশা এক নিরুদ্ধ ব্যাকুলতা। বলতো, 'তুমি আমাকে এমন করে মগ্ন কোরো না রূপ! আমি সহ্য করতে পারি না। নিজেকে আমার বড়ো অসহায় বলে মনে হয়।' আর রূপসা তখন মানবী নয, অপ্সরী হয়ে উঠতো। বারবার। আবার।

এখনও ঘুমোচ্ছে সুদূর। ঘুমোক। ভারি করুণ লাগছে ওর সুন্দর মুখখানা। অসহায় লাগছে ওর বলিষ্ঠ দেহটাকে। ইচ্ছে করছে ওর পাশে গিয়ে বসি। এলোমেলো কবে দিই ওর অবাধ্য চুলগুলোকে। শরীরে শরীর বিছিয়ে আদরে সোহাগে পাগল করে তুলি ওকে। কিন্তু ও ঘুমোক। ঘুম ওর সমস্ত ক্লান্তি আর মালিন্য মুছে দিযে যাক। ও ঘুমোক।

কাচের দরজা খুলে বাইরের ঝুল বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায় রূপসা। আর তক্ষুনি ফুলের প'পড়িব মতো রাশি রাশি স্নিগ্ধ বাতাস দামাল হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর সমস্ত অস্তিত্বে। মুহূর্তে জুড়িয়ে যায় সমস্ত শরীর। নিচের সাদার্ন অ্যাভিনিউতে এখনও স্ট্রীট লাইটগুলো জ্বলছে। অথচ এরই মধ্যে সারা আকাশ জুড়ে শুরু হয়ে গেছে এক বিরাট যজ্ঞের আয়োজন। সূর্যোদয়ের যজ্ঞ। গাঢ় আকাশটা রঙ বদলে ধূসর থেকে নীল হয়ে উঠছে ক্রমশ। এখানে সেখানে ইতস্তত আরও কিছু আশ্চর্য রঙের আঁচড়। পাখিরা জেগে উঠেছে। দূরে সাঁতারের ক্লাবের সুইমিং পুলটা এখনও নির্জন। ভীষণ ছোটো দেখাচ্ছে পুলটাকে। ঠিক যেন সাজিয়ে রাখা একটা সুন্দর মডেল। কিংবা খেলনা। বাতাসে ঝরে ঝরে পড়ছে কৃষ্ণচূড়ার দর্পিত অহঙ্কার।

এই উদার উষায় উন্মুক্ত ব্যালকনিতে স্নিগ্ধ বাতাসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে ভীষণ শান্ত আর বড়ো পবিত্র বলে মনে হলো রূপসার।

সকাল থেকেই শুধু তাড়া।

আজ দু দিন ধরে কাজের মেয়েটা আসছে না। দু দিন নয়, আজ নিয়ে এই তিন দিন। মেয়েটা না এলে সাত সকালেই এতো অসুবিধেয় পড়তে হয় যে মনে হয় যেন নিঃশ্বাস নেবার ফুরসত মিলছে না। ' মনে হয় না', সত্যিই তাই। সকালের চা, ব্রেকফাস্ট, দুজনের টিফিন—এ তো প্রতিদিনই থাকে। তাছাড়া গত রাত্রের জমে থাকা বাসনগুলো ধুয়ে মুছে রাখা, ঘরদোর সাফ করা এবং আরও টুকিটাকি কতো যে অজস্র কাজ, তার কোনো হিসেব নেই। সবকিছুই করতে হবে ঘড়ির দিকে নজর রেখে। এবং এরই মধ্যে আবার স্নান সেরে, নিজেকে একটু সাজিয়ে গুছিয়ে অফিসের জন্যে তৈরি করে নিতে হবে। তাছাড়া সুদূরের ঘুম ভাঙানো, তাকে বিছানায় চা দেওয়া, বাথরুমে যাবার জন্যে বারবার তাগাদা লাগানো—এগুলোও আছে। প্রথম প্রথম এমন পরিস্থিতিতে নাজেহাল হয়ে রীতিমতো আক্রমণাত্মক হয়ে উঠতো রূপসা। বলতো, 'আমি একা একা চা বানিয়ে অন্য কাজের ফাঁকে ফাঁকে কাপে চুমুক দেবো, আর তুমি বিছানায় শুয়ে বসে ধীরেসুস্থে বাবুমশাইয়ের মতো বেড-টি উপভোগ করবে—তা চলবে না। সংসার দুজনের, অতএব তোমাকে সকাল সকাল উঠে আমার সঙ্গে কাজে হাত লাগাতে হবে। বুঝেছো?'

সুদূরের মুখে তখন সন্ধ্যার মেঘ ঘনাতো। করুণ সুরে বলতো, 'কিন্তু আমি যে উঠতে পারি না, রূপ! ঘুম চোখে বিছানায় শুয়ে বসে চা না খেলে, আমার চোখ থেকে যে কিছুতেই ঘুমের আমেজ কাটে না! এটুকু তুমি মেনে নাও, প্লিজ!'

অগত্যা সেটা না মেনে পারা যায়নি।

তবে কাজের লোক না এলে সুদূর কিছুতেই টিফিন নিতে চায় না। কোনোদিন বলে, বাইরে লাঞ্চ আছে। কোনোদিন বলে একটা বিশেষ কাজে অফিস থেকে বেরুতে হবে, কখন ফিরবে তার কোনো ঠিকানা নেই, কাজেই সুযোগ বুঝে বাইরেই খেয়ে নেবে যা হোক কিছু। কিংবা সেদিন ওর শরীর খারাপ থাকে, পেটটাকে একটু রেস্ট দেবার দরকার হয়। এমনি আরও হাজারটা ওজর সর্বদাই ওর জিভে তৈরি থাকে। রূপসা বুঝতে পারে, আসলে মানুষটা ওর কাজের বোঝা একটু হালকা করে দিতে চায়। বোকাটা বোঝে না যে ওতে কোনো লাভ হয় না। কিন্তু ব্যাপারটা স্পষ্ট বুঝতে পারলেও সুদূরকে তা বুঝতে দেয় না রূপসা। ওর মনে হয়, এই লুকোচুরিটুকু বজায় রাখলে মানুষটা যদি একটু আত্মপ্রসাদ পায়, তো পাক। এই তৃপ্তিটুকু থাক ওর একান্ত নিজস্ব হয়ে।

গত মাসেও যমুনা বেশ কয়েক দিন বিনা নোটিশে এমনি কামাই করেছে। অজুহাত দেখাতে অবশ্যি কসুর করেনি। কিন্তু ওর মুখের দিকে তাকিয়েই রূপসা বুঝতে পেরেছে, মেয়েটা সত্যিকথা বলছে না। অথচ তা নিয়ে কিছু বলা চলবে না, মাইনে কাটার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। একটু এধার থেকে ওধার হলেই মেম সাহেবের মুখ থমথমে হয়ে ওঠে। হয়তো বলেই বসলো, 'আসচে মাস থেকে

তোমরা অন্য লোক দেকে নিও, বৌদি। এতো কম মাইনেয় এতো খাটুনি আমার পোষাচ্চেনা।' অথচ মাইনেটা কম হলো কোথায়, ভেবে পায় না রূপসা। আর কাজ বলতে তো দুখানা ঘরে ঝাড়ু বোলানো, দুজনের বাসন ধোয়া আর মাঝে মাঝে দু চারটে কাপড়-চোপড় গুঁড়ো সাবানে কাচা—এই তো। তাই এ ধরনের হুমকি শুনতে ভাল লাগে না রূপসার। ইচ্ছে করে সঙ্গে সঙ্গে আপদ বিদেয় করে দিতে। কিন্তু হুটপাট করে এ অঞ্চলে কাজের লোক পাওয়া যায় না। তাই মুখ বুজে সহ্য করে যাওয়া ছাড়া আর কিছু করারও থাকে না। অথচ বিদেশে নাকি কাজের লোকের কনসেপ্টটাই নেই। সবকিছু নিজেদের করতে হয়। এ দেশেও বোধহয় তেমন দিন এলো বলে। কিন্তু ওদেশের গৃহস্থরা সবকিছু সুশৃঙ্খলভাবে ম্যানেজ করে কি করে আর ওখানকার ঝি-চাকরগুলোই বা গেলো কোথায়, তা ভেবে পায় না রূপসা।

সকাল বেলা ওরা কেউই ভাত খেয়ে অফিসে যায় না। সুদূর আগে খেতো, আজকাল রূপসার দেখাদেখি সেও একবেলা ভাত ছেড়ে দিয়েছে। আজ সকালের মেনু চিজ আর পাউরুটি, ডিমের পোচ, স্যালাড আর সেই সঙ্গে একগ্লাস দুধ। আগে রূপসা মরে গেলেও দুধ খেতে রাজি হতো না, আজকাল খায়। টেবিলে সবকিছু সাজিয়ে ও গলা চড়িয়ে ডাকলো, 'সুদূর, তোমার হয়েছে?'

কোনো সাড়া নেই।

'সুদূর?' ফের ডাকলো রূপসা।

'যাচ্ছি,' গম্ভীর ভরাট গলায় সাড়া দেয় সুদূর।

মানুষটার ওই কণ্ঠস্বর প্রায়ই কেমন যেন বিবশ করে তোলে রূপসাকে। আচমকা মনে পড়ে খালি গলায় খোলা হাওয়ার মতো ওর সেই আশ্চর্য গান। 'আমার একটি কথা বাঁশি জানে, বাঁশিই জানে।' রূপসার সমস্ত শরীর দিয়ে যেন বিদ্যুতের শিহরণ বয়ে যায়। অবশ তনু, বিবশ চেতনা।

সরস্বতী পূজো। বাতাসে বসন্তের গন্ধ মেশা খুশির প্লাবন।

কবে, কতোদিন আগে? এ জন্মে, না কি তা গতজন্মের এক ধূসর স্মৃতি?

মনে পড়ে না, মনে পড়ে না।

'কি ভাবছো?'

চমকে ওঠে রূপসা। সুদূর ইতিমধ্যে কখন যেন চেয়ারে এসে বসেছে, ও জানতেও পারেনি। কি এতো ভাবছিলো ও?

'বললে না তো, কি ভাবছো?'

'কই, কিছু না তো!'

'তুমি লুকোচ্ছো! আসলে তুমি কিছু ভাবছিলে, কিন্তু আমাকে তা বলবে না। বলতে চাও না। তাই না?'

'মোটেই তা নয়,' এক ঝটকায় বাস্তবে ফিরে আসে রূপসা। 'কটা বাজে খেয়াল আছে? খাওয়াদাওয়ার পরেও আমার অনেক কাজ। যমুনা আজও আসেনি। আরও দেরি করলে আজ আর মিনিবাসে উঠতে হবে না। পরশু শাটল ট্যাক্সির জন্যে কতোক্ষণ লাইনে দাঁড়াতে হয়েছিলো, জানো? পাক্কা পনেরো মিনিট। তাছাড়া

প্রতিদিন ট্যাক্সিতে অতোগুলো করে পয়সা গচ্চা দিতে গায়ে বড্ড লাগে। তোমার আর কি? দিব্যি কোম্পানির গাড়িতে চেপে, মি. সোমের সঙ্গে খোশগল্প করতে করতে অফিসে যাও। বেশ আছো বাপু!'

'রূপ!' রূপসার বাঁ হাতটা চেপে ধরে সুদূর।

সঙ্গে সঙ্গে ওর শিরায়-ধমনীতে রক্তের মাতন জাগে। মস্তিষ্কের সূক্ষ্মতম তন্তুগুলোতে জেগে ওঠে প্রথম বর্ষার রিমঝিম সুর।

রূপ! কতোদিন পরে ওকে এই আদরের নাম ধরে ডাকলো সুদূর? কিন্তু না, আবেগকে প্রশ্রয় দিলে যুক্তি হারিয়ে যাবে। রূপসার সচেতন মন তাতে সায় দিতে রাজি নয়।

'রূপ?'

'বলো।'

'আমার কথাটা ভেবে দেখলে?'

'কোন কথা?' রূপসা যেন বিস্মিত হলো।

'তুমি জানো না?'

'না, জানি না।' নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে রূপসা বললো, 'এখন কথাবার্তা বন্ধ রেখে, লক্ষ্মীছেলের মতো খেতে শুরু করো। নইলে আমার কিন্তু সত্যিই ভীষণ দেরি হয়ে যাবে।'

'হোক দেরি। আমার কথার জবাব না দিয়ে আজ তুমি কোথাও যেতে পারবে না।'

'আচ্ছা পাগল তো! কিসের জবাব?'

'কাল রাতে আমি তোমাকে যা বলেছি, তার জবাব।'

'তখন আমার ঘুম পাচ্ছিলো। তুমি কি বলেছো আমার মনে নেই।'

'বাজে কথা।'

'মোটেই বাজে কথা নয়।'

'তাহলে কথাটা এখন আবার বলি?'

'আচ্ছা মুশকিল! তোমার প্রস্তাবটা নিয়ে ভাববার মতো সময় আমি কোথায় পেলাম?' রূপসা অভিনয়ের জের টেনে চলে, 'একটু সময় তো দেবে আমাকে?'

'আজ অনেক ভোরে তুমি ঘুম থেকে উঠেছো। তখনও আলো ফোটেনি। তখন তুমি স্নান করেছো। তারপর ব্যালকনিতে গিয়েও বসেছিলে অনেকক্ষণ। অস্বীকার করার চেষ্টা কোরো না, এতোটা সময় তোমার মন নিশ্চই শূন্য হয়ে ছিলো না? তাহলে তুমি নিশ্চয়ই ভেবেছো আমার প্রস্তাবটার কথা?'

'ভেবেছি। কিন্তু এখন ওসব কথা থাক না, সুদূর। এই সকাল বেলায় ওই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটা তুলে, কেন তুমি সারাটা দিন নষ্ট করে দিতে চাইছো বলো তো?'

'সারাটা জীবনের বদলে, বরঞ্চ তোমার একটা দিনই নষ্ট হোক। সেটাই বোধহয় অ্যাডভাইসেবল, তাই নয় কি?'

একটা শক্ত কথা ঠোঁটে এসে গিয়েছিলো রূপসার। ও বলতে যাচ্ছিলো,

'জীবনটা আমার। এবং এ ব্যাপারে আই ডোন্ট নিড ইওর অ্যাডভাইস।' বলতে যাচ্ছিলো, 'আমার নিজের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেবার জন্যে তুমি আমাকে জোর করতে পারো না।'

কিন্তু ঠিক সময়মতো নিজেকে সামলে নিলো ও। ঠোঁটের ভঙ্গিমায় ফুটিয়ে তুললো সেই আশ্চর্য আলেখ্য, যা সুদূরের ভীষণ প্রিয়। তারপর অরণ্যের মতো রহস্যময় চোখ দুটো তুলে বললো, 'আয়্যাম ইয়েট টু টেক আ ডিসিশন, সুদূর। আমি এখনও কিছু ঠিক করতে পারিনি। এজন্যে আমার আরও কিছু সময়ের দরকার। আমাকে তুমি জোর কোরো না, প্লিজ।'

'কিন্তু তুমি কি আমার কথাটা একটুও বোঝার চেষ্টা করবে না? একবারও ভাববে না আমার কথা?'

'কি মনে হয় তোমার?'

'যা মনে হয় তা ভাবতেও আমার ভয় করে। আমি শিউরে উঠি। তোমার জায়গায় নিজেকে প্লেস করতে গেলে আমার শরীরে কাঁটা দেয়। তখন আমি আর কিছুই ভাবতে পারি না। আমি তো অমানুষ নই, রূপ!'

'আমি জানি, আমি তা বুঝি। তাই আমার এতো ভাবনা। বিশ্বাস করো!'

চেয়ার ছেড়ে সুদূরের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় রূপসা। তারপর সুদূরের বিষণ্ণ মুখখানা কাছে টেনে এনে অতর্কিতে চেপে ধরে নিজের বুকের সুকোমল বন্ধুরতায়। থরথর করে কেঁপে ওঠে সুদূর, ছটফট করে ওঠে মুহূর্তের জন্যে। কিন্তু মুহূর্তটা বড়ো সংক্ষিপ্ত, বড়ো নিষ্ঠুর। অস্থির বাসনা নিয়ে তাই বৃথাই প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে থাকে রূপসা।

অপারেটার সংযোগ দেবার সঙ্গে সঙ্গেই বহুদিন বাদে বহু পরিচিত সেই মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো রূপসা।

'হ্যালো?'

'অনুভব?'

'কথা বলছি।'

'আমি ...'

'জানি।'

'এতোদিন বাদে—তবু গলা শুনে এতো সহজেই চিনতে পারলে?'

'পারলাম।'

'কি করে?'

'তুমি যে রূপসী! আর আমি তো সেই কবে অরূপ রতন পাবো বলে রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছিলাম। তুমি কি তা জানো না?'

'কিন্তু রূপসী তো ব্যর্থ! কোনোদিনই সে তোমার ধ্যান ভাঙাতে পারেনি।'

'চেষ্টা করেছিলে কি? কোনোদিনও?'

'করেছিলাম। অনেক দিন, অনেক বার। কিন্তু তুমি তা বুঝতে পারোনি, কিংবা বুঝতে চাওনি।'

'ভুল। আসলে আমার ধ্যানই ছিলো তোমাকে নিয়ে। কিন্তু তুমি কোনোদিনও তা জানতে পারোনি, কিংবা জানতে চাওনি।'

'কিংবা তুমি তা জানাতে চাওনি বা জানাতে পারোনি। হয়তো জানাতে ভয় পেয়েছিলে। আসলে তুমি ভীষণ বোকা, অনুভব! বড্ড ভীতু।'

'যে জেগে থাকে, তার ঘুম কোনোমতেই ভাঙানো যায় না। তুমি কি তা জানো না? তাছাড়া তখন তোমার কতো স্তাবক, কতো প্রেমিক! আমার সাধ্য কি যে তখন তোমার ... তারপর, ওয়েল—ইট ওয়্যজ টু লেট।'

'বাজে কথা ছাড়ো, অনুভব। ফ্ল্যাটারিরও একটা মিউচুয়াল সীমা থাকে। সেটা কিন্তু অনেকক্ষণ আগেই পেরিয়ে গেছে।'

'ভয় পেলে? আমি তো ভেবেছিলাম, সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াবার মতো সাহস আর যোগ্যতা—দুইই তোমার আছে।'

'আবার সেই বাজে কথা! তোমার মতলবখানা কি বলো তো?'

'আমার কোনো দোষ নেই। কথাটা তো তুমিই তুললে। সুযোগ বুঝে আমার পুরনো ব্যথাটাও তাই সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়া দিয়ে আবার নতুন করে জেগে উঠলো। তাহলে বলো, দোষটা কি আমার?'

'না, আমার। হলো?'

'সে কি, এতো সহজে? তাহলে এটাকে কি বলবো, গ্লোরিয়াস রিট্রিট?' হো হো করে হেসে ওঠে অনুভব।

'যা মনে করো। কিন্তু আমি যে হার মানতে শিখিনি, অনুভব!' অভিনয়ের চপল মুখোশটা হেলায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে আত্মস্থ হয়ে ওঠে রূপসা।

'কিন্তু জীবনে তো সেটারও প্রয়োজন আছে। তাই নয় কি? টু অ্যাকসেপ্ট ডিফিট গ্রেশ্যাসলি।'

'জানি, তবু ... ' বলতে বলতে কি যেন ভেবে থেমে যায় রূপসা।

কয়েকটি অনুর্বর মুহূর্ত কেটে যায় শব্দহীন।

'রূপসী!' অনুভবের গাঢ় কণ্ঠস্বরে এখন আর অভিনয়ের স্পর্শ নেই।

'আমি আর পারছি না, অনুভব!' চাপা গলায় যেন ফুঁপিয়ে ওঠে রূপসা। 'এবারে সত্যিই আমার ক্লান্ত লাগছে।'

'স্টুপিড গার্ল।' বুকটা ধক করে উঠলেও গলায় জোর করে দৃঢ়তা ফোটাতে তৎপর হয় অনুভব, 'কি হয়েছে?'

'অনেক কিছু। এবারে আর বোধহয় কিছুই বাকি থাকবে না।'

'কি?'

'টেলিফোনে এতো কথা বলা সম্ভব নয়। তুমি আজ আমার সঙ্গে একটু দেখা করতে পারবে? সময় হবে তোমার?' নিচু গলায়, যেন অন্য কেউ শুনতে না পায় এমনি সুরে, প্রশ্ন করে রূপসা।

'কখন?'

'অফিসের পরে? ধরো পাঁচটা দশ?'

'কোথায়?'

'ধরো, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে?'

'ঠিক আছে।'

'একটু রাত হলে আরতি আবার চিন্তা করবে না তো?'

'দ্যাটস মাই প্রবলেম।'

'আচ্ছা। তাহলে ছাড়ি এখন?'

'বাই!'

মিনিট পাঁচেক বাদেই মি. পালিতের টেবিলে ডাক পড়লো রূপসার, 'মিসেস মুখার্জি, আপনার টেলিফোন।'

সদ্য টাইপ করা চিঠিটা মেশিন থেকে খুলতে গিয়েও থমকে গেলো রূপসা। মি. ভার্গিজের ডিকটেট করা জরুরি চিঠি। কিন্তু আজ সকাল থেকেই মাথার ঠিক নেই. কতো ভুল হয়েছে কে জানে! একবার চোখ না বুলিয়ে চিঠিটা পাঠানো ঠিক হবে না। অতএব দু-তিন মিনিট ওটা বরং মেশিনেই লাগানো থাক।

তিনটে টেবিল পেরিয়ে গিয়ে রিসিভার তুললো রূপসা, 'হ্যালো?'

'রূপসী, আমি অনুভব। শোনো, তুমি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে দাঁড়িও না, ওখানে গাড়ি রাখা যাবে না। আমি বরং সোজা তোমার ওখানে চলে যাবো। তুমি অফিস থেকে বেরিয়েই আমাকে দেখতে পাবে। তবে দেরি কোরো না কিন্তু। জানোই তো, ওখানেও গাড়ি পার্ক করা বিস্তর ঝামেলা। ঠিক আছে?'

'না।'

'মানে?'

'আমি শ-ওয়ালেসের গেটে থকবো। পাঁচটা দশ-পনেরো। বুঝেছো?' কানে কানে বলার মতো ভীষণ চুপিচুপি, একেবারে নিচু গলায়, রূপসা বলতে থাকে, 'দু-পাঁচ মিনিট আগে এলেও ওখানে তোমার গাড়ি রাখতে খুব একটা অসুবিধে হবে না বোধহয়।'

কিন্তু ওই ভিড় উজিয়ে তুমি অতোটা পথ খামোখা হাঁটতে যাবে কেন?'

'পরে বলবো। এখন রাখছি।'

অনুভবকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে রিসিভার রেখে দিলো রূপসা। টেবিলে ফিরে এসে দেয়ালে টাঙানো ঝকঝকে কোয়ার্জ ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখলো, বেলা মোটে সাড়ে তিনটে। তার মানে এখনও আরও দেড় ঘণ্টা। কতোক্ষণে কাটবে এই দেড় ঘণ্টা সময়? দেড় ঘণ্টা—মানে নব্বুই মিনিট। কিংবা পাঁচশো চল্লিশ সেকেণ্ড। ওফ্, অসহ্য!

ভারি অদ্ভুত সময়ের এই কনসেপ্টটা। সময়কে টুকরো টুকরো করে, তার ক্ষুদ্রতম অংশগুলোকে সুনির্দিষ্ট করে দেখার প্রবণতাটা। অথচ তা অর্থহীন। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে একটা সেকেণ্ড কেমন অনায়াসে উধাও হয়ে যায়। এমনি করে অবহেলায় কাটিয়ে দেওয়া যায় একটার পর একটা সেকেণ্ড। কিন্তু সেগুলোকে একসঙ্গে জুড়ে দেখতে গেলেই ব্যাপারটা কেমন যেন বদলে যায়। এক এক সময়, যেমন ছুটির আগে, একটা ঘন্টা কিছুতেই কাটতে চায় না। সময় তখন যেন স্থির হয়ে ঝুলে থাকে অথর্বের মতো। অথচ অফিসে আসার আগে

একটা ঘণ্টা—মাই গড!

পাশের টেবিল থেকে শ্যামল বারবার আড়চোখে তাকাচ্ছে। কিছু আঁচ করেছে নাকি ছেলেটা? নাকি শুনতে পেয়েছে কিছু? শুনলেই বা—রূপসা ওসবের পরোয়া করে চলে না। কে কি বললো না বললো, ভাবলো না ভাবলো—তা নিয়ে মাথা ঘামালে ও এতোদিন এখানে চাকরি করতে পারতো না। আসলে রূপসার একটা সহজাত আভিজাত্য আছে, যেটাকে লোকে অহঙ্কার বলে ভুল করে। তাই সবাই ওর সঙ্গে মিশতে পারে না, এগুতে ভয় পায় এবং এই হীনম্মন্যতার ফলে সৃষ্টি হওয়া ঈর্ষায় তারা রূপসার সম্পর্কে নানান কথা রটাতে ভালোবাসে। এমন কি রাঠোর সাহেবের সঙ্গেও ওকে জড়িয়ে কি কম কথা উঠেছিলো অফিসে? রাঠোর যোধপুরের লোক। একবার দেশ থেকে ছুটি কাটিয়ে ফেরার সময় রূপসার জন্যে উনি সুন্দর একটা বাঁধনি শাড়ি নিয়ে এসেছিলেন। কারুর জানার কথা নয়, তবু কি করে যেন সারা অফিসে রটে গিয়েছিলো কথাটা। বিষয়টা মুখরোচক, তাই মনের ঝাল মেটাতে অনেকেই সেদিন তৎপর হয়েছিলো। আলটপকা নোংরা মন্তব্যও শুনতে হয়েছে বহুদিন। এমন কি রাঠোর সাহেবও একদিন ওকে একান্তে ডেকে বলেছিলেন, 'আয়াম স্যরি, মিসেস মুখার্জি। আপনাকে এমন হিউমিলিয়েটেড হতে হবে জানলে, আমি কখনই শাড়িটা আপনাকে দিতে চাইতাম না।' রূপসা তখন শান্ত চোখে রাঠোরের দিকে তাকিয়ে বলেছিলো, 'আপনি মিছিমিছি এমব্যারাসড হবেন না। দিতে ইচ্ছে হয়েছিলো বলেই শাড়িটা আপনি আমাকে দিতে চেয়েছিলেন। আমারও নিতে ইচ্ছে হয়েছিলো, মনে হয়েছিলো নেওয়া যায়, তাই নিয়েছিলাম। এ ব্যাপারে কোনো তৃতীয় ব্যক্তির কথায় আমার কিচ্ছু এসে যায় না।' মি. রাঠোর তখন মুগ্ধ বিস্ময়ে সম্পূর্ণ হতবাক। খানিকক্ষণ বাদে উনি অস্ফুটে বলেছিলেন, 'শুনেছিলাম, বাঙালি মেয়েরা খুব নরম হয়। আমার ধারণাটা আজ ভেঙে গেলো। হ্যাটস অফ টু ইওর পারসোনালিটি!'

আসলে কি করে সবাই যেন বুঝে গিয়েছিলো, ওর প্রতি রাঠোর সাহেবের দুর্বলতা আছে। ওরও কি ছিলো না কিছুটা? থাকতেই পারে। একটা মানুষকে কি আর একটা মানুষের ভালো লাগতে নেই? শুধু একটি মাত্র মানুষকেই সারা জীবন ধরে অক্লান্তভাবে ভালোবেসে যেতে হবে, একজনকে ছাড়া অন্য কাউকে কোনোদিনও ভালোবাসা যায় না বা যাবে না—যারা এ সমস্ত অর্থহীন সিদ্ধান্ত জাহির করে, রূপসার চোখে তারা মিথ্যেবাদী। হিপোক্রিটস। তারা নিজেদের ভেতরটাকে খতিয়ে দেখতে ভয় পায়। কিংবা ভয় পায় নিজেদের জায়গাটা নড়বড়ে হয়ে যেতে পারে ভেবে। কিন্তু মানুষের মন তো প্রোগ্রামে বাঁধা কমপিউটার নয় বা শেকল পরানো পশুও নয়! তাই আরোপিত রীতিনীতির বাঁধনে মানুষকে বেঁধে রাখার প্রচেষ্টাটা বোধহয় কৃত্রিমতাকে প্রশ্রয় দেওয়ারই নামান্তর। রূপসা ভেবে পায় না, একটা মানুষ কি করে অন্য একটা মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে যেতে পারে। মাঝে মাঝে ওর মনে হয়, আমি যদি একাধিক পুরুষকে ভালোবাসি এবং তাতে কারুর যদি কোনো ক্ষতি না হয়, তাহলে কি এমন এসে যাবে বিশ্বসংসারের? কিছু না, বিন্দুমাত্র না। কাজেই তাতে অন্য লোকের চোখ টাটালেও আমার কিছুই এসে

যাবে না। আই কেয়ার আ ফিগ ফর দ্যাট।

আসলে অসুবিধেটা অন্য জায়গায়। অধিকাংশ সময় ভালোবাসার মানুষরাও বুঝতে চায় না যে মনের গভীরে তাদের প্রত্যেকের জন্যেই একটা করে আলাদা কুঠুরি আপনা থেকেই তৈরি হয়ে যায়। কারুরই সাধ্য নেই একজনকে সরিয়ে তার জায়গাটা বেদখল করে নেবার। কিন্তু বেসিক্যালি মানুষ স্বার্থপর, তাই প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী অধিকাংশ মানুষই একচ্ছত্র আধিপত্যের স্বপ্ন দ্যাখে, ঈর্ষা করে, দুঃখ পায়। এগুলোর মূলে রয়ে গেছে ইগো প্রবলেম। শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কার। অবিশ্যি ঈর্ষা জিনিসটা মন্দ নয়। কারণ ভালোবাসা না থাকলে ঈর্ষা আসে না। তবে বাড়াবাড়ি হলেই মুশকিল। তখন অনাকাঙ্ক্ষিত হলেও অনিবার্য স্রোতে যোগ বিয়োগের প্রশ্নটা সামনে এসে দাঁড়ায়।

ঝড়ের গতিতে টাইপ করতে করতে আকাশ পাতাল ভাবছিলো রূপসা। কাজ শেষ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। পাঁচটা বাজতে দশ। কপালটা বড্ড টনটন করছে আজ। পুরনো রোগ। টেনশন থাকলে আজকাল একটানা বেশিক্ষণ কাজ করলেই মাথা ধরে। মাইগ্রেন। যার একমাত্র ওষুধ, স্নান করে অন্ধকার ঘরে চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকা।

টয়লেটে গিয়ে হাতমুখ পরিষ্কার করে নিলো রূপসা। চোখের কোলে ক্লান্তির ছায়া কি তবু রয়ে গেলো কিছুটা? থাকলেও কিছু করার নেই। ক্লিপ খুলে চুলগুলো আঁচড়ে নিলো একটু। ক্লিপ দুটো আর লাগালো না, রেখে দিলো ব্যাগের একটা নির্দিষ্ট কোণে। ঠোঁটে লিপস্টিক লাগালো সবশেষে। শেড এইটিসিক্স। হালকা মেঘ রঙের শাড়িটা পরিপাটি করে বিছিয়ে দিলো বুকের বন্ধুরতায়। এই গরমে সিনথেটিক শাড়ি গায়ে রাখতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু উপায় নেই। একদিন ব্যবহার করলেই তাঁতের শাড়ির যা চেহারা হয়, তা আর কহতব্য নয়। বৃষ্টি হলে তো আরও চমৎকার। ওদিকে সিল্কের শাড়ির যেমন দাম, তেমনি মেইনটিন্যান্সের খরচ। কাজেই অফিসে ব্যবহারের জন্যে সিনথেটিক শাড়িই সবচাইতে সুবিধেজনক।

টয়লেট থেকে বেরুবার মুখে মিশেলের সঙ্গে দেখা। সাতাশ-আঠাশ বছরের টগবগে যুবতী। ঈষৎ লাস্যময়ী। বিশেষ দৃষ্টিতে দস্তুরমতো সুন্দরী। ফরসা, লম্বাটে মুখ। মাথায় পার্ম করা একরাশ লালচে চুল, উজ্জ্বল কালো চোখ, পুরুষ্টু ঠোঁট আর উদ্ধত বুক। একটু নজর করে দেখলে পোশাকের প্রায় স্বচ্ছ আবরণের আড়াল থেকে ওর স্তনবৃন্ত দুটিকে খুঁজে নিতে একটুও অসুবিধে হয় না। কে যেন একদিন বলেছিলো, মেয়েটা নতুন ব্রা কিনেই ওই বিশেষ অংশ দুটো সযত্নে ছেঁটে বাদ দিয়ে দেয়।

রূপসাকে দেখে মিষ্টি করে হাসলো মিশেল, 'হাই, ইউ লুক সেক্সি!'

'তাই নাকি?' চট করে একবার ঘড়িটা দেখে নিলো রূপসা। পাঁচটা বাজতে এখনও তিন মিনিট বাকি।

'ভেরি মাচ। হ্যাভিং আ ডেট?' রূপসা কোনো জবাব দেবার আগেই মিশেল চকাস করে ওর গালে একটা চুমু খেয়ে বললো, 'ডোন্ট সে 'নো' মাই ডিয়ার, আই ক্যান সি ইট ইন ইওর আইজ।'

'তাহলে তো সব বুঝেই ফেলেছো,' মৃদু হাসলো রূপসা।

'বুঝেছিই তো।' মিশেলের চোখ দুটো ইঙ্গিতময় ভঙ্গিতে মুখর হলো, 'টেল মি, হু ইজ দ্যাট লাকি ডগ? ডোন্ট সে ইটস ইওর হাজব্যাণ্ড, প্লিজ।'

'নো। ইটস সিম্পলি আ ফ্রেন্ড, আ ভেরি ওল্ড ফ্রেন্ড।'

'ব্যাস? দ্যাটস অল? অ্যাম আই টু বিলিভ ইট?'

'তা তোমার মর্জি!'

'মার্জি? মানে কি?'

'সর্বনাশ করেছে!' রূপসার দু চোখ বিস্ফারিত হলো, 'এখন আমাকে বাংলার ক্লাস নিতে হবে নাকি?'

'অ্যাজ ইউ প্লিজ,' মিশেল দু কাঁধে ঝাঁকুনি তুললো।

'এই তো, পাওয়া গেছে!' রূপসা এবারে সত্যিই হেসে ফেললো।

'কি?'

'মর্জি। মানে, অ্যাজ ইউ প্লিজ। অবিশ্যি এখানে দ্যাটস আপটু ইউও বলা যেতে পারে।'

'থ্যাংক ইউ। একটা নতুন বেঙ্গলি ওয়র্ড শিখলাম—মারজি।' মিশেল কিশোরীর মতো ঘাড় দোলালো। কিন্তু পরক্ষণেই ঠোঁট ফুলিয়ে বললো, 'তুমি তো দিব্যি ডেট করতে চললে। কিন্তু জানো তো, আমি একটা প্রবলেমে পোড়েছি।'

'কি?'

'আয়্যাম লিকিং,' মিশেল নিচু গলায় বললো, 'বাট আই হ্যাভ আ ডেট।'

'তো?'

'ডু ইউ থিংক দ্যাট বাস্টার্ড উইল স্পেয়ার মি? মোটেই না। বোলবে, আমি তোমাকে বিষ-ষণ বালোবাসি। বলবে, একবার ফির—প্লিজ! অ্যাণ্ড আই নো, ফাইনালি আই শ্যাল হ্যাভ টু এগ্রি।'

খিলখিল করে হেসে টয়লেটে ঢুকে গেলো মিশেল। স্তম্ভিত হয়ে দু এক মুহূর্ত ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলো রূপসা। মিশেলের প্রেমিক বিশেষ দিনগুলোতেও ওকে রেহাই দিতে নারাজ, এতো ভালোবাসে ওকে। এবং ভালোবাসার এই স্বরূপ বোঝা সত্ত্বেও মিশেল সেই ভাবনায় উদ্বেল। কি কাণ্ড! আসলে কিছু কিছু মেয়ে বোধহয় সত্যিই এক্সপ্লয়টেড হতে চায়—এ ছাড়া এর অন্য কোনো ব্যাখ্যা মাথায় আসে না। নইলে মিশেলের মতো মোটামুটি সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী এবং ইকনমিক্যালি ইণ্ডিপেনডেন্ট মেয়ে কেন এভাবে ...

কি জানি!

পাঁচটা বেজে দু-তিন মিনিটের মধ্যেই অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লো রূপসা। তারপর ভিড়ের স্রোত থেকে গা বাঁচিয়ে যথাস্থানে গিয়ে পৌঁছুতে আরও দশ মিনিট। কিন্তু একটা মিনিটও ওকে অপেক্ষা করতে হলো না। জেনারেল পোস্ট অফিসকে ডাইনে রেখে বাঁ দিকের রাস্তায় মোড় নিতেই অনুভবকে দেখতে পেলো ও। রেলওয়ে অফিসের দিকে ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা বটগাছটার তলায় অপেক্ষা করছে অনুভব, পাশেই নতুন কেনা সাদা মারুতি। ওকে দেখে সে মৃদু

হেসে হাত নাড়লো।

'এখানে মোটেই থাকার কথা ছিলো না,' কাছাকাছি গিয়ে মুখ গম্ভীর করলো রূপসা। 'যদি মিস করতাম?'

'আমি করতাম না,' হাসিমুখে গাড়ির দরজা খুলে ধরলো অনুভব।

'তোমাকে দেখতে না পেলে আমি কি করতাম, জানো?'

'জানি। দুটো মিনিটও অপেক্ষা না করে হনহনিয়ে চলে যেতে। কারণ রাস্তায় কারুর জন্যে অপেক্ষা করা তোমার ধাতে নেই। অথচ তুমি একবারও ভাবতে না, সেই পার্ক স্ট্রীট থেকে এখানে আসতে গেলে হিসেবের বাইরেও কিছুটা বাড়তি সময় লেগে যেতে পারে।' রূপসার দিকের দরজাটা ঠেলে দিয়ে, উলটো দিকের দরজা খুলে গাড়িতে উঠলো অনুভব।

'কাউকে কথা দিলে, সেই বাড়তি সময়টাও হিসেবে রেখে পথে বেরুনো উচিত। তাই নয় কি?'

'তবু অনেক সময়ই হিসেবটা মেলে না, সিগন্যাল লাইটে আটকে থাকে।'

'যে আটকে থাকবে, সে আমাকে মিস করবে।'

'তুমি তাকে মিস করবে না?' ঠোঁটে সিগারেট ঝুলিয়ে আলতো করে প্রশ্নটা বাতাসে ভাসিয়ে দেয় অনুভব।

'হয়তো করবো।'

'তবু একটু অপেক্ষা করবে না?'

'না।'

'ফাইন।' সিগারেটের ধোঁয়ায় চোখ কুঁচকে উঠেছিলো অনুভবের। এবারে সিগারেটটা বাঁ হাতের তর্জনি ও মধ্যমার মাঝখানে চালান করে দিয়ে সে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বললো, 'তার মানে সময়ের মতো রূপসাও কারুর জন্যে অপেক্ষা করে না। তাই তো?'

রূপসা মৃদু হাসলো, 'সিদ্ধান্ত নেওয়াটা যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

'বুঝেছি।' চাবি ঘুরিয়ে গাড়ি চালু করলো অনুভব, 'কোথায় যাবে?'

'লিণ্ডসের দিকে চলো, তারপর দেখা যাবে। কিন্তু দোহাই তোমার, এসপ্লানেড দিয়ে যেও না। বড্ড ভিড়।'

নিঃশব্দে খানিকক্ষণ গাড়ি চালায় অনুভব। তারপর সামনের দিকেই দৃষ্টি মেলে রেখে এক সময় নিচু গলায় বলে, 'অনেক দিন হয়ে গেলো। এর মধ্যে তুমি কোনো খবর নাও নি, দাও-ও নি।'

'আমার দিক থেকে দেবার মতো নতুন কোনো খবর ছিলো না। কিন্তু এখানে অবধারিত একটা প্রশ্ন এসে পড়ে। তা কি তুমি কখনও ভেবে দেখেছো?'

'কি?'

'খবর দেয়া নেয়ার দায়িত্ব কি শুধু আমার? মনে করে দ্যাখো তো, শেষ টেলিফোনটা কে করেছিলো?'

'ভেবে চিন্তে মনে করতে হবে না। তুমিই করেছিলে।'

'তবে? তারপর আমি কি তোমার কাছ থেকে অন্তত একটা টেলিফোন পাবার

আশা করতে পারি না? আমার কি রাগ বা অভিমান কিংবা দুঃখ—কিছুই থাকতে নেই?'

'আছে।'

'তবে? কেন তুমি দেখা করোনি? কেন একটা টেলিফোন পর্যন্ত করোনি?'

'সে তুমি বুঝবে না,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিঃশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো অনুভব।

'তোমার ধারণাটা ভুল, অনুভব। আমি অতো বোকা নই।'

'জানি।' আচমকা প্রসঙ্গ বদলাতে তৎপর হয় অনুভব, 'কিন্তু আজ হঠাৎ করে এমন তলব কেন? তুমি কি মনে করেছো, তুমি যখন-খুশি ডাকলেই আমি গিয়ে হাজির হবো?'

'অফকোর্স!' মাথাটা সিটে এলিয়ে দিয়ে, মৃদু হেসে চোখ বন্ধ করলো রূপসা।

'তোমার বিশ্বাস যদি ভুল হয়?'

'সম্ভবত তা ভুল হবার নয়।'

'তবু?'

'তাহলে তখন আমি যাবো। যখনই ইচ্ছে হবে, নিজে গিয়ে তোমাক হাইজ্যাক করে নিয়ে আসবো।'

'অ্যাতো কনফিডেনস?'

রূপসা কোনো জবাব দেয় না। কারণ মুখ ফুটে এ প্রশ্নের জবাব দেবার কোনো প্রয়োজন হয় না। তাই হাসির মতো এক রহস্যময় অভিব্যক্তি ঠোঁটে এঁকে ও শুধু বসে থাকে নিস্পন্দ হয়ে। অপাঙ্গে ওর দিকে এক ঝলক তাকায় অনুভব। উদ্ধত, অহঙ্কারী এক নারী। আনকমপ্রোমাইজিং। অথচ ও ক্লান্ত এবং হয়তো খানিকটা অসহায়। কিন্তু মরে গেলেও ও তা স্বীকার করবে না। একান্তে, নিজের কাছেও না। ও জানে না, ওর মোমের মতো সুন্দর বুকের উপত্যকায় স্বপ্নের এক বিষণ্ণ নীলকণ্ঠ পাখি বাসা বেঁধে আছে। কিন্তু আমি জানি, আমি তা জানি। জানি তার কারণ, আমি তোমাকে ভালোবাসি রূপসী। আ হার্মলেস লাভ। এবং তুমিও তা জানো। জানো বলেই অমন নিশ্চিন্ত হয়ে বলে দিতে পারো যে ইচ্ছে হলেই তুমি আমাকে হাইজ্যাক করে নিয়ে যাবে। অথচ আমি কোনোদিনও এতো বড়ো একটা কথা বুক বাজিয়ে তোমাকে বলতে পারবো না। কিছুতেই না। কারণ আমি জানি, তোমার জীবনে আমি অনিবার্য নই। তোমার-আমার ঘনিষ্ঠতার মাঝখানে তুমি কোথায় যেন অতি সন্তর্পণে সূক্ষ্ম একটা বিভাজক রেখা এঁকে রেখেছো, যেটা আমি শত চেষ্টাতেও মুছে ফেলতে পারবো না। অদৃশ্য অথচ দুর্ভেদ্য ওই রেখা বারবার আমাকে সতর্ক করে দেয়। তখন আমার মনে হয়, আমার পায়ের তলার জমিটা আদৌ শক্ত নয়। মনে হয়, যেদিন যখনই তোমার অহঙ্কারে বিন্দুমাত্র আঘাত লাগবে, কিংবা আমার অস্তিত্ব তোমার কাছে বাহুল্য মনে হবে—সেদিন, তখনই তুমি নিজের জীবন থেকে আমাকে সরিয়ে দিতে এতোটুকুও ইতস্তত করবে না। ইউ আর আ ক্রুয়েল উওম্যান, আ ম্যাগনিফিসেন্ট ক্রিয়েচার।

ব্রেকে আলতো করে চাপ দিতেই সামান্য ঝাঁকুনি তুলে থেমে গেলো গাড়িটা।

'নামবে না?'

'এসে গেলাম?' রূপসা চোখ মেলে তাকালো।

'কোনো পথই যে অশেষ নয়,' মৃদু হাসলো অনুভব।

'জানি। কিন্তু আজকাল মাঝে মাঝে তাতে আমার সন্দেহ হয়,' জানলার কাচ তুলতে তুলতে প্রায় স্বগতোক্তির মতো অস্ফুট সুরে জবাব দিলো রূপসা। তারপর গাড়ি থেকে নেমে গ্লোবের ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়ালো।

গাড়ির দরজা লক করে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো অনুভব, 'এবারে?'

'চলো, আগে ট্রেজার আইল্যাণ্ডে যাই। একটা শালোয়ার-কামিজ কিনবো। এদিকে একটু খিদেও পাচ্ছে। পেটে খিদে থাকলে কিছুই ভালো লাগবে না।'

'তাহলে? কোনটা আগে?'

'ওখানে গেলে দুটোই হবে।'

'সেকি! ট্রেজার আইল্যাণ্ডে সেসব ট্রেজারও পাওয়া যায় নাকি?' অনুভব অবাক হলো, 'আমি তো জানতাম ওখানে শুধু ...'

'তুমি অনেক কিছুই জানো না, অনুভব। আসলে চিরকালই তুমি ভীষণ বোকা।'

'তা বটে। তোমার কাছে আমি চিরদিন বোকাই রয়ে গেলাম।' ফের হাসলো অনুভব, 'চলো।'

'ওখানে একটু ঢুকেই সিঁড়ির কাছে ডান দিকে ছোট্ট একটা দোকান আছে। সেখানে চমৎকার হটডগ পাওয়া যায়, দামেও বেশ সস্তা। সেই সঙ্গে কোল্ড ড্রিংকস। আবিশ্যি জানি না, দোকানটা এখনও আছে কি না।'

'চমৎকার বন্দোবস্ত। কিন্তু সস্তায় কাজ সারতে তোমাকে কে বলেছে? তার চাইতে বরং কোনো একটা ডিসেন্ট জায়গায় বসে একটু রিল্যাক্স করলে হয় না?'

'রিল্যাক্সড হতে চাই বলেই কোথাও গিয়ে বসবো না। চলো।'

খেতে খেতে অনুভবের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকালো রূপসা, 'আজ তুমি আমাকে একটা সিনেমায় নিয়ে যেতে পারো? যে কোনো সিনেমা? খলনায়ক বা জয় সন্তোষী মা হলেও চলবে।'

'স্যরি, ওঁরা কেউই আজ এ তল্লাটে অ্যাভেইলেবল নন। তবে তুমি চাইলে অন্য কিছুর জন্যে খোঁজ করা যেতে পারে।' খাবারের পয়সা মিটিয়ে রূপসার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালো অনুভব, 'একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'কি?'

'আজ তোমার কি হয়েছে বলো তো?'

'কেন?' সুস্মিত মুখ রূপসার।

'কতোদিন কতো মিনতি করেও আমি তোমাকে নিয়ে কোনো সিনেমায় যেতে পারিনি। তুমি রাজি হওনি। কারণ হিসেবে যা বলেছো, তা নেহাতই যুক্তির মুখোশে হাজির করানো কিছু হাস্যকর অজুহাত। আমি তর্ক করতে পারতাম, কিন্তু করিনি। কারণ আমার ভালো লাগে না। তাছাড়া তোমার সঙ্গে তর্ক করা তো একেবারেই অর্থহীন। চিরদিনই তুমি মনে করো, তোমার যুক্তিগুলো অকাট্য, অন্যের গুলো কোনো যুক্তিই নয়। অথচ অন্য বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমায় যেতে তুমি অরাজি হওনি। এ ব্যাপারেও আমি কিছু বলিনি। কারণ তাহলে তুমি বলতে, আয়্যাম

জেলাস—যেটা শুনতে আমার একটুও ভালো লাগতো না। কিন্তু আজ হঠাৎ তুমি নিজে যেচে ...'

'ওঃ অনুভব, ইউ আর সো মিন!' মাঝপথেই অনুভবকে বাধা দিয়ে থামিয়ে দিলো রূপসা। 'তোমাকে বললাম না, আই ওয়ান্ট টু বি রিল্যাক্সড?'

'কিন্তু তোমার শালোয়ার-কামিজ?'

'অন্য একদিন হবে।'

'বেশ,' দু কাঁধে ঝাঁকুনি তুলে ট্রেজার আইল্যাণ্ড থেকে বেরিয়ে এলো অনুভব।

সিনেমার টিকিট পেতে কোনো অসুবিধে হয়নি। তবে ব্ল্যাকে। আজকাল কেউই বোধহয় কাউন্টার থেকে সরাসরি টিকিট পায় না। অলিখিত এজেন্সি সিস্টেম।

ছবিটা বিদেশী। ইনডিসেন্ট প্রোপোজাল। আচমকা অভাবিত এক অর্থনৈতিক দুরবস্থার মুখোমুখি হয়ে ফিল্মের নায়ক-নায়িকা—স্বামী ও স্ত্রী—নিজেদের শেষ সম্বলটুকুকে হাতিয়ার করে বেপরোয়ার মতো বেরিয়ে পড়েছিলো সম্পূর্ণ ডুবে যাবার আগে জীবনের অন্তত কয়েকটা দিন ইচ্ছেমতো উপভোগ করবে বলে। বিলাসবহুল এক হোটেলের জুয়ার আসরে সেদিন নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষায় মগ্ন ছিলো ওরা। সেখানে, সেই অবকাশে, রূপবান এক ধনকুবের মুগ্ধ হলো মেয়েটিকে দেখে এবং তারপরেই সে দুঃসাহসী এক অশোভন প্রস্তাব রাখলো ওদের সামনে। বিপুল ঐশ্বর্যের বিনিময়ে মেয়েটিকে সে সাময়িকভাবে নিজের করে পেতে চায়। এ প্রস্তাব, বলা বাহুল্য, ঘৃণাভরে ফিরিয়ে দিলো ওরা দুজনেই। কিন্তু তারপর বাস্তব বুদ্ধির নির্ভেজাল প্ররোচনায়, অভাবের অতলান্তিক খাদ থেকে ফিরে এসে নতুন করে জীবন গড়ে তোলার উজ্জ্বল প্রত্যাশায়, নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে এ প্রস্তাব মেনে নিলো ওরা। সবই ঠিক ছিলো এ পর্যন্ত। কিন্তু প্রায় শেষ মুহূর্তে স্বামীর কাছে সমস্ত হিসেব নিকেশ কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেলো। অহঙ্কার কিংবা অক্ষমতার জ্বালা অথবা বিবেকের দংশন এক অস্থির ঝড় জাগিয়ে তুললো তার বুকের গভীরে। প্রাণপণে ছুটে গিয়ে সে নিজের কাছে ফিরিয়ে আনতে চাইলো তার ঐশ্বর্যময়ী স্ত্রীকে—যে তার একান্ত নিজস্ব। কিন্তু ততোক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে, সে গিয়ে পৌঁছুবার আগেই নিষ্ঠুর হেলিকপ্টার রাতের আকাশে পাড়ি দিয়েছে তার স্ত্রীকে নিয়ে—যার সঙ্গী ধনকুবের সেই দ্বিতীয় পুরুষ। তারপর স্ত্রী আবার ফিরে আসে, অথচ ভালোবাসা ফেরে না—কিংবা ঢাকা পড়ে থাকে ঈর্ষা অবিশ্বাস আর আশঙ্কার আড়ালে। শুরু হয় টানাপোড়েন, পরস্পরের প্রতি অর্থহীন দোষারোপ, ফলে তিক্ত হয়ে ওঠে সম্পর্কের গ্রন্থি।

ছবিটা মগ্ন করে তোলে রূপসাকে। সম্পর্কের জটিল রূপান্তর—নৈকট্য থেকে রিক্ততা—একটু একটু করে নেশার মতো এক নিবিড় আচ্ছন্নতা এনে দেয় ওর সমস্ত সত্তায়। গাড়ি চালু করার আগে ওর দিকে তাকিয়ে অনুভব স্পষ্টই বুঝতে পারে, ও এখন পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন নতুন এক উদাসীন গ্রহ। এখন ওর সঙ্গে কথা বলা যায় না, দ্বিধা জাগে। এখন ওর মগ্নতা ভাঙানো এক অমার্জনীয় অপরাধ।

'কিছু বললে?' একটু পরেই প্রশ্ন করে রূপসা।

'তোমার ধ্যান ভাঙলো?'

'ধ্যান! কিসের?' রূপসার রেশমী কণ্ঠে বিস্ময়ের মীড়।

'আমি এক নগণ্য মানুষ। আমি কি করে রূপসীর ধ্যানের হদিশ পাবো?' পরিবেশ স্বাভাবিক করার প্রয়াসে চটুল রসিকতার আশ্রয় নেয় অনুভব।

'বাজে কথা ছেড়ে, কি বলছিলে বলো।'

'বিকেলেই তোমাকে একটা কথা জিগেস করবো ভেবেছিলাম, ভুলে গেছি। আর এতোক্ষণ মুখখানা যা করে রেখেছিলে, তাতে কথা বলতে ভরসা হচ্ছিলো না।'

'কি কথা?'

'তুমি আমাকে গাড়ি নিয়ে তোমাদের অফিসের কাছে অপেক্ষা করতে নিষেধ করেছিলে। কেন বলো তো?'

'কিছুদিন আগে মি. বালিগা আমাকে ওঁর গাড়িতে লিফট দিতে চেয়েছিলেন। পথে হয়তো এক কাপ কফির আবদার থাকতো। আমি রাজি হইনি। তার আগে বলেছিলেন মি. ঘোষ। আমি তাঁকেও ফিরিয়ে দিয়েছি। সবলেব প্রস্তাবেই যে স্বার্থচিন্তা থাকে, আমি তা বলছি না। অনেকেই এগুলো অ্যাকসেপ্ট করে, এতে হয়তো দোষেরও কিছু নেই। কিন্তু আমি এসব অ্যাভয়েড করি।'

'তো?'

'তোমার গাড়িতে আমাকে উঠতে দেখলে, অফিসের লোকেবা যা খুশি তাই ভেবে নিতে পারে। এমনিতেই তো আমার বদনামের অভাব নেই।'

'কাম অন, রূপসী। তাতে কি এসে যায় তোমার? তুমি তো এমন ছিলে না কোনোদিন?'

'ওহো অনুভব, প্লিজ! আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু প্রুভ এনিথিং নাউ।'

মুহূর্তের মধ্যে রূপসার কথার সুর ও মুখের অভিব্যক্তিতে বিরক্তির ঘন অরণ্য ফুটে ওঠে। অনুভব জানে, এটা ওর চরম অস্ত্র। যে কোনো যুক্তিকে ধ্বংস করার নির্মম পাশুপত।

'ইউ আর অলওয়েজ আ বাণ্ডল অফ কনট্রাডিকশনস,' অনুভব মৃদু হাসে।

ফ্রিস্কুল স্ট্রীট ছাড়িয়ে পার্ক স্ট্রীট। তারপর লাউডন স্ট্রীট। ঘাড় ফিরিয়ে একবার রূপসার দিকে তাকায় অনুভব। সিটে মাথা হেলিয়ে ক্লান্ত সম্রাজ্ঞীর মতো বসে আছে রূপসা। চুলগুলো উড়ছে বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। লম্বা চুল হলে এতোক্ষণে ওদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো অনুভবের মুখ ছুঁয়ে যেতো। চোখ দুটি বোজা। মুখখানা এদিকেই ঘোরানো। অ্যামেরিকান ডায়মণ্ডের নাকচাবিটা আলোর স্পর্শে মাঝে মাঝে ঝিকমিকিয়ে উঠছে উজ্জ্বল একটা পথহারা নক্ষত্রের মতো। দেখে মনে হয় ও যেন ক্লান্ত, বড়ো ক্লান্ত। কিন্তু কেন এ ক্লান্তি, রূপসী? কেন এতো বিষণ্ণ তুমি? তুমি কি জানো না, বিষাদের পেছনে থাকে হেরে যাবার মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা? তুমি বিষণ্ণ থেকো না রূপসী, কখনও না, কোনোদিনও না। আই ওয়ান্ট টু সি ইওর স্মাইলিং ফেস, মাই ডিয়ার। প্লিজ স্মাইল!

একটা ট্যাক্সি পেছন থেকে বারবার একঘেয়ে আলোর তীর ছুঁড়ছিলো। অনুভব ইচ্ছে করেই গাড়ি আস্তে চালাচ্ছিলো এতোক্ষণ, যাতে রূপসাকে যথাসম্ভব রিল্যাক্স

করার মতো একটু সময় ও সুযোগ দেওয়া যায়। এবারে সে বাঁ দিকে আরও খানিকটা সরে গিয়ে ট্যাক্সিটার পথ ছেড়ে দিলো। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই চোখ মেলে তাকালো রূপসা।

'সাইড করে গাড়িটা একটু দাঁড় করাও, অনুভব।' আধো অন্ধকারে রূপসার কণ্ঠস্বর কেমন যেন অলৌকিক বলে মনে হলো অনুভবের।

এদিকের রাস্তাগুলোতে আলোর তেমন তীব্রতা নেই। পথচারীর সংখ্যাও নিতান্ত কম। শুধু দ্রুত ছুটে চলা ট্যাক্সি আর প্রাইভেট গাড়ির যান্ত্রিক উপস্থিতি এখানকার মগ্ন চৈতন্যকে খানিকটা প্রগলভ করে রাখে। পানাজির মসৃণ পথঘাট, মাণ্ডবী নদীর ছলোছলো সান্ধ্য শরীর—সবকিছু মুহূর্তের মধ্যে চোখের সামনে ভেসে ওঠে অনুভবের। ওখানকার রাস্তায় স্ট্রীট লাইটের স্বল্পতা প্রথম প্রথম অনভ্যস্ত চোখে অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মনে হয় কাছেই বুঝি অপেক্ষা করছে সশস্ত্র কোনো দুষ্কৃতকারী। কিন্তু দুটো দিন কেটে গেলে ওই কমজোরি আবছা আলোই ভারি স্নিগ্ধ ও মোহময় বলে মনে হয়। তখন এই ভারতবর্ষেরই বড়ো বড়ো শহরগুলোকে তুলনামূলক দৃষ্টিতে মনে হয় বড়ো উৎকট, উজ্জ্বলতায় অশ্লীল। আসলে সবাইকে সবকিছু মানায় না। যেমন রূপসীকে মানায় না বিষাদের মলিন আবরণ।

গাড়ি থামিয়ে বাঁ দিকে তাকায় অনুভব। কোনো প্রশ্ন করে না।

'তোমার এই গুণটা বড়ো ভালো,' অস্ফুট কণ্ঠস্বর রূপসার।

'কোনটা?'

'কৌতূহল থাকলেও, তুমি তা সংযত করতে জানো। কারণ তুমি জানো, প্রশ্ন করলে অনেক সময় মিথ্যে কথা শুনতে হয়।'

অনুভব কোনো জবাব দেয় না, শুধু তার ঠোঁট দুটি বেঁকে ওঠে সামান্য। আধো আলোয় এ অভিব্যক্তিকে বিদ্রূপের ছবি বলে ভুল হতে পারে।

'আমাকে একটা চুমু দেবে, অনুভব? এখন?'

অনুভবেব মস্তিষ্কে বিদ্যুতের শিহরণ জাগে। এই মুহূর্তে এ কোন রূপসা বসে আছে তার পাশে? এমন আর্তি কেন ওর কণ্ঠস্বরে? ও কি জানে না ওর শক্তির সীমানা?

অনেক—অনেক দিন আগেকার একটা গ্লানিময় স্মৃতি আবার নতুন করে মনে পড়ে অনুভবের। সেদিন এক আকস্মিক আগ্রাসী মুহূর্তে রূপসাকে জড়িয়ে ধরে একটা চুমু খেয়েছিলো সে। রূপসা কোনো প্রতিরোধ করেনি, অথচ সাড়াও দেয়নি এতোটুকু। শুধু বলেছিলো, 'তুমি আমার খুব ভালো বন্ধু, অনুভব। সেক্স সম্পর্কে কোনো ট্যাবুও আমার নেই। কিন্তু আর কোনোদিনও তুমি এমন কোরো না। প্লিজ। আমার কেমন যেন মনে হয়, তাহলে আমাদের এই সম্পর্কটা আর বেশিদিন সুন্দর থাকবে না। নষ্ট হয়ে যাবে। আর তাহলে আমি কিন্তু ভীষণ কষ্ট পাবো।'

অনুভব তখন চিৎকার করে বলতে চেয়েছিলো, 'আমি তোমার কথা মানি না, রূপসী। আমি প্রমাণ করে দেবো, তোমার এ আশঙ্কা মিথ্যে।' বলতে চেয়েছিলো, 'তুমি আমার জীবনের এক পরম ঐশ্বর্য। আমি যন্ত্রণায় নীল হয়ে গেলেও, কোনো শর্তেই, আমাদের সম্পর্কের এই ঐশ্বর্যকে নষ্ট হতে দেবো না।' কিন্তু এসবের কিছুই

সে বলেনি। শুধু বলেছিলো, 'কথা দিচ্ছি না। তবে আমি চেষ্টা করবো।'

'চেষ্টা করলে তুমি পারবে, নিশ্চয়ই পারবে। আমি জানি।' খুশি হয়ে মাথা ঝাঁকিয়েছিলো রূপসা।

কতোদিন আগেকার কথা। তবু আজও সেই ঘটনাকে অনুভবের বড়ো গ্লানিময় বলে মনে হয়। পরাজয়ের গ্লানি।

'দেবে না?' অনুভবের বাঁ হাতটা নিজের হাতে টেনে নেয় রূপসা।

একটু যেন চমকে উঠলো অনুভব। তারপর যেন স্বপ্নের মধ্যে হাত বাড়িয়ে রূপসাকে টেনে নিলো নিজের একেবারে কাছাকাছি। চুমু দিলো গভীর আশ্লেষে, নিবিড় মমতায়—যেন রূপসা অচিন দেশের এক সোহাগী পাখি, একটু অসতর্ক হলেই যার ডানা ভেঙে যেতে পারে।

ফিসফিসিয়ে অনুভব বললো, 'হোয়াই ডোন্ট ইউ কিল মি! হোয়াই?'

ওর কাঁধে মেলে রাখা অনুভবের বাঁ হাতটা নিজের মুঠোয় শক্ত করে চেপে ধরলো রূপসা, 'ইউ ডিজার্ভড ইট। কিন্তু আমার কাছে তুমি আর কোনোদিনও কিছু চেয়ো না, অনুভব। তুমি চাইলে, আমি বোধহয় তোমাকে ফেরাতে পারবো না।'

'চেষ্টা করবো,' সেই পুরনো জবাবটাই অস্ফুটে পুনরাবৃত্তি করলো অনুভব।

'কিসের?'

'কিছু না চাইবার।'

'মনে মনেও চেয়ো না, কেমন?'

বুকের মধ্যে আবার সেই যন্ত্রণাময় রক্তপাত। একেই কি প্রাণেশ্বরী যন্ত্রণা বলে? তুমি কি করে এতো নিষ্ঠুর হও, রূপসী!

গাড়ি এতোক্ষণে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে এসে পড়েছে। অনুভব ঠিক করলো, এর পরে সে মতিলাল নেহরু রোড হয়ে মনোহর পুকুর দিয়ে সোজা রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে গিয়ে উঠবে।

'অনুভব?'

'বলো।'

'জানো, আজ অনেক দিন হয়ে গেলো, সুদূর আমাকে আর আদর করে না। আমার স্পর্শ তো দূরের কথা, আমার উপস্থিতিকেই ও বোধহয় এখন ভয় পায়।'

শপাং করে একটা নির্দয় চাবুক যেন আচম্বিতে অনুভবের নগ্ন মুখে আছড়ে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে মুখের সবটুকু রক্ত যেন উধাও হয়ে যায় কোথায়। আমি কি তবে সাবস্টিটিউট মাত্র? একি তবে ভালোবাসা নয়? শুধু দয়া, শুধু করুণার দান? রূপসা, আমার এই অর্থহীন যান্ত্রিক বশ্যতার জীবনে 'রূপসী' এক মধুর যন্ত্রণার নাম, যাকে ভুলে থাকার মতো যন্ত্রণা আর কিছু নেই। তাই আমি চেষ্টা করলেও ভুলতে পারি না তোমাকে। তাই তোমার ডাক এলে আমি সমস্ত সংকল্প অকাতরে বিসর্জন দিয়ে পাগলের মতো ছুটে যাই তোমার কাছে। তুমি আমাকে ভালোবাসা দিতে না পারো, করুণা দিও না—দয়া দিয়ে অপমানিত কোরো না আমার ভালোবাসাকে। প্লিজ!

'তোমার শুনতে ভালো লাগলো না, না?' ফের প্রশ্ন করে রূপসা।

অনুভব কোনো জবাব দেয় না।

'কি হলো, কিছু বলছো না যে?'

অনুভব তবুও নির্বাক।

'আমি কি তোমাকে দুঃখ দিলাম?' অনুভবের মুখের দিকে তাকিয়েই সবকথা স্পষ্ট হয়ে যায় রূপসার কাছে, 'সারি অনুভব, তুমি বোধহয় আমাকে ভুল বুঝেছো। না, কেউ কোনোদিনও অন্য কারুর বিকল্প হতে পারে না। তুমি কি মনে করো, আমি জেনে বুঝেও তোমাকে অমন অপমান করবো?'

'তা মনে করতে আমার খারাপ লাগবে।'

'আমার ভেতরটা বড়ো অশান্ত হয়ে উঠেছিলো, তুমি বুঝতে পারোনি। আমার সত্যিই ইচ্ছে করছিলো তোমার আদর পেতে। বিশ্বাস করো।'

'করলাম,' অনুভবের মুখের পেশীগুলো আবার নরম হয়ে ওঠে।

'কিন্তু আমাব কথা আমি তোমাকে ছাড়া আর কাকে বলবো বলো তো? আমি যে আর পারছি না, অনুভব!'

বাঁ হাত বাড়িয়ে রূপসার কোলে অসহায়ের মতো লুটিয়ে থাকা ডান হাতখানা নিজের মুঠোয় তুলে নেয় অনুভব, 'কি হয়েছে?'

'সুদূর দিনের পর দিন আরও বেশি করে ফ্রাসট্রেটেড হয়ে যাচ্ছে। আমার ভয় হচ্ছে, কোনোদিন ও একটা অঘটন না ঘটিয়ে বসে।'

'আমার মনে হয় না, ও তেমন কিছু করবে।'

'কি করে বুঝলে?'

'ওর বোধহয় তেমন সাহস নেই।'

রূপসা নিশ্চুপ হয়ে থাকে। একটা সিগারেট ধরিয়ে অনুভব ফের বলতে থাকে, 'সুদূব আমার অনেক দিনের বন্ধু। বেশ ঘনিষ্ঠ বন্ধুই বলা চলে। ওব মধ্যে বহুদিন আগেই আমি একটা লুকোনো হীনম্মনাতার আভাস পেয়েছিলাম। তোমাকে কিছু বলিনি—কোনোদিনও না। বললে তুমি হয়তো আমাকে ভুল বুঝতে। আমি জানি তুমি ওকে আজও পাগলের মতো ভালোবাসো। কিন্তু কিছু মনে কোরো না, ওকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারি না। যখনই মনে হয় তোমার জীবনটা দিন দিন অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে, তখনই আমার ভেতরটা রাগে দুঃখে অশান্ত হয়ে ওঠে। মনে হয় ওই মুহূর্তে আমি বোধহয় ওকে খুন করে ফেলতে পারি।'

'না অনুভব, সব দোষ তো ওর নয়। তুমি ভুলে যেও না, এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ দায়িত্ব কিন্তু আমারই। আমি সবকিছু জেনেশুনেই ওকে ...'

'সবকিছু?'

'না, সবটা নয়। তবে যেটুকু আমি জানতাম না, সেটুকু তখন ওরও অজানা ছিলো।'

'আর ইউ শিওর?'

'ইয়েস, আই অ্যাম। আর যাই হোক, এ ব্যাপারে ও আমাকে মিথ্যে কিছু বলেনি। বললে আমি তা বুঝতে পারতাম।'

'বেশ। কিন্তু বাস্তব সত্যটা যখন জানা গেলো, তখন ওর তো উচিত

'আমাকে মুক্ত করে দেওয়া, তাই না?' অনুভবের মুখের কথা কেড়ে নেয় রূপসা, 'সুদূর তো তাই চায়। কিন্তু আমি যে তা চাই না! আমি ওকে নিয়েই সুখী হতে চাই, তা যে কোনো মূল্যেই হোক না কেন।'

'এ তোমার অহেতুক জেদ। এ জন্যে যদি তোমাকে সর্বস্বান্ত হতে হয়?'

'হবো, আই ডোন্ট মাইণ্ড।'

'ফাইন।' অনুভবের বঙ্কিম ঠোঁটে বিদ্রূপের বদলে বেদনার ছায়া ঘনিয়ে ওঠে। 'তুমি কোনো ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করেছো?'

'করেছি।'

'তারপর?'

'তিনি বলেছেন, ব্যাপারটা সম্ভবত মানসিক।'

'তাহলে ওকে নিয়ে তেমন কোনো বিশেষজ্ঞের কাছে যাচ্ছো না কেন?'

'ও রাজি নয়।'

'চমৎকার। তাহলে তুমি ভাগ্যের হাতে শুধু মার খেয়েই মরো। আর আমরা না হয় রুমালে চোখের জল মুছে, মনে মনে বলবো, রূপসার কোনো তুলনা হয় না —রূপসা এক আদর্শ ভারতীয় নারী।'

'ঠাট্টা করছো?'

'একে তুমি ঠাট্টা বলো? আমার রাগ হয়, দুঃখ হয়। অথচ আমার হাত-পা বাঁধা, আমার কিছুই করার নেই—কারণ তোমাদের জীবনে আমি একজন আউট সাইডার, স্রেফ একটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার।'

'তুমি বড্ড ইমোশনাল।'

'সেজন্যে আমি গর্বিত। তবে তুমি কেমন বাস্তববাদী, তা আমি বুঝতে পারি না। আচ্ছা, তুমি কি চাও তা কি তুমি নিজে জানো?'

'জানি, অনুভব। আমি লড়াই করতে জানি। আমার উদ্দেশ্যটা আমার কাছে ভীষণ পরিষ্কার। সহজে হাল ছাড়তে আমি রাজি নই। আমি এর শেষ অব্দি দেখবো।'

আবছা আলোয় অনুভব লক্ষ্য করলো, রূপসা আবার সিটে মাথা এলিয়ে দিয়েছে। দু চোখ বন্ধ। যেন খুব নিশ্চিন্ত, এখুনি ঘুমিয়ে পড়বে। অথচ ওর সুগন্ধি ঠোঁটের পাতায় আশ্চর্য এক সঙ্কল্পের দৃঢ় অঙ্গীকার।

২

ফাইলে কলম চালাবার ফাঁকে ফাঁকেই সুদূর অনুভব করছিলো, বুকের বাঁ দিক থেকে অস্পষ্ট একটা চিনচিনে ব্যথা ক্রমশ তার নাভির দিকে নেমে যাচ্ছে। অফিসে

আসার সময় গাড়িতেও কয়েক মুহূর্তের জন্যে একবার বোধহয় ঠিক এমনি হয়েছিলো—এখন আর স্পষ্ট মনে পড়লো না। সুদূরের জেনারেল হেলথ বরাবরই যথেষ্ট ভালো। ডাক্তার বদ্যির তেমন কোনো প্রয়োজন হয় না। তাহলে আজ হঠাৎ এমন হচ্ছে কেন? একদিনেই দু বার? তবে কি এটা অ্যানজাইনা? হার্ট ব্লক? হাসি পায় সুদূরের। তা হলেই বা মন্দ কি! এরপর হঠাৎ একদিন কোনো সঙ্কেত না দিয়েই একটা ম্যাসিভ স্ট্রোক, তারপর দা এণ্ড অফ আ ইউজলেস জার্নি। অনেকের মতো সুদূরের কিন্তু তাহলে কোনো আফসোস থাকবে না। বরং মুক্ত হওয়া যাবে, মুক্তি দেওয়া যাবে। প্রায়শ্চিত্ত? তাও সেই অবকাশে হয়ে যাবে হয়তো। কিন্তু তাই বলে এভাবে? এ যে পঞ্চাশ দশকি সিনেমার ছিঁচকাঁদুনে মেলোড্রামাটিক ক্লাইমেক্স! রূপসা শুনলে দুঃখ পাবার বদলে হো হো করে হেসে উঠবে। তারপর গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে বলবে, 'ট্র্যাশ। মরবিড।' বলবে, 'তোমার চিন্তাধারার এমন অবনতি আমি কল্পনাও করতে পারি না। আই ফিল ব্যাড।'

কলম নামিয়ে রেখে পকেট থেকে রুমাল বের করে, অকারণে মুখটা একবার মুছে নিলো সুদূর। এক চুমুক জল খেয়ে অনামনস্ক ভঙ্গিতে দেয়ালে ঝোলানো ক্যালেণ্ডারটার দিকে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর সিগারেট ধরাতে ধরাতে ভাবলো, আপাতত রূপসাকে এ ব্যাপারটা জানাবার কোনো প্রয়োজন নেই। অন্তত আজ তো নয়ই। তবে ইতিমধ্যে একদিন কোনো কার্ডিওলজিস্টকে দিয়ে একটা চেক আপ করিয়ে নিলে মন্দ হয় না। দরকার হলে না হয় একটা ই. সি. জি। কারণ কিছুই বলা যায় না, এ সমস্ত রোগে বয়েসটা আজকাল আর কোনো ফ্যাকটরই নয়।

কিন্তু কি হবে? কি লাভ?

বলা যায় না, কিছু লাভ হলেও হতে পারে। হয়তো একটু সতর্ক হলেই এড়িয়ে যাওয়া যাবে বড়ো রকমের কোনো দুর্ঘটনা। কারণ মরে গেলে তো চুকেই গেলো সবকিছু, কিন্তু স্ট্রোক হলেই তো মানুষ মরে না—অথর্ব বা পঙ্গু হয়েও বেঁচে থাকতে পারে শেষ বয়েস পর্যন্ত। এবং তেমন কিছু হলে রূপসার বোঝা সে বাড়িয়েই তুলবে—কারণ রূপসা তখন বোঝা নামাবার কথা আদৌ ভাববে না এবং সেটা আরও ভয়ঙ্কর কথা।

মাঝে মাঝে রূপসার ব্যক্তিত্বের কাছে নিজেকে ভীষণ অসহায় বলে মনে হয় সুদূরের। ওকে কিছুতেই টলানো যায় না। বড়ো বেশি জেদি। চোখে আঙুল দিয়ে ভুল ধরিয়ে দিলেও ও নিজের সিদ্ধান্ত থেকে এক চুল নড়ে না, নিজস্ব যুক্তি নিয়ে নিজের সিদ্ধান্তে অনড় হয়ে থাকে। তখন রাগ হয়, বিরক্তি আসে। মনে হয় ওর কাছে কারুরই কোনো প্রয়োজন নেই। অথচ কিছুটা এগিয়ে নিজের ভুল বুঝতে পারলে, ও তৎক্ষণাৎ নিজের সিদ্ধান্ত বদলে নিতে এতোটুকু ইতস্তত করে না।

আসলে ইগো প্রবলেম। অর্থহীন আত্মসম্ভ্রম বোধ। আসলে রূপসা ভীষণ স্বার্থপর আর প্রচণ্ড নিষ্ঠুর। নিজের জীবন সম্পর্কে নিজের সিদ্ধান্ত বজায় রাখার ব্যাপারে ও আপোসহীন, চূড়ান্ত স্বার্থপর। নিজের ক্ষতি সত্ত্বেও ও তখন কারুর মতামতকে গ্রাহ্য করে না, অতি প্রিয়জনকেও নির্দয় আঘাত করতে ইতস্তত করে না।

সি ইজ আ বিচ!

কথাটা মনে হতেই চমকে ওঠে সুদূর। রূপসাকে সে কি সত্যিই বিচ বলে মনে করে?

হ্যাঁ, আমি তাই মনে করি। আমি মনে করি সি ইজ আ বিচ, আ হোর। আমি চাই আমার এ ধারণাটা সত্যি হয়ে উঠুক। রূপসা নেমে আসুক ওর ওই উঁচু বেদীটা থেকে, ও নেংরা হয়ে যাক। নইলে আমি হেরে যাবো, প্রতিনিয়ত হেরে যাবো। আমি ছোটো হয়ে যাবো আমার নিজের কাছে, আমার আত্মার কাছে। আর কতোদিন আমি এমন করে অপমানিত হবো, পৃথিবী?

'কি ভাবছেন অতো?'

'কিছু বললেন?' সামান্য সচকিত হয়ে অসীম পালের দিকে তাকালো সুদূর। একই কেবিনে বসে ওরা দুজনে। মি. পাল অবিশ্যি বয়সে ঈষৎ প্রবীণ। কিন্তু ভারি হাসিখুশী, অসামান্য রসবোধ।

'বলছি যে, কি ভাবছেন?'

'তেমন কিছু নয়,' সুদূর ফাইলের দিকে তাকায়।

'কিছু নয় বললেই হলো?' মি. পাল সহজে ছাড়ার পাত্র নন। 'সেই থেকে দেখছি, একদৃষ্টিতে ক্যালেণ্ডারটার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। এমন তো নয় যে ওতে ন্যাংটো মেয়েমানুষের ছবি রয়েছে! স্রেফ বরফে ঢাকা দুটো পাহাড়ের চূড়ো। তা ওতে কি এমন মধু পেলেন মশাই? নাকি ওটা দেখে যুগল-সুমেরুর কথা ভেবে মন কেমন করছে?'

'কি যে বলেন।' সুদূর অপ্রস্তুত হয়, আরক্তিম হয়ে ওঠে সারা মুখ। ফর্সা হওয়ার এই এক বিপদ।

'তবে?'

'বললাম তো, কিছু নয়। কেন মিছিমিছি পেছনে লাগছেন, দাদা?'

'বুঝেছি। কাল বাস্তিরে ডোজটা বোধহয় সঠিক মাত্রায় হয়নি?'

'কিসের ডোজ?'

'দূর মশাই, আপনি দেখছি কিছুই বোঝেন না। কিন্তু দেখে তো মোটেই বোকাসোকা বলে মনে হয় না। তা ইচ্ছে করেই এমন ভিজে বেড়াল হয়ে থাকেন নাকি, যেন ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানেন না? অবিশ্যি তাতেও একটা আলাদা মজা থাকে—কেউ খাবে বলে ভাজা মাছটা হয়তো নিজে থেকেই উলটে গেলো, কি বলেন?'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।' পকেট থেকে সিগারেট বের করে সুদূর, 'নেবেন?'

'দিন একটা,' অসীম পাল হাত বাড়ালেন। তারপর সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'শুনুন, ডোজ হচ্ছে ঘুমের ওষুধের ডোজ। প্রাপ্তবয়স্ক, সক্ষম, স্বাস্থ্যবান পুরুষমানুষের ঘুমের ওষুধ। এবারে বুঝেছেন?'

খুকখুক করে হেসে উঠলেন অসীম পাল।

ততোক্ষণে সুদূরের গলা শুকিয়ে কাঠ। তার রুচি শিক্ষা ও ভদ্রতাবোধ, সবকিছু

একসঙ্গে মিলে যেন তার বাকশক্তি হরণ করে নিয়েছে। অথচ সে বুঝতে পারে, এ এক অর্থহীন সংস্কার। চল্লিশোর্ধ্ব বয়েস, সংসারী এবং দু-একটি সন্তানের জনক বা জননী হলেই এ দেশের মানুষকে যেন জোর করে যৌনতাবোধ ভুলে যেতে হবে। যেন তাদের মধ্যে কামনা বাসনা থাকতে নেই, থাকলেও তা প্রকাশ করা এক অমার্জনীয় রুচিহীন বিকার। সমাজ তাদের যেন সন্ন্যাসী না বানিয়ে ছাড়বে না। সংসারে থেকেও ওই একটি বিষয়ে তাদের নির্বিকার হয়ে থাকতে হবে, নির্লিপ্ত সন্ন্যাসীর মতো। তাহলেই তারা আদর্শ পিতা আর মহিয়সী মা। সুদূর ভেবে পায় না, যারা এসব কথা প্রচার করে, তারা কি কখনও আরশির সামনে দাঁড়ায় না? আরশিতে তারা কি নিজেদের ছায়া দেখতে পায় না? আসলে ওরা সব হিপোক্রিট আর হামবাগের দল। তাছাড়া মি. পাল তার সহকর্মী। বয়সের দোহাই মেনে নিয়ে মানুষকে কি সহকর্মীর কাছেও মুখ বুজে থাকতে হবে?

স্কটিশের পুলকের কথা মনে পড়লো সুদূরের। ইতিহাসে অনার্স নিয়ে পড়তো। বাঁধিয়ে রাখার মতো মুখ, খিস্তি ছাড়া একটা লাইনও বলতো কি না সন্দেহ। সেই পুলক একদিন বলেছিলো, 'খিস্তিখাস্তা করলে জানিস তো, মনটা খুব সাফ থাকে। নইলে যতো গণ্ডগোল, সব ওই মনে গিয়ে জোট বাঁধে। আরে পেটে ঝামেলা থাকলে কি দাঁত মেজে মুখের দুর্গন্ধ তাড়ানো যায়? যে মালগুলো মুখে যতো ভদ্দরলোক, জানবি সেগুলো পেটে পেটে ততো রামখচ্চর।' অবিশ্যি কথাটার মধ্যে কতোখানি সত্যতা আছে, সে সম্পর্কে সুদূরের ধারণা এখনও খুব একটা স্পষ্ট নয়।

'কিছু মনে করলেন নাকি?'

'না না, তা কেন।' অসীম পালের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে সুদূর।

'আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে আপনি বিব্রত বোধ করছেন। কিন্তু আসলে তার কোনো কারণ নেই। আমরা দুজনেই প্রাপ্তবয়স্ক, শুধু আমি বয়সে খানিকটা বড়ো— এই যা। তবে নিজের ছেলেও প্রাপ্তবয়স্ক হলে, তার সঙ্গে মিত্রের মতো আচরণ করার বিধি আছে।'

'জানি।'

'আমি লক্ষ্য করেছি, সেক্স নিয়ে কোনো আলোচনায় আপনার উৎসাহ নেই। কিন্তু জীবনে সেক্সের দাবিকে কি অস্বীকার করা যায়? আমার তো মনে হয় ওটাও মানুষের বেসিক নিডসগুলোর মধ্যে পড়ে। ওটা না থাকলেই সংসারে খিটিমিটি, একজনের সমস্ত গুণকে ছাপিয়ে তার দোষগুলোই তখন অন্যজনের কাছে বড়ো হয়ে ওঠে। তাছাড়া সেক্স ইজ দা ওনলি এক্সারসাইজ দ্যাট ইউ ক্যান ডু বিফোর ইওর স্লিপ, টু ব্রিং আ গুড স্লিপ। তাই না?'

ভদ্রলোক হয়তো আরও কিছু বলতেন। কিন্তু সুদূরকে বাঁচিয়ে দিলো মার্কেটিং ম্যানেজার মি. দাভের খাস বেয়ারা আনোয়ার। জানালো, সাহেব তাকে ডেকেছেন। আর্জেন্ট।

মি. দাভে টেলিফোনে কথা বলছিলেন, ইঙ্গিতে সুদূরকে বসতে বললেন। সামান্য কিছুক্ষণের মধ্যেই সুদূর বুঝতে পারলো, ভদ্রলোক ভীষণ উত্তেজিত। সাধারণত উনি খুব ঠাণ্ডা গলায় কথা বলেন, রাগ হলেও সংযত থাকতে জানেন এবং ওঁর

কণ্ঠস্বর কখনই স্বরগ্রামের সেই মাত্রা ছাড়ায় না, যা অধস্তন কর্মীদের পক্ষে আতঙ্কজনক হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত। টুকরো টুকরো একপেশে যে সমস্ত কথা সুদূরের কানে আসছিলো তাতে মনে হলো, কোনো একটি বিশেষ সংবাদ অত্যন্ত দেরিতে এসেছে বলেই ওঁর এই উষ্মা।

অবশেষে রিসিভার রেখে মি. রমেশ দাভে খানিকক্ষণ নির্বাক হয়ে বসে রইলেন। সম্ভবত আত্মস্থ হবার আন্তরিক প্রচেষ্টায়। তারপর এক চুমুক জল খেয়ে বললেন, 'সারি মি. মুখার্জি, আই গট ম্যাড।'

সুদূর নিশ্চুপ হয়ে রইলো।

'তারপর আপনার খবর কি, বলুন। লাস্ট সানডেতে ট্যাণ্ডনের পার্টিতে এলেন না কেন? আমরা আশা করেছিলাম আপনি নিশ্চয়ই ওখানে থাকবেন, উইথ ইওর ওয়াইফ।'

সুদূর প্রমাদ গুনলো। এ কিসের ভূমিকা? দাভে তো অকারণে এমন পীরিত দেখাবার পাবলিক নয়!

'এ সমস্ত সোশ্যাল গ্যাদারিং মিস করতে নেই, বুঝেছেন?' রমেশ দাভে একটা সিগারেট নিয়ে প্যাকেটটা সুদূরের দিকে এগিয়ে দিলেন। তারপর সিগারেটটা ধরিয়ে একটু চিন্তিত সুবে বললেন, 'একটু আগে ফ্যাক্সে মেসেজ এসেছে, আমাদের ম্যানেজিং ডাইরেকটার মি আহুজা আগামী কাল ইভিনিং ফ্লাইটে বম্বে থেকে এখানে এসে পৌছোচ্ছেন। এবং আমাদের বোর্ডের আরও একজন, আ ভেরি ডিসটিংগুইশড অ্যাণ্ড ইনফ্লুয়েনশিয়াল মেম্বার, মিসেস সোনাল নানাবতী ইজ অ্যাকম্পানিং হিম।'

সুদূর বুঝতে পারছিলো, যে কোনো কারণেই হোক মি. দাভে খানিকটা বিচলিত। তাই দ্রুত আসল প্রসঙ্গটা তোলার প্রয়াসে সে আলতো করে জিগেস করলো, 'কেন?'

'ইয়েস, আয়্যাম কামিং টু দ্যাট পয়েন্ট,' মি. দাভে ঘাড় নাড়লেন। 'আপনি তো জানেন, স্টেটসে যারা আমাদের সোল সেলিং এজেন্ট তাদের কনট্রাক্ট পিরিয়ড এ মাসেই এক্সপায়াব করছে। আগামী পরশু রাতে পার্ক হোটেলে সেই কনট্রাক্ট রিনিউ হবার কথা। আমি ওদের কথা দিয়েছিলাম, এ ব্যাপারে কোনো অসুবিধে হবে না। হবার কোনো কথাও নয়, কারণ ওদের পারফরম্যান্সে আমরা হানড্রেড পার্সেন্ট স্যাটিসফাইড। মি. আহুজাও এ ব্যাপারে অরাজি নন। কিন্তু গোলমালটা শুরু করেছে প্রকাশ আগরওয়াল। দ্যাট সান অফ আ বিচ এখন মিডলম্যান হয়ে অন্য একটা কোম্পানিকে এজেন্সিটা পাইয়ে দেবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। সাকসেসফুল হলে দ্যাট বাস্টার্ড উইল আর্ন আ ফরচুন। অ্যাণ্ড আনফরচুনেটলি, সাম হাউ অর আদার, হি হ্যাজ সাম ইনফ্লুয়েন্স অন মিসেস নানাবতী। এটাই আমার ভয়।'

সুদূর পরিষ্কার বুঝতে পারলো, কনট্রাক্ট রিনিউয়ালের ব্যাপারে ইতিমধ্যেই প্রচুর নিভাঁজ নোট রমেশ দাভের ওয়ালেটে এসে জমা হয়েছে। আরও আসবে। এবং এ ব্যাপারে যেভাবেই হোক না কেন, সুদূরকে উনি দাবার ছকে বোড়ের মতো ব্যবহার

করতে চান। বিষয়টাতে রোমাঞ্চিত হবার মতো যথেষ্ট উপাদান থাকা সত্ত্বেও সুদূর বিন্দুমাত্র চঞ্চলতা অনুভব করলো না। অকম্পিত গলায় সে প্রশ্ন করলো, 'এসব কথা আপনি আমাকে বলছেন কেন?'

'বলবো। কিন্তু তার আগে মিসেস নানাবতী সম্পর্কে আপনার কিছু জানা দরকার।' প্রায় শেষ হয়ে আসা সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে ফেলে, ফের একটা সিগারেট ধরালেন মি. দাভে। তারপর গল্প বলার মতো অন্তরঙ্গ সুরে বললেন, 'মিসেস নানাবতীর বাবা ছিলেন আর্মি অফিসার, লেফটেন্যান্ট রাজিন্দর সিং গিল, মা বাঙালী। মহিলা প্রচণ্ড বিদুষী, হার্ভার্ড থেকে ইকনমিক্সে পোস্ট গ্রাজুয়েশন এবং তারপর এম. বি. এ. করেছেন। ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ ও স্পানিশ ভাষায় সমান দখল। বাংলা, হিন্দি, পাঞ্জাবী ও মারাঠি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন। সাংঘাতিক অ্যাম্বিশাস। এবং আমার ধারণা, ব্যবসার ব্যাপারটা উনি অনেকের চাইতেই বেশি ভালো বোঝেন। কিন্তু এহেন অসাধারণ মহিলারও কিছু কিছু দুর্বলতা—আই মিন ভাইসেস—আছে। আপনাকে সেগুলোর সুযোগ নিতে হবে।'

'কি রকম?' শুকনো গলায় প্রশ্ন করলো সুদূর।

মি. দাভে রহস্যময় কণ্ঠে বললেন, 'মি. মুখার্জি, আপনি স্মার্ট টল ফেয়ার অ্যাণ্ড হ্যাণ্ডসাম। এ ধরনের পুরুষ সম্পর্কে মিসেস নানাবতীর অশেষ দুর্বলতার কথা অল্পবিস্তর অনেকেই জানে। গিভ হার কমপ্যানি। উনি হুইস্কি খেতে ভালোবাসেন—হুইস্কি অন দা রকস—ইমপোর্টেড স্টাফ। খাওয়াবেন। তরপর ফ্লোর শো, ডান্স, ক্যাবারে, স্ট্রিপ কিংবা মোটরে লম্বা রাইড অথবা কোনো নামী-দামী হোটেলের হানিমুন সুইট—মোটকথা যা উনি চাইবেন। আকচুয়ালি স্কাই ইজ দ্য লিমিট।'

সুদূর স্তব্ধ হযে বসে থাকে। এমন একটা অভাবিত প্রস্তাবের কথা সে এতোক্ষণ কল্পনাও করতে পারেনি। মি. দাভে তখনও চাপা গলায় বলছেন, 'আমার কথা মিলিয়ে নেবেন মি. মুখার্জি, এমন ওয়ার্ম এক্সপেরিয়েন্স আপনি জীবনেও ভুলবেন না। আপনার পক্ষে এটা হবে একটা বোল্ড অ্যাণ্ড বিউটিফুল এন্টারটেইনমেন্ট উইদাইট এক্সপেন্সেস। ভয়ের কিছু নেই, রিস্ক যদি কিছু থাকে তো তা শুধু আমার। ঠিক আছে?'

মি. রমেশ দাভে নিঃশব্দে মৃদু হাসছিলেন। সুদূরের মনে হচ্ছিলো, ওঁর হাসিটা বড়ো অশ্লীল। মনে হচ্ছিলো, এখন যে কোনো মুহূর্তেই সে বোধহয় বমি করে ফেলবে।

'তাহলে মি. মুখার্জি, ওই কথাই রইলো।' দাভে এখন প্রসঙ্গটায় অতি দ্রুত সমাপ্তি আনতে চাইছেন, ' আগামী কাল সন্ধ্যায় ওদের রিসিভ করতে আপনি আমার সঙ্গে দমদম যাচ্ছেন। তারপর থেকে আপনি মিসেস নানাবতীর এসকর্ট। এবং তারপর—ওয়েল—তারপর সবটাই আপনার দক্ষতা আর আমার লাক।'

অর্থাৎ রমেশ দাভে, তুমি আমাকে একটা মেল প্রসটিটিউট—একটা পুরুষ বেশ্যা হিসাবে ব্যবহার করবে বলে ভেবে রেখেছো। কিন্তু তোমার পবিকল্পনার গোড়াতেই একটা মারাত্মক গলদ রয়ে গেছে। তুমি কি জানো, রামায়ণের রাবণ রাজা একটা আশ্চর্য সিঁড়ি তৈরি করার পরিকল্পনা করেছিলেন? তার নাম 'স্বর্গের সিঁড়ি'। তিনি

মনে করেছিলেন, দুনিয়ার তামাম পাপীতাপী আদর্শহীন মানুষ সেই সুবর্ণ সিঁড়ি দিয়ে অনায়াসে সুখের স্বর্গে চলে যেতে পারবে—স্বর্গ তখন আর গুটিকয়েক পূণ্যবানের আওতায় থাকবে না। কিন্তু রাবণের সেই পরিকল্পনা সফল হয়নি, দাভে—কোনোদিনও তা হয় না।

'এতে লাভ কি হবে?' প্রশ্ন করলো সুদূর।

'লাভ? রমেশ দাভের মসৃণ ঠোঁটে মৃদু ভাঁজ পড়লো। 'মিসেস নানাবতী আপনাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলে, প্রকাশ আগরওয়াল কিছুতেই ওঁর সঙ্গে একান্তে কোনো আলোচনা করার সুযোগ পাবে না। ব্যাস, দ্যাটস অল!'

হঠাৎ তীরের মতো তীব্র তীক্ষ্ণতায় ঝলসে উঠলো সুদূর, 'অ্যায়্যাম স্যরি মি. দাভে, আমি এসবের মধ্যে নেই।'

'সেকি!' মি. দাভের রোমশ ভুরু দুটো ঈষৎ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে, 'কেন?'

'আমি পারবো না, আমি ধরা পড়ে যাবো,' সুদূর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

'ছেলেমানুষ। এতো ভয় থাকলে জীবনে উন্নতি করবেন কি করে?' মি. দাভের ঠোঁটে প্রশ্রয়ের হাসি ফোটে, 'ঠিক আছে, তবু আপনি একটু ভেবে দেখুন। এখনও সময় আছে। অবিশ্যি আপনি রাজি না হলেও আমার তেমন কোনো অসুবিধে নেই। আপনি না থাকলে শর্মা আছে—পাঞ্জাবী ছেলে, ক্ষমতা রাখে। তবে কি না, বাইরের কোনো লোককে আমি এর মধ্যে আনতে চাইনি। যাক গে .. ওহো ভালো কথা, লাস্ট উইকের সেল রিপোর্টটা কিন্তু আমি এখনও পাইনি। ওটা তৈরি না থাকলে, প্লিজ গেট ইট ডান বাই সামবডি। কেমন? মি. আহুজা কিন্তু অফিসে এসেই ওটা দেখতে চাইবেন।'

'ওটা তৈরিই আছে,' সুদূর দরজার দিকে এগিয়ে যায়, 'এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'আর শুনুন, আমার প্রোপোজালটা কিন্তু মন দিয়ে একটু ভেবে দেখবেন। গিভ ইট আ সেকেণ্ড থট।' পেছন থেকে নিয়তির মতো দাভের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'যুদ্ধে কৌশলটাই সব, মি. মুখার্জি। সেখানে বিবেকের কোনো জায়গা নেই। আর তা ছাড়া জীবনে সুযোগ কিন্তু বারবার আসে না।'

সুযোগ। সুযোগের অর্থ কি শুঁড়িপথ? নোংরা আবর্জনা মাড়িয়ে বড়ো রাস্তায় গিয়ে ওঠা? আর তারপর মারুতি কিংবা কন্টেসা?

ভাবতে ভাবতে নিজের চেম্বারে গিয়ে ঢোকে সুদূর। ঘন্টি বাজিয়ে বেয়ারাকে ডাকে। তারপর তার হাত দিয়ে উইকলি স্টেটমেন্টটা পাঠিয়ে দিয়ে, বসে থাকে অবসন্নের মতো।

'রাজি হলেন?'

আচমকা মি. পালের প্রশ্নে ভীষণ চমকে ওঠে সুদূর। চেম্বারে যে অন্য একটা মানুষ রয়েছে, এতোক্ষণ যেন সে হুঁশটাই তার ছিলো না।

'আপনি কি করে ...'

'অনুমান। একটু আধটু খোঁজ খবর রাখি কি না!' মি. পাল ফের প্রশ্নালু দৃষ্টিতে তাকালেন, 'তা আপনি রাজি হয়েছেন তো?'

সুদূর মাথা নাড়লো।

'সেকি মশাই!' উত্তেজিত অসীম পাল একটানে চোখ থেকে চশমাটা খুলে নিলেন, 'কেন?'

'মনে হলো আমি পারবো না।'

'পারবেন না? জোয়ান পুরুষ—পারবেন না বললেই হলো?' মি. পাল যেন ঈষৎ বিভ্রান্ত, 'পারবেন না কেন?'

সুদূর কোনো জবাব দিতে পারে না।

'অ বুঝেছি, সংস্কারের মতো রক্তে ঢুকে যাওয়া মান্ধাতার আমলের সেই মূল্যবোধ। তাই না?'

ফের মাথা নাড়লো সুদূর।

'তবে?'

'আমি অযোগ্য, মি. পাল। সম্ভবত ওই ধরনের যোগ্যতা আমার নেই।'

ছুটির পরে অফিসের গাড়িতে উঠলো না সুদূর। একটু কাজ আছে বলে কাটিয়ে দিলো সোমকে। কেন, তা তার নিজের কাছেই খুব একটা স্পষ্ট নয়। তবে প্রধান কারণ বোধহয় অনিচ্ছে।

কোথায় তোমার অনিচ্ছে, সুদূর? অফিসের গাড়িতে চাপতে? কিন্তু অফিসটা তো তুমি ছাড়তে পারছো না! কাল সকালে আবার তো ওই গাড়িতে চেপে ওই অফিসেই তোমাকে যেতে হবে। তাহলে? তাহলে কি ওই মুহূর্তে সোমের মতো একটা ইনসিগনিফিক্যান্ট লোকের অনর্থক পাঁচালি শুনতে ইচ্ছে করছিলো না তোমার? তার পাশে বসে এতোটা পথ পেরিয়ে বাড়িতে যাবার কথা ভাবতে ইচ্ছে করছিলো না একটুও? নাকি বাড়িতেই ফিরতে ইচ্ছে করছিলো না?

হয়তো তাই হয়তো তা নয়। হয়তো কোনোটাই এককভাবে সত্যি নয়, কিন্তু সবকটা মিলিয়ে প্রখরভাবে সত্যি।

সুদূর একটা ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

কি হবে বাড়িতে ফিরে? কেন ফিরবো? কি লাভ? তার চাইতে বরং কোথাও উধাও হয়ে গেলে হয়। যেখানে গেলে কেউ তাকে খুঁজে পাবে না, কেউ তার খবর জানবে না, তেমনি কোনো নিরুদ্দেশের দেশে!

ব্রুট! নিজেকে চাবুক মারলো সুদূর।

লজ্জা করে না তোমার? এসব কথা ভাবার আগে একবারও কি মনে পড়ে না রূপসাকে? বুঝতে পারো না, তোমার কোনো খবর না পেলে ও পাগল হয়ে যাবে? তোমাকে না দেখলে ওর দু চোখে অন্ধকার ঘনাবে? তুমি ওর জীবন থেকে হারিয়ে গেলে ওর জীবনটাও অর্থহীন হয়ে যাবে নিজের কাছে?

জানি, সব জানি। আমি জানি, রূপসা তাহলে ভীষণ কষ্ট পাবে। ভীষণ। কিন্তু তবুও ও ভেঙে পড়বে না। ভেঙে পড়ার মতো মেয়ে ও নয়। তার আগেই ও নিজেকে সামলে নেবে ঠিক। সময় বড়ো নির্মম হে! সময় সব কষ্ট নির্মম হাতে মুছে দিয়ে যায়। সময় নির্মল করে সমস্ত দীনতা। তাছাড়া অনুভব তো থাকবে। সে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করবে রূপসাকে। অনুভব ওকে খুব ভালোবাসে, অনুভব

খুব ভালো বন্ধু আমাদের। ওকে বিশ্বাস করা যায়, ওর ওপরে অনায়াসে নির্ভর করা চলে।

আমি যদি অনুভব হতাম!

আচমকা বুকের মধ্যে ফের সেই যন্ত্রণাটা অনুভব করলো সুদূর। তীব্র নয়, কিন্তু অস্বীকারও করা চলে না। মৃদু অথচ অস্বস্তিকর। ক্যালকাটা সুইমিং ক্লাবের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরানোর অছিলায় খানিকটা সময় কাটাতেই একটু একটু করে এক সময় বেমালুম উধাও হয়ে গেলো অনুভূতিটা। এবারে উদাসীন পায়ে গঙ্গার ধার দিয়ে দক্ষিণ দিকে যেতে যেতে এক সময় আউটট্রাম ঘাটের কাছাকাছি পৌঁছে গেলো সুদূর। সুন্দর করে বাঁধানো জায়গাটা। কয়েকটা বেঞ্চ। কয়েকটি যুগল। প্রচুর ফেরিওয়ালা। চিনে বাদাম, ভেলপুরি, ফুচকা। চা, আইসক্রিম—এমন কি কোল্ড ড্রিংকসও দুর্লভ নয়। ওধারে কয়েকটা উঠতি বয়সের ছেলে। সঙ্গে কোনো বান্ধবী নেই, হয়তো তাই একটু বেশি উদ্দাম। একটি ছেলে চিৎকার করে গান ধরেছে, পুরানো সেই দিনের কথা। চমকে ওঠার মতো ঘটনা। কারণ এখন ওদের পক্ষে এই পরিবেশে হয়তো চোলি কা পিছে ক্যা হ্যায়, তা জানার জন্যেই আগ্রহ প্রকাশ করাটা স্বাভাবিক। ছেলেটি বারবার বিখ্যাত ওই গানের কলিগুলোকে ভুল করছে, গলায় সব জায়গায় সুরও লাগছে না সঠিক মাত্রায়। তবু খুব একটা অসহ্য লাগছে না সুদূরের। অথচ ভুল কথা আর ভুল সুরে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনলে তার বুকের মধ্যে রক্তপাত হয়। ভুলগুলো শুধরে দিয়ে তখন গানটা গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করে খোলা গলায়। অথচ এখন তেমন কোনো অনুভূতিই অস্তিত্বের গভীরে দানা বাঁধছে না। কেন, কে জানে। হয়তো ক্লান্তি, কিংবা মানসিক পরিস্থিতি। কিংবা তার অনুভূতির সেই সূক্ষ্মতাটুকুই হয়তো কবে হারিয়ে গেছে, উধাও হয়ে গেছে তাকে আদৌ কোনো সঙ্কেত না জানিয়ে। আসলে ঝড় যখন প্রবল হয়ে ওঠে, তখন বাঁশির কথা মানুষের মনে পড়ে না।

আগে এদিকটাতে এলে গঙ্গার বুকে নাকি অনেক বিদেশী জাহাজ দেখা যেতো। আজকাল খুব কম। গঙ্গার বুকে পলির বোঝা জমে উঠেছে। মাথার ওপরে দিকবিশারী প্রান্তরের মতো একটানা ছড়িয়ে থাকা বিশাল ধোঁয়াটে আকাশ, তাতে বিমূর্ত শিল্পীর আপাত অর্থহীন তুলির টানের মতো এখানে-সেখানে ইতস্তত কিছু কিছু রঙের আঁচড়, মাঝে মাঝে বোমারু বিমানের মতো একজোটে উড়ে যাওয়া কলকণ্ঠময় কিছু যাযাবরী পাখি—ক্রমাগত এসব দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে ধৈর্য হারিয়ে ফেলছিলো সুদূর। মুখের ভেতরটা তেতো। গলার মধ্যে কেমন যেন জ্বালা ধরানোর অনুভূতি। তবু অনবরত সিগারেট টানতে থাকে সে। মাথার মধ্যে বিনবিন করছে অজস্র চিন্তা। এক একটা চিন্তা যেন ছোটো ছোটো এক একটা ফ্লাগ স্টেশন আর সুদূরের দৈনন্দিন জীবন যেন ছুটন্ত মেলট্রেনের মতো ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে স্টেশনগুলোকে। কোথাও থামছে না, মুহূর্তের জন্যেও না। ইচ্ছে থাকলেও কোনো প্ল্যাটফর্মের শক্ত জমিতে পা রেখে দাঁড়াতে পারছে না সুদূর।

চলতে চলতে স্মৃতির নৌকো অতর্কিতে অনেক পুরনো দিনের একটা ঘাটে এসে থেমে গেলো।

কতোদিন আগেকার কথা? সেকি পূর্বজন্মের স্মৃতি?

সেদিন স্বরস্বতী পূজো ছিলো।

সিগারেট কেনার ছুতোয় ইউনিভারসিটির লবি থেকে এক ফাঁকে পায়ে পায়ে রাস্তায় চলে এসেছিলো সুদূর। সবাই তখন প্রচণ্ড হুল্লোড় করছে লবিতে। রাস্তার বিপরীত দিকে বেঙ্গল ল্যাম্পের স্টপে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে টানতে সুদূর ভাবছিলো, এবারে সে বাড়িতে ফিরে যাবে। কিন্তু ঠিক তখনই একরাশ বিস্ময়ের মতো রূপসা কোত্থেকে যেন তার পাশে এসে দাঁড়ালো। গায়ে মৃদু টোকা দিয়ে জিগেস করলো, 'কারুর সঙ্গে দেখা করতে যাবার কথা আছে বুঝি?'

'কই, না তো!' অপ্রতিভ হলো সুদূর।

'তাহলে কেউ এখানে আসবে?'

'তাও না।'

'তাহলে ওখান থেকে চুপিচুপি পালিয়ে এলে যে?'

'এমনি, কোনো কারণ নেই। আসলে অতো হুল্লোড় আর ভালো লাগছে না।'

'আমারও লাগছে না। চলো, একটু ঘুরে আসি।'

'কোথায়?'

'চলো না! আর যাই হোক, তোমাকে জাহান্নামে নিশ্চয়ই নিয়ে যাবো না।'

'তুমি সঙ্গে থাকলে সেখানে যেতেও আমার আপত্তি নেই,' ঠাট্টার সুরে চটুল হলো সুদূর।

'তাই বুঝি?' দু চোখ বিস্ফারিত করে মাথায় ঝাঁকুনি তুললো রূপসা, সেই সঙ্গে ঢেউ জাগলো ওর দু'গালেব পাশে এলিয়ে থাকা বাদামী চুলের বসন্তে। 'মনে থাকে যেন।'

ওদিক থেকে একটা ট্যাক্সি আসছিলো, হাতের ইঙ্গিতে সেটাকে দাঁড় করালো রূপসা। তারপর গাড়িতে উঠে, সুদূরকে ভীষণ অবাক করে দিয়ে তার কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বললো, 'চলো সুদূর, আজ আমরা দুজনে মিলে হারিয়ে যাই।'

ঘনিষ্ঠতার সেই প্রথম পদক্ষেপ রূপসাই নিয়েছিলো অতর্কিত জ্যোৎস্নার মতো। বিনা ভনিতায়। একেবারে সবাসরি। চিরদিনই ও তাই। অ্যাগ্রেসিভ।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' মনের চঞ্চলতাকে আড়াল করে স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করলো সুদূর।

'বললাম তো, নিরুদ্দেশেব পথে।' মুখ টিপে হাসলো রূপসা, 'কেন, তোমার আপত্তি আছে?'

'একটুও না। তবে..'

'তবে কি? ভয় করছে?'

'কিসের ভয়? হারিয়ে যেতে?' এবারে প্রশ্ন করলো সুদূর।

'না, আমার সঙ্গে হারিয়ে যেতে।'

'তাতে ভয় হবে কেন?' সুদূর বিস্মিত হলো।

'মেয়ে বন্ধুর সঙ্গে ট্যাক্সিতে চেপে হারিয়ে গেলে ভালো ছেলেরও বদনাম হতে পারে।'

'তাহলে বদনামটা তো আগে তোমার গায়ে লাগবে।'

'আমি ওসবের পরোয়া করি না।'

'আমি করি, তাই বা তুমি বুঝলে কি করে?'

'সময় এলে বোঝা যাবে,' ঠোঁট ফুলিয়ে আশ্চর্য ভঙ্গিতে হাসলো রূপসা।

দেখতে দেখতে গোল পার্ক থেকে বাঁ দিকে মুখ ঘুরিয়ে সোজা সাদার্ন অ্যাভিনিউ। ঠাণ্ডার ঈষৎ আবেশ জড়ানো চঞ্চল বাতাসে এলোমেলো হয়ে চুল উড়ছিলো রূপসার। কামিজের ওড়না উড়ছিলো শরতের হালকা মেঘের মতো। ওর শরীরের সান্নিধ্য ভোরের সুগন্ধী বকুলের মতো সুদূরের সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে তুলছিলো ক্রমশ। সুদূর অনুভব করছিলো, বুকের গভীরে ঘুমিয়ে থাকা এক নতুন আকাঙ্ক্ষা আলোর ভ্রমরের মতো গুঞ্জন তুলতে চাইছে তার সমস্ত অস্তিত্বে। সুদূর চাইছিলো, অন্ধকারের দিশাহীন সমুদ্রে অসংখ্য জোনাকি জ্বলে উঠুক, আর সেই জোনাক-জ্বলা অথৈ সমুদ্রে এক প্রবাল দ্বীপের মতো নির্জন আশ্রয় হয়ে জেগে থাক শুধু রূপসা।

রূপসী, তুমি পাখি হলে না কেন? অথবা বৃষ্টিভেজা যূথী চামেলীর মতো আশ্চর্য কোনো ফুল?

সুদূরের খুব কাছাকাছি সরে এসে আরও ঘনিষ্ঠ হলো রূপসা। তারপর হেমন্তের সান্ধ্য অরণ্যে শুকনো পাতা উড়ে যাবার মতো উদাসী গলায় প্রশ্ন করলো, 'এতোদিনে তুমি কি কিছুই বোঝোনি, সুদূর? তুমি কি কিছুই বুঝবে না কোনোদিন?'

আস্তে আস্তে সুদূরের কাঁধে মাথা রাখলো ও। তারপর কানে কানে ডাকার মতো অস্ফুটে বললো, 'আমি তোমারই সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ—'

রূপসার কবোষ্ণ শরীরের স্পর্শে সুদূরের অসহায় যৌবন তখন আর্তনাদ করে উঠেছিলো। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও রক্তের গভীরে অতর্কিতে বেজে ওঠা অজস্র মাদলের উন্মাদনাকে সে কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারেনি। তাই চকিতে মুখ নামিয়ে রূপসার গোলাপের মতো তৃষ্ণার্ত ঠোঁটে ঠোঁট রেখেছিলো সে।

সেই প্রথম। এবং সেখানেই সর্বনাশের শুরু।

অথচ সেই প্রথম মুহূর্ত থেকেই একটা বিষাক্ত অপরাধবোধ ঘুণপোকার মতো অক্লান্ত প্রয়াসে সুদূরকে অনুক্ষণ নিঃস্ব করে তুলছিলো। তার মনে হচ্ছিলো, ঠিক হলো না, এটা ঠিক হলো না। দীর্ঘদিন তার কাছ থেকে সযত্নে যা লুকিয়ে রাখা হয়েছিলো, আচমকা তা আবিষ্কার করে ফেলার পরে—সবকিছু জেনেশুনেও—রূপসার সঙ্গে এতো বড়ো প্রতারণা সে কিছুতেই করতে পারে না। ওকে সব কথা খুলে বলা দরকার এবং তা অবিলম্বে। কারণ মিথ্যে ওজর দেখিয়ে রূপসাকে ভোলানো সম্ভব হবে না, রূপসা তা ধরে ফেলবে ঠিক।

সেদিনই সন্ধ্যাবেলায় পাড়ার একটা দোকান থেকে রূপসাকে টেলিফোন করলো সুদূর। ডায়াল করা শেষ হতেই রিনরিন সুরে বেজে উঠলো ওধারের টেলিফোন। তারপর হালকা খুশির মতো রূপসার নরম কণ্ঠস্বর।

'হ্যালো?'

সুদূর কি বলবে, কিছুতেই ভেবে উঠতে পারলো না। টেলিফোনের মাধ্যমে

এতো স্বল্প অবকাশে এতো কথা কি গুছিয়ে বলা সম্ভব! অথচ প্রতি মুহূর্তেই সময়ের ব্যবধান বেড়ে চলেছে ক্রমশ। একটা কিছু বলা দরকার। এবং তা এখুনি।

রূপসা আবার বললো, 'হ্যালো?'

ওর কণ্ঠস্বরে একরাশ বিস্ময়। কিংবা বিরক্তি।

আরও কয়েকটি নির্বাক মুহূর্ত কেটে গেলো দিশাহীন অস্থিরতায়।

'হ্যাল্লো,' রূপসার কণ্ঠস্বরে এবারে স্পষ্টতই তীক্ষ্ণতার সুর।

রিসিভার নামিয়ে রাখলো সুদূর। দোকানদার সমবেদনার দৃষ্টিতে তাকালো, 'এনগেজড?'

'না,' পয়সা মিটিয়ে দোকান থেকে দ্রুত বেরিয়ে এলো সুদূর। দোকানদারের বিস্মিত চোখ দুটো তখনও অনুসরণ করছে তাকে।

কিন্তু সেদিন রাতেই নেশাগ্রস্তের মতো দ্বিতীয় বার ফের ওই নম্বরটা ডায়াল করে রিসিভারে আগ্রহী কান পাতলো সুদূর।

বিপরীত প্রান্ত থেকে এবারেও ভেসে এলো রূপসার কণ্ঠস্বর। সুদূর এবারেও কোনো সাড়া দিতে পারলো না।

পরের দিন সেন্ট্রাল লাইব্রেরীতে যাবার পথে রূপসাকে সে বলেছিলো, 'জানো, কাল অনেক রাতে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো। স্বপ্ন দেখছিলাম, আমি টেলিফোনে তোমাকে ডাকছি। বারবার। তুমি তখন একটা হালকা নীল রঙের পোশাক পরে ডিভানে গা এলিয়ে ব্লেসেড ডেমোজেল পড়ছিলে। টেলিফোনের রিং শুনে তুমি তোমার ক্যাসেট প্লেয়ারের ভলিউম কমিয়ে দিলে, আলস্য ছাড়ালে শরীর থেকে, তারপর রিসিভার তুলে নিয়ে খুব মিষ্টি গলায় বললে, 'হ্যালো'। আমি যেন সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম, তোমার গলাও শুনছিলাম, অথচ কিছুতেই তোমার ডাকে সাড়া দিতে পারছিলাম না।'

কথাটা শুনে ভীষণ অবাক হয়ে রূপসা বলেছিলো, 'ভারি আশ্চর্য তো! কাল একবার সন্ধ্যায়, আর একবার রাতে—দু বার রিং শুনে আমি দৌড়ে গিয়ে রিসিভার তুলেছি। দু বারই ভেবেছি, তুমি। অথচ কোনো সাড়া পাইনি। কি অদ্ভুত কাণ্ড, তাই না?'

সেদিনও ওকে কিছু বলতে পারেনি সুদূর। বলতে পারেনি, অনেক কাল আগে নিষ্ঠুর এক লুটেরা দস্যু এক অসহায় পরিস্থিতির সুযোগে তার সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে চিরদিনের মতো অস্তাচলের পথে চলে গেছে। চলে গেছে, কিন্তু তার ছায়া ফেলে গেছে সুদূরের সমস্ত সত্তায়। অথচ এখনও নির্দয় আকাশে সূর্যোদয় হয়। এখনও রাতের আকাশে জোনাকির মতো তারা জ্বলে, স্বপ্নের মতো টলটলে নীল জ্যোৎস্নায় ভেসে যায় ধরিত্রীর সর্বাঙ্গ। এখনও বাতাসে ফুলের সুগন্ধ ভেসে আসে। আসে শিউলি-চাঁপার গন্ধ। অনেক দিনের চেনা গন্ধ।

আর তুমি ...

কেন এসেছিলে? কেন এলে? কেন!

'সাহাব?'

চমকে মুখ তুলে তাকায় সুদূর।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার এতোক্ষণে গাঢ় হয়েছে। ইতস্তত কয়েক বিন্দু আলো টলমল করছে গঙ্গার বুকে। কারা যেন ট্রানজিস্টার কিংবা সস্তা ক্যাসেট প্লেয়ারে হিন্দি র‍্যাপ চালিয়েছে কোথায়। কটা বাজে? বাঁ হাতটা চোখের সামনে তুলে ঘড়ির দিকে তাকায় সুদূর। আটটা। এতো তাড়াতাড়ি? কি করে কেটে গেলো এতোটা সময়?

'সাহাব?'

ফের ডাকছে লোকটা। সম্ভবত এই নিয়ে দ্বিতীয়বার। রোগা ছিপছিপে চেহারা, গালে সামান্য দাড়ি, মাথার জুলফিহীন চুলগুলো সযত্নে পরিপাটি করে আঁচড়ানো। পরনে ব্লু জিনস আর ঢলঢলে টি শার্ট।

'ক্যা হ্যায়?' প্রশ্ন করে সুদূর।

'ছোকরি চাহিয়ে সাহাব? আচ্ছি চিজ। দারু ভি মিলেগা।'

আঙুল তুলে কাছাকাছি নোঙর করে রাখা একটা নৌকোর দিকে দেখায় লোকটা। চটের নোংরা পর্দা সরিয়ে ছইয়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে দুটো অন্ধকার মাখা শরীর। পয়সা ছড়ালে এখানেই মেয়েমানুষ পাওয়া যাবে। তবে অনেকে নিজেদের পছন্দমতো মেম সাহেবদেরও এখানে নিয়ে আসেন। সেক্ষেত্রে শুধু নৌকো ভাড়াটা দিলেই চলে। আর কিছু বকশিশ। তবে মদের দরকার হলে, তার দাম আলাদা। লোকটা করুণাপ্রার্থীর মতো তাকিয়ে থাকে সুদূরের দিকে।

চমৎকার বন্দোবস্ত! মা গঙ্গার বুকে লীলা-সঙ্গম!

'নেহি।'

'জারা সোচিয়ে সাহাব। দেখ লিজিয়ে এক নজর। নো রিস্ক।'

'নেহি, নেহি চাহিয়ে।'

লোকটাকে হতাশায় ডুবিয়ে, ক্লান্ত পরিব্রাজকের মতো ফের পথের সন্ধানে পা বাড়ায় সুদূর।

ডোরবেলের বোতামে মৃদু চাপ দিতেই ভেতরে রিনিঠিনি সুরে ঘন্টি বাজলো। বন্ধ দরজার বাইরে দাঁড়িয়েও শব্দের মিহি রেশটুকু স্পষ্ট শুনতে পেলো সুদূর। এবং তারপরেই তার চোখের সামনে গোটা পৃথিবী অন্ধকারে মুছে গেলো। লোড শেডিং। এই হয়েছে এক যন্ত্রণা! কবে যে এর শেষ, আদৌ শেষ আছে কি না, তা সম্ভবত কারুরই জানা নেই।

সুদূর লক্ষ্য করলো, বন্ধ দরজার তলায় সরু একটা আলোর রেখা সোনার কাঠির মতো ঝিকমিক করছে। ইনভার্টার। গত বছরে কেনা হয়েছিলো, মনে আছে সুদূরের। বাঁচা গেছে, বসে বসে ঘামতে হবে না। বিরক্তি আসবে না। আর কিছু ভাবার আগেই দরজার ওধারে হালকা পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে প্রস্তুত হলো সুদূর।

'কে?' সোনালির কণ্ঠস্বর।

'আমি, সুদূর।'

'কে?'

'সুদূর। দরজাটা খুলবি. না চলে যাবো?'

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে যায়। বিস্ফারিত চোখে সুদূরের মুখোমুখি দাঁড়ায় সোনালি, 'ওমা, তুই? কি আশ্চর্য!'

'আশ্চর্য পরে হবি, আগে সরে দাঁড়া। ভেতরে ঢুকতে দে।'

'আয়, আয়। কতোদিন বাদে এলি বল তো? কি যে মজা লাগছে!' উত্তেজনায় সোনালির কণ্ঠে চূড়ান্ত উচ্ছ্বাস ফুটে ওঠে, 'রূপাকে নিয়ে এলি না কেন?'

'কি মুশকিল, ওকে আমি আমার অফিসে নিয়ে গিয়েছিলাম নাকি?'

'তুই অফিস থেকে সোজা এলি?'

'হ্যাঁ। তুই আজকাল কানে কম শুনিস নাকি?'

'মানে?' সোনালি অবাক।

'বাইরে দাঁড়িয়ে দু দুবার চিৎকার করে নিজের নাম বলতে হলো কিনা, তাই জিগেস করলাম।' সোনালি জবাব দেবার আগেই সুদূর ফের প্রশ্ন করে, 'তুহিন এখনও ফেরেনি?'

'কেন, তুই কি শুধু ওর কাছেই এসেছিস নাকি?'

'না। তবে শুধু তোর কাছে এলেও, তুই বোধহয় খুশি হতিস না।'

'হ্যাঁ, তুই তো সবকিছুই আগে থেকে জেনে বসে আছিস! চিরকালের বিজ্ঞ একটা।'

'নারে, বিজ্ঞ হলে আজ আর ...' কি যেন বলতে গিয়েও থেমে যায় সুদূর। তারপর ঠোঁটে এক চিলতে হাসি ফুটিয়ে সোনালির চোখের দিকে তাকায়, 'কেমন আছিস? তুই?'

'তাও ভালো, মনে করে কথাটা জিগেস করলি। না কি এটাও রূপা শিখিয়ে দিয়েছে?'

'তুই কি আজ আমার সঙ্গে একবারও ভালো করে কথা বলবি না? আমি কিন্তু ভালো নেই।'

'কেন, কি হয়েছে?' সঙ্গে সঙ্গে সোনালির অভিব্যক্তি বদলে যায়, 'আমিও তাই ভাবছিলাম। মনে হচ্ছিলো তোকে জিগেস করবো।'

'কি?'

'তোকে এ রকম লাগছে কেন?'

'কি রকম?'

'মনে হচ্ছে যেন ভীষণ ক্লান্ত।'

সারাটা দিন তো খাটুনি গেছে,' সুদূর ম্লান হাসে।

'না, সে রকম নয়।'

'তবে?'

'মোট কথা আমার একটুও ভালো লাগছে না। তোর কি কোনো অসুখ হয়েছিলো?'

'না,' সুদূর মাথা নাড়ে। 'এক গ্লাস জল দিবি?'

'একটু বোস, আমি এখুনি নিয়ে আসছি।'

চটির শব্দ তুলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সোনালি। সুদূর শুনতে পায় ও গলা

চড়িয়ে বলছে, 'এই তুহিন, তোমার বাথরুমের কাজ হলো? কি করছো এতোক্ষণ? সুদূর সেই কখন থেকে এসে বসে আছে।'

শরীর এলিয়ে সোফায় বসে থাকে সুদুর। ফ্যানের হাওয়া গায়ে লাগছে না। অথচ পর্দাগুলো দুলছে। শোকেসের মাথায় বসে হাওয়া খাচ্ছে বিষ্ণুপুরের ঘোড়া। তুহিন বাথরুমে। স্নান করছে নিশ্চয়ই। একটু স্নান করতে পারলে ভালো লাগতো, ফ্রেশ হওয়া যেতো। ইচ্ছে হলেই করা যায়। কিন্তু তারপর ফের এই ব্যবহৃত অন্তর্বাস গায়ে চাপানো? অসম্ভব।

'কিরে, হঠাৎ?' তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে তুহিন ঘরে এলো।

'এলাম।'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি। রূপাকে নিয়ে এলি না কেন?'

'ওর সঙ্গে তো যোগাযোগ করে আসিনি। তোদের কথা মনে হলো, চলে এলাম।'

'অন্যায়, পানিশেবল অন্যায়। এই সুযোগে আমি স্যুইট হার্টকে একটু দেখতে পেতাম।'

'দেখতে গেলেই পারিস! কে বারণ করেছে? তোরা তো বহুকাল যাস না।'

সুদূরের কণ্ঠস্বরে হয়তো অনুযোগের স্পর্শ ছিলো। কিন্তু তুহিন কোনো জবাব দেবার আগেই সোনালি জল নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলো। সঙ্গের প্লেটে দুটো সন্দেশ।

'সন্দেশটা মুখে দিয়ে জল খা। তারপর আমি খাবার দিচ্ছি।'

'যে গেছে তোর সন্দেশ খেতে,' সুদুব জলের গ্লাসের দিকে হাত বাড়ালো। 'আমি শুধু জল খাবো।'

'ইয়ার্কি?' সুচতুর ভঙ্গিতে গ্লাসটা সরিয়ে প্লেটটা এগিয়ে দিলো সোনালি, 'খালি পেটে জল খেতে নেই। তাছাড়া শুধু মুখে জল খেলে গেরস্থের অকল্যাণ হয়।'

'বুড়ি পিসী!'

সুদুর একটা সন্দেশ তুলে নিতেই তার দিকে জলের গ্লাস এগিয়ে দিলো সোনালি। তারপর তুহিনের দিকে ফিরে বললো, 'দয়া করে মাথা আঁচড়ে, গায়ে একটা কিছু চড়িয়ে এসো।'

'কেন? স্নানের পরে গায়ে দিবি একটু হাওয়া লাগছে।'

'সারাটা জীবন তো গায়ে হাওয়া লাগিয়েই কাটালে! এবারে যাও তো, বিচ্ছিরি লাগছে দেখতে।'

'কি যে পরাধীন জীবন। লুঙ্গি চলবে না, খালি গায়ে থাকা চলবে না, মাথা আঁচড়ে সর্বদা ফিটফাট বাবু হয়ে থাকতে হবে, নিজের বাড়িতেও শব্দ করে ঢেকুর তোলা চলবে না--এমন জানলে কোন শালা বিয়ে করতো।'

'খবর্দার মুখ খারাপ করবে না,' ধমকে ওঠে সোনালি। তুহিন ব্যাজার মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

ছোট্ট এই ঘরোয়া দৃশ্যটা ভারি ভালো লাগে সুদূরের। অথচ সেই সঙ্গে অতর্কিতে বুকের গভীরে কোথায় যেন একটা খোঁচা লেগে যায়। রূপসা একদিন

বলেছিলো, 'আমার সঙ্গে কোথাও যেতে হলে, তোমাকে ওই সাধের লাল টি শার্টটার মায়া ছাড়তে হবে। ওটা আমার দু চোখের বিষ।' সেদিনও এমনি ভালো লেগেছিলো সুদূরের। দুটো ঘটনার মধ্যে কি মিল আছে কোথাও? আছে হয়তো। নইলে খামোখা অতোদিন আগেকার একটা ঘটনা আজ এমন আলটপকা মনে পড়তে যাবে কেন?

ভাবতে ভাবতেই স্বপ্নের এক দেবশিশু ঘরে এসে ঢোকে। ফর্সা রঙ, টানাটানা চোখ, টুকটুকে ঠোঁট আর মাথায় উলমি ঝুলমি লালচে চুল। পায়ে পায়ে মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ায় সে। দু হাতে ওকে কাছে টেনে নেয় সোনালি, 'আমার ছেলে, টোটা। ভয় নেই, তোকে কবিতা বা গান শোনাতে বলবো না।'

'নামটা টোটা হলো কেন?'

'বুলেট রাখলেও হতো। মুখ খুললেই বুঝতে পারবি।'

সুদূরের মুখে আর কোনো কথা ফুটতে চায় না। মুগ্ধ বিস্ময়ে সে টোটার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অপলক।

'মা, আমাকে নোংরায় ফেলে দাও।' টোটা বায়না ধরে।

'নোংরায় ফেলে দেবো!' সোনালি অবাক, 'কেন?'

'হ্যাঁ, নোংরায় ফেলে দেবে।'

'কি মুশকিলে পড়া গেলো দেখেছিস?' অসহায় চোখে সুদূরের দিকে তাকায় সোনালি। তরপর টোটাকে ফের জিগেস করে, 'কেন? কি করেছো তুমি?'

'কিছু করিনি। কিন্তু ফেলে দেবে।'

'কেন বলবে তো?'

'তারপর চান করিয়ে নোংরা ধুয়ে দেবে,' টোটা মুখ টিপে হাসে।

'দেখছিস, কি বদমাস ছেলে!' সোনালি হেসে খুন, 'ও বড়ো হয়ে কি করবে বল তো?'

'অনেক মেয়ের মুণ্ডু ঘোরাবে,' সুদূর হাসলো। 'ওর নিশ্চয়ই খুব গরম লাগছে।'

'গরম লাগছে,' টোটা যেন ভরসা পেলো।

'এতো রাতে চান করে না, সোনা!' ওর গালে চুমু দিলো সোনালি।

'এতো রাতে চান করে। ড্যাডি করেছে।'

'ড্যাডি তো বড়ো। তুমি ছোটো।'

'ছোটো চান করে।'

'না, বাবা! রাত্তিরে ছোটোরা চান করলে হালুম বাঘা আসে।'

'কোথা দিয়ে আসে?'

'জানলা দিয়ে আসে।'

'জানলা বনধো করে দাও।'

'কি বিপদ! জানলা বন্ধ করলে গরম লাগবে না?'

'জানলা দিয়ে আসে না,' টোটা সুনিশ্চিত।

'হ্যাগো, আসে। এসে কামড়ে দেয়।'

'কামড়ে দেয় না।'

'হ্যাঁ, দেয়। তুমি ছোটো তো, তাই জানো না।'

'কোথায় কামড়ে দেয়?' টোটার প্রশ্নের আর শেষ নেই।

'হাতে কামড়ে দেয়।'

'হাতে কামড়ে দেয় না। হালুম বাঘা ডাকো।'

'নাঃ, এ একেবারে আনম্যানেজেবল।' নাকাল হয়ে সোনালি গলা চড়ায়, 'এই শুনছো, ওকে নিয়ে গিয়ে একটু গা হাত পা মুছিয়ে দাও তো! নইলে শয়তানটা আর কথাবার্তা বলতে দেবে না।'

শয়তানটাকে নিয়ে যাবার প্রয়োজন হয় না। তার আগে সে নিজেই দিব্যি গুটিগুটি ড্যাডির খোঁজে বেরিয়ে পড়ে।

'তুই বোস, আমি তোর খাবারটা নিয়ে আসি,' সোনালি উঠে দাঁড়ায়।

'তুই একটু শান্ত হয়ে বোস, সোনা। ওসব পরে হবে। এখন আমার খিদে নেই।'

'না খেয়ে যেতে পারবি না কিন্তু।' সোনালি এবারে সুদূরের পাশে ঝুপ করে বসে পড়ে। আসলে ওরও এখন গল্প করতে ইচ্ছে করছে।

'ঠিক আছে, আমার কোনো তাড়া নেই।'

'তাড়া থাকবে কি করে? তোরা দুজনে তো আজও দিব্যি ঝাড়া হাত-পা হয়ে আছিস। এদিকে আমার অবস্থাটা দেখ, রোজ নাকানি-চোবানি খেয়ে মরছি। দুপুরে তিন চার ঘন্টা ও একটা নার্সারি স্কুলে আটকে থাকে, বাকি সময়টা আমাকে এমনি জ্বালায়। বাড়িতে যতোক্ষণ জেগে থাকে, ওকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হয়। এমন কি রাত্তিরেও একটু নিশ্চিন্ত হবার উপায় নেই।' সোনালি মুখ টিপে হাসে, 'মাঝে মাঝে, জানিস তো, বাঁদরটা ঠিক একেবারে মোক্ষম সময়ে কি করে যেন জেগে ওঠে। তখন সে যে কি কাণ্ড ...'

খিলখিল করে একটু হেসে সুদূরের দিকে তাকাতেই সোনালির হাসি ম্লান হয়ে যায়।

'এই?'

'কি?'

'তোর কি হয়েছে বল তো?'

'কিছু না তো!'

'নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। তুই আমাকে লুকোচ্ছিস। আমি কি তোকে চিনি না?'

'সোনা, আমি ... আসলে ...' কি যেন বলতে গিয়েও থেমে যায় সুদূর।

'আমাকে বলবি না? বলতে পারছিস না?' সোনালির দু চোখে আষাঢ়ের মেঘ ঘনায়।

'বলবো বলেই তো এসেছিলাম। কিন্তু ...'

'কিন্তু কি?'

'কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে।'

'তাহলে কি তুই আমাদের বন্ধু বলে মনে করিস না?'

'তা নয় সোনা। আসলে ... আসলে আজকাল আমার ভীষণ ক্লান্ত লাগে।

ভীষণ। কোনো কিছুতে উৎসাহ নেই, মন নেই। কেমন যেন পাগল পাগল মনে হয় নিজেকে। জীবনের কোনো অর্থ খুঁজে পাই না।'

'ডাক্তার দেখিয়েছিস?'

'না,' মাথা নাড়ে সুদূর। 'ডাক্তার কিছু করতে পারবে না।'

'একটা আজব কথা শোনালি, যা হোক। ডাক্তার পারবে না তো কে পারবে, শুনি? উকিল ব্যারিস্টার?'

'সম্ভবত তাই।' সোনালির একটা হাত নিজের হাতে তুলে নেয় সুদূর, 'তুই আমার একটা কথা রাখবি?'

'কি কথা?'

'রূপসাকে তুই রাজি করাবার চেষ্টা কর। প্লিজ।'

'কিসের জন্যে?'

'ডিভোর্স।'

'কি বললি?' সোনালির দু চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে।

'ডিভোর্স। ডিভোর্সের জন্যে। তুই ওকে কেস ফাইল করতে রাজি করা, আমি অ্যাপিয়ার হবো না। তাহলে ব্যাপারটা সহজ হয়ে যাবে।'

'কি বলছিস তুই! তাহলে কি তুই অন্য কাউকে . আর আমরা কিছুই জানতে পারিনি?'

'না, তা নয়।'

'তবে কি রূপা?'

'না, সোনা—না। ও সমস্ত কিছু নয়।'

'তাহলে? তাহলে কি?' সোনালির মুখ বিবর্ণ হয়ে ওঠে, 'আমি তো এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'বুঝবে কি করে, তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি তো চিরদিনই একটু কম।' তুহিন ঘরে এসে ঢুকলো, 'শয়তানটাকে ঘুম পাড়িয়ে এলাম। 'হ্যাঁ, বলো কি কথা হচ্ছিলো। সব একেবারে জলের মতো পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেবো।'

'শোনো না, সুদূর কি সব অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলছে।' তুহিনের খোঁচাটা গায়ে না মেখে সোনালি বললো, 'আমার সবকিছু কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।'

'কি বলছে ও?'

'বলছে ওরা ... মানে ও নাকি ডিভোর্স চায়।'

'মানে?'

'আমিও তো সেটাই বুঝতে পারছি না।'

'কিবে, কি ব্যাপার?' আহত বিস্ময়ে সুদূরের দিকে তাকালো তুহিন, 'এ আবার কেমন ঠাট্টা হলো?'

'ঠাট্টা নয়।'

'মানে? আর ইউ সিরিয়াস?'

'হ্যাঁ', ঘাড় নাড়লো সুদূর।

'তার মানে থার্ড পার্সনের আবির্ভাব ঘটেছে? এর মধ্যেই?'

'ওহ, নো! নট দ্যাট,' সুদূরকে সামান্য উত্তেজিত দেখালো।

'দেন হোয়াই? স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়াঝাঁটি হয়েই থাকে। তাই বলে এতো সহজেই ডিভোর্স? ইয়ার্কি নাকি? এটা একটা আজীবন সম্পর্কের প্রশ্ন।'

'সম্পর্কের ভিতটাই যখন নড়বড়ে হয়ে যায়, তখন মিছিমিছি আর্টিফিশিয়াল রেসপিরেশন দিয়ে সেটাকে জিইয়ে রেখে কি লাভ!'

'স্টপ ইট! থিয়েটার করিস না, সুদূর।' তুহিন উত্তেজিত হয়ে ওঠে, 'সেই থেকে তুই অনবরত ভাট বকে চলেছিস। কোনো কারণ দেখাতে পারছিস না। স্ট্রিপ দ্য ট্রুথ, অর গেট আউট।'

'সত্যি কথাটা সহ্য করতে পারবি তো?' সুদূরের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে ওঠে।

'কি?'

'কারণ একটাই, রূপসীকে আমি আর সহ্য করতে পারছি না। সহ্য করতে পারছি না তার কারণ, সি ইজ ট্যু ওড। কিন্তু ওর এই ভালোত্বের সুযোগ নিয়ে আমি ওর জীবনটাকে নষ্ট করতে পারি না, আমি তা চাইও না—কারণ আমি ওকে ভালোবাসি। আসলে এ আমার এক নিদারুণ লজ্জার কথা, তুহিন। আাণ্ড ইটস ভেরি হার্ড টু কনফেস।' প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরিয়ে নিলো সুদূর। এক বুক ধোঁয়া ছেড়ে খানিকক্ষণ বসে রইলো নিশ্চুপ হয়ে। তারপর অনেক দূরে প্রায় লুপ্ত হয়ে যাওয়া মেঘগর্জনের মতো গম্ভীর অথচ অসহায় কণ্ঠে বললো, 'আসলে টোটার মতো কোনো সুন্দর স্বপ্ন দিয়ে রূপসীর কোল ভরিয়ে দেবার মতো ক্ষমতা আমার নেই। আয়াম ফেড আপ, রিয়্যালি ফেড আপ উইথ দিস স্টেরাইল লাইফ।'

রাত কতো হলো? জানার ইচ্ছে হলেও ঘড়ির দিকে তাকাতে ইচ্ছে করলো না রূপসার। কেমন যেন একটা অর্থহীনতা, উদ্যমহীন অস্থিরতা ওর সমস্ত অস্তিত্বকে মেঘের মতো ঘিরে রেখেছে। ও অনুভব করছিলো, আকাশে অসংখ্য জ্যোতিষ্ক এখন টলটলে নীল জ্যোৎস্নায় স্নান সেরে আরও উজ্জ্বল হয়ে সেজেছে। জানলার কাছে অথবা ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালে সেই রূপময় জ্যোৎস্নার পবিত্র সুগন্ধ ওর মনকেও সুরভিত করে তুলবে। অথচ ওর উঠতে ইচ্ছে করছিলো না, তাই বসেই রইলো নিথর নিস্পন্দ হয়ে। কোলের ওপরে অনাদৃত হয়ে পড়ে রইলো আধখোলা সাপ্তাহিক পত্রিকাখানা। চোখের দৃষ্টি উদ্দেশ্যহীনের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলো অতি পরিচিত ঘরটার আনাচে কানাচে।

একটু আগেই বাড়িতে ফিরেছে সুদূর। কথাবার্তা হয়নি বিশেষ। ওকে সে জিগেস করেছিলো, 'কখন ফিরলে?'

'অনেকক্ষণ,' জবাব দিয়েছিলো রূপসা। তারপর প্রশ্ন করেছিলো, 'তোমাকে চা দেবো?'

'নাঃ, অনেক রাত হয়ে গেছে। এখন চা খেলে, একটু বাদে আর কিছুতেই খেতে ইচ্ছে করবে না।'

রূপসা আর কিছু জিগেস করেনি, সুদূরও কথা বাড়ায়নি। এখন সে বাথরুমে। শাওয়ার ছেড়ে গান গাইছে। 'জানি তোমার অজানা নাহি গো কী আছে আমার মনে।'

বুকের ভেতরটা টনটন করে ওঠে রূপসার। আমি জানি তোমার মনের কথা, সুদূর! তুমি গোপন করতে চাইলেও তা আমার কাছে কোনোদিন গোপন থাকেনি। থাকবেও না। তবু কেন তুমি মিছিমিছি এতো কষ্ট পাও, বলো তো? সেই সঙ্গে কেন আরও বেশি কষ্ট দাও আমাকে? কেন!

অনেক কাল আগেকার একটা বিশেষ দিনের কথা আচমকা মনে পড়ে রূপসার। বোধহয় বছর তিনেক আগেকার কথা। বইমেলা থেকে বেরিয়ে সেন্ট পলস ক্যাথিড্রালের গা ঘেঁষে বিড়লা প্লানেটোরিয়ামের দিকে এগুচ্ছিলো ওরা দুজনে। মেলার প্রাঙ্গণ থেকে তখন জর্জ বিশ্বাসের দরাজ কণ্ঠে গান ভেসে আসছে। '... আমি গোপন করিতে চাহি গো, ধরা পড়ে দু নয়নে'।

হঠাৎ সুদূর বললো, 'এক এক সময় আমার কি মনে হয় জানো, রূপ? আমার মনে হয়, আমাদের শরীরের সমস্ত কোষে কোষে অসংখ্য শব্দের নূপুর লুকোনো আছে। বাঁধাধরা জীবনের বাইরে একটা পা ফেলতে গেলেই ওই নূপুরগুলো সব একসঙ্গে ঝুনঝুন করে বেজে ওঠে। অথচ শব্দগুলোকে অস্বীকার করে একটু এগিয়ে গেলেই হয়তো দেখা যেতো, আসলে শব্দগুলো কোনো শব্দই নয়—সমস্ত ব্যাপারটাই একটা বিরাট ফাঁকি—একটা হিপনোটিক স্পেলের মতো কোনো আরোপিত অনুভূতির মিথ্যে প্রকাশ।'

রূপসা মাথা নিচু করে হাঁটছিলো। মুখ না তুলেই বললো, 'মাঝে মাঝে তোমার কথা শুনে আমি ভীষণ অবাক হয়ে যাই। মনে হয় আমার কথাগুলো তুমি জানলে কি করে। আমি তো কখনও এসব তোমাকে বলিনি!'

'কোন সব?'

'এই যে বললে, হিপনোটিক স্পেলের কথা। মাঝে মাঝে আমি ভাবি এই যে আমরা হাঁটছি, কথা বলছি বা চিন্তা করছি—এর কোনোটাই আমরা হয়তো সুস্থ বা স্বাভাবিক অবস্থায় করছি না। হয়তো আমরা সবাই হিপনোটাইজড হয়ে বয়েছি। তারপর একদিন হয়তো এই সম্মোহনের নেশা কেটে যাবে। তখন আমরা কি ভীষণ অবাক হয়ে যাবো, বলো তো! অথবা তখন হয়তো প্রচণ্ড অসহায় বলে মনে হবে নিজেদের। তাই না?'

'আবার উলটোটাও তো হতে পারে?'

'কি রকম?'

'ধরো তখন, মানে তোমার কথামতো সজ্ঞান অবস্থায় ফিরে আসার পর আমরা হয়তো এমনও ভাবতে পারি যে, ইস কি বিচ্ছিরি একটা দুঃস্বপ্নই না দেখছিলাম এতোক্ষণ! অথবা এখনকার কোনো কথাই হয়তো তখন আমাদেব আর মনে পড়বে না,সত্যিকারের হিপনোটাইজড হলে যেমন হয়।'

'হ্যাঁ, তাও হতে পারে।'

'আসলে কিন্তু তা নয়। কারণ তোমার কথা মেনে নিলে এ কথাও মানতে হয়

যে এখন আমরা কেউই সুস্থ বা স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। তার মানে আমরা সবাই অসুস্থ বা অস্বাভাবিক। সেটা নিশ্চয়ই খুব একটা আনন্দ বা গৌরবের কথা নয়।'

'কিন্তু আমি যদি বলি, গৌরবজনক নয় বলেই তুমি আসল সত্যটাকে চেপে রাখতে চাও?'

'তুমি রেগে যাচ্ছো, রূপ।' সুদূর তখন হেসে ফেলেছিলো, 'রাগলে কিন্তু ডিবেটে জেতা যায় না।'

'কিন্তু তোমার এ ধারণাটা ভুল,' রূপসা তবু দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিলো, 'আমি যদি বলি, তুমি স্বেচ্ছায় নিজের পৃথিবীতে নিজেকে বন্দী করে রেখেছো? যদি বলি, আসলে বাইরের পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে একটা নিষ্করুণ সত্যের মুখোমুখি হতে তুমি ভয় পাচ্ছো, অথচ সত্যটার অস্তিত্ব সম্পর্কেও তোমার মনে কোনো সন্দেহ নেই—তাহলে?'

কতোদিন আগেকার কথা। স্নানঘর থেকে ভেসে আসা সুদূরের গান আজ হঠাৎ আবার নতুন করে মনে করিয়ে দিলো ঘটনাটাকে। সবই আজ স্মৃতি। অতীতের স্মৃতি। বর্তমানের কোনো স্মৃতি হয় না। বর্তমান মানে গতানুগতিক নিয়মে বাঁধা কিছু কাজ। বর্তমান মানে কমিটমেন্টের ঋণ শোধ আর কর্তব্য পালন। বর্তমান মরে গেলে জন্ম নেয় স্মৃতি। স্মৃতি মানে বর্তমানের ফসিল, তার ইতিহাস। অভিজ্ঞতা, সুখদুঃখ আর পাপপুণ্যের ইতিহাস।

কিন্তু পাপ কাকে বলে?

রূপসা যখন ষোলো বছরের কিশোরী, তখন কোনো একদিন এক বিয়েবাড়িতে ওর এক সম্পর্কিত দাদা সকলের চোখের আড়ালে ওকে জড়িয়ে ধরে একটা চুমু খেয়েছিলো। রূপসা তাকে বাধা দেয়নি, বাধা দেবার কোনো অবকাশই ও পায়নি, একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে হয়ে গিয়েছিলো ব্যাপারটা। সেটা যে ওর তেমন খারাপ লেগেছিলো তা নয়, বরং ভালোই লেগেছিলো বলা চলে। অথচ তারপর থেকে এক বিচিত্র অপরাধবোধ ওকে ক্রমাগত পীড়ন করতে থাকে। বুকের ভেতর থেকে কে যেন অনবরত ওকে বলছিলো, 'এ অন্যায়, এ পাপ।' রূপসা অনেক ভেবেও বুঝতে পারেনি, ওকে যে চুমু খাওয়া হয়েছে সেটাই ওর পাপ, নাকি ও যে তা উপভোগ করেছিলো—সেটা। শেষ অব্দি অবোধ সেই কিশোরী ম্লান মুখে মায়ের কাছে গিয়ে জিগেস করেছিলো, 'পাপ কাকে বলে, মা?' প্রশ্নটা শুনে মা মুহূর্তের জন্যে থমকে গিয়ে বলেছিলেন, 'যা করলে নিজের বা অন্যের কোনো ক্ষতি হয়, সেটাই পাপ।' তারপর ওর চোখের দিকে এক গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিগেস করেছিলেন, 'কেন, তুমি কি কোনো পাপ করেছো?' রূপসা বলেছিলো, 'কি জানি, না বোধহয়।' মা আর কিছু জিগেস করেননি, রূপসাও আর কোনোদিন পাপ-পুণ্যের সংজ্ঞা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। বড়ো হয়ে ও অনুভব করেছে, পাপ-পুণ্য আসলে মানুষেরই সৃষ্টি। যুগে যুগে ক্ষমতাবান মানুষরা নিজেদের ব্যক্তিগত গোষ্ঠীগত এবং কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখার চেষ্টায় সাধারণ মানুষের ভয় আর ভালোমানুষীর সুযোগ নিয়ে নিজেদের ইচ্ছেমতো কিছু কিছু নিয়ম ও নীতির সৃষ্টি করেছে, পাপের ভয় আর পুণ্যের লোভ দেখিয়ে তাদের শৃঙ্খলার নামে শৃঙ্খলে বেঁধে নিজেদের উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করেছে।

কিন্তু আসলে পাপ-পুণ্যের বিভাজক রেখাটা কখনই সুনির্দিষ্ট হতে পারে না। এক ক্ষেত্রে যেটা পাপ—কারণ সেটা নিজের এবং অন্যের পক্ষে ক্ষতিকর—অন্য এক ক্ষেত্রে সেটা হয়তো আদৌ পাপের পর্যায়ে পড়ে না। অর্থাৎ এ ব্যাপারে মায়ের কথাটাই একেবারে সঠিক।

মাঝে মাঝে রূপসার মনে হয়, সুদূরকে ও কোনোদিনও ত্যাগ করতে পারবে না। কারণ সুদূর শুধুমাত্র ওর স্বামী নয়—ওর বন্ধু, ওর সন্তান। সুদূরকে ও ভালোবাসে। দয়া নয়, করুণা নয়, নির্ভেজাল ভালোবাসা। কিন্তু তাই বলে অন্য একটা দিক দিয়ে কেন ও নিজেকে বঞ্চিত করে রাখবে? সুদূর ছাড়া অন্য কাউকে যদি ওর তেমন ভালো লাগে, তাহলে তাকে দেহদান করে তৃপ্ত হবার অধিকার ওর নিশ্চয়ই আছে। কারণ দানের তৃপ্তির সঙ্গে মিশে থাকে গ্রহণের আনন্দ। জানতে পারলে সুদূর হয়তো দুঃখ পাবে। হয়তো নয়, নিশ্চয়ই তাই। কিন্তু নিজের সব কথাই তাকে জানাতে হবে, এমন তো নয়। একজনের স্ত্রী হয়েছি বলে কি আমার জীবনে ব্যক্তিগত বলে কিছু থাকতে নেই? তা ছাড়া নিজের অন্তরঙ্গ কথা অন্য একটা মানুষকে জানিয়ে, তাকে দুঃখ দিয়েই বা কি লাভ। কারণ ওতে তো কারুরই কোনো ক্ষতি নেই, ক্ষতি হয় না—মাঝখান থেকে দুটো মানুষ একটু বাড়তি আনন্দ কুড়িয়ে নিতে পারে অর্থহীন যান্ত্রিক বশ্যতার জীবন থেকে। সুদূর অক্ষম বলে নয়—সুস্থ স্বাভাবিক স্বামী থাকা সত্ত্বেও কোনো মহিলা আচমকা এ ধরনের কিছু করে ফেললে, রূপসা তাকে দোষ দিতে পারবে না। বিশ্বস্ততা? অযৌক্তিক প্রশ্ন, কারণ বিশ্বাসের আবাস শুধুমাত্র দেহে নয়। সতীত্ব? মূলাহীন। সতীত্বের কোনো পুংলিঙ্গ নেই, কারণ নিশ্চিন্ত অধিকার রক্ষার তাগিদে পুরুষ সৃষ্টি করেছে ওই ঘৃণ্য শব্দটাকে। যেন নিজেকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, আজীবন দাসত্বের মতো বিনা প্রশ্নে ওটাকে পালন করে যাওয়াই মেয়েদের পরম ধর্ম।

অথচ রূপসা পারে না, কিছুতেই অন্য পথে যেতে পারে না। অন্তত আজ অব্দি তা পারেনি। আকর্ষণের হাতছানি থাকলেও নিজেকে ও দমিয়ে রেখেছে এতোদিন। কেন, তা ওর নিজের কাছেই খুব একটা স্পষ্ট নয়। না, পাপ-পুণ্য বা অপরাধবোধের কোনো প্রশ্ন যে এর সঙ্গে জড়িত নয় সে বিষয়ে ও নিঃসন্দেহ। আসলে প্রচণ্ড একটা জেদ, একটা অনমনীয় মনোভাব, একটা কঠোর নিয়মনিষ্ঠ একগুঁয়েমিকে ও সযত্নে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে এতোদিন। ওর দৃঢ় বিশ্বাস, একদিন ও সফল হবেই। এবং নিজের উদ্দেশ্যকে সফল করে তোলার সেই সীমাহীন অক্লান্ত প্রচেষ্টায় আপাতত ও নিঃসঙ্গ ও একনিষ্ঠ হয়ে থাকতে চায়। যতোদিন সম্ভব।

কিন্তু কতোদিন—আর কতোদিন, রূপসা? তুমি কি বুঝতে পারো না আকাশ থেকে ধ্রুবতারা নয়, স্বাতী নক্ষত্র নয়—কালপুরুষের আলো ক্রমশ ছায়া হয়ে লুটিয়ে পড়ছে তোমার ব্যালকনিতে? তুমি কি জানো না, হিরোশিমার বিপন্ন ধ্বংসস্তূপে মুখ গুঁজে থাকে শুধু মুঠো মুঠো কান্নার ইতিহাস? তবে কেন এ অবুঝ প্রয়াস তোমার? কেন এ অর্থহীন অহঙ্কার? বিদায়ের নীল কমাল উড়িয়ে শেষ মেল ট্রেনটা যখন একটু একটু করে দৃষ্টির দিগন্ত থেকে উধাও হয়ে যাবে, তখন সেই বিষণ্ণ সন্ধ্যায় হতাশ হয়ে তুমি আবিষ্কার করবে, ক্লান্ত প্লাটফর্মে তুমি বড়ো একা, বড়ো নিঃসহায়।

সময় বড়ো নিষ্ঠুর রূপসা, সময় কখনও প্রতীক্ষার জানলায় মুখ রেখে দাঁড়ায় না।

আচমকা সম্বিৎ ফেরে রূপসার। সেই কখন থেকে পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল হয়ে বসে থাকতে থাকতে পায়ে ঝিঁঝি ধরে গেছে। চিমটি কাটলে চলে যাবে, কিন্তু নড়ে বসতে ইচ্ছে করছে না। স্নানঘর থেকে এখনও সুদূরের গান ভেসে আসছে। 'এরে ভিখারি সাজায়ে কী রঙ্গ তুমি করিলে, হাসিতে আকাশ ভরিলে।' অন্য গান। তার মানে কি অনেকটা সময় কেটে গেছে ইতিমধ্যে? কে জানে। তবে ভেতরে এখন জলের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না। হয়তো সাদা তোয়ালে দিয়ে সুদূর গা মুছছে এখন। একটু বাদেই বেরিয়ে আসবে। গায়ে বেহিসেবী পাউডার ছড়িয়ে, কোলন লাগাবে ঘাড়ে গলায় ও কানের পেছনে। তারপর পাতলা প্রিন্টেড একটা পাঞ্জাবি গায়ে চাপিয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে দ্রুত চিরুনি চালাবে মাথায়।

আস্তে আস্তে উঠে, পায়ের ঝিঁঝি তাড়ালো রূপসা। তারপর টেবিলে থালা সাজিয়ে ক্যাসেরল খুললো। বেশ গরম আছে খাবারগুলো। খুব সুবিধে হয়েছে ক্যাসেরলগুলো কিনে। শীতের দিনে খেতে আরও মজা লাগবে। আসছে মাসে একটা নন-স্টিকি ফ্রাইং প্যান কিনতে হবে। অফিসের সুজাতা সেদিন বলছিলো, ওতে তেলের খরচ নাকি ভীষণ কম হয়। কিন্তু গ্যাসের ব্যাপারটা এবারে সত্যিই ভাবিয়ে তুলেছে। আজও নতুন সিলিণ্ডার আসেনি, অথচ খবর দেওয়া হয়েছিলো সেই দশ-এগারো দিন আগে। পাশের ফ্ল্যাটের মহিলাকে ওদের ফ্ল্যাটের চাবিটা দিয়ে রাখে রূপসা। কিন্তু কে জানে, উনি হয়তো কোথাও বেরিয়েছিলেন আর ঠিক তখনই গ্যাসের লোক সিলিণ্ডার নিয়ে এসে ফিরে গেছে। ভাগিস ডাবল সিলিণ্ডার করা হয়েছিলো, নইলে কি যে হতো! প্রতিবারই গ্যাস ফুরোলে এই এক যন্ত্রণা। কাল অফিসে গিয়েই টেলিফোনে একটা রিমাইণ্ডার দিতে হবে। কিন্তু ফোনের লাইন পাওয়াও তো এক সমস্যা বিশেষ! দিনকালের এমন অবস্থা যে কোনো ব্যাপারেই এখন আর নিশ্চিন্ত থাকার উপায় নেই।

'এ বেলায় কি খাওয়াচ্ছো?' রূপসার পাশে দাঁড়িয়ে নরম গলায় জিগেস করলো সুদূর। হালকা একটা সুগন্ধ ভেসে আসছে ওর শরীর থেকে। মুখে মৃদু হাসি।

'ছানার ডালনা, মাছ আর ভাত।' মুখ না তুলেই জবাব দিলো রূপসা। 'তুমি আর দেরি করবে না, এখুনি বসে পড়ো। অনেক রাত হয়েছে।'

'কতোদিন তুমি শুক্তো রাঁধো না!' চেয়ারে বসে সুদূর অনুযোগ জানালো।

অসহ্য! শুক্তো—অর্থাৎ একগাদা আনাজের সঙ্গে উচ্ছে-করলা দিয়ে তৈরি ট্যালট্যালে একটা ফ্যাকাশে পাঁচন। রূপসা দেখতে পারে না দু চোখে। কিন্তু শাশুড়ি ঠাকরুণ নিয়মিত ওই বস্তুটি তাঁর ছেলেকে সযত্নে রেঁধে খাওয়াতেন। ওতে নাকি শরীর ঠাণ্ডা থাকে। ছেলের শরীর ঠাণ্ডা রাখার জন্যে ভদ্রমহিলার কেন যে অমন উৎকট আগ্রহ তা প্রথম প্রথম ভেবে পেতো না রূপসা। পরে ওর মনে হয়েছে, ছেলে ফার্নেস হয়ে উঠলে যদি সে বউয়ের গোলাম হয়ে যায়, সেই আশঙ্কাতেই উনি বোধহয় তাকে ফ্রিজ করে রাখতে চাইতেন। ওদিকে রূপসাকে নিয়েও ওঁর উৎকণ্ঠার অন্ত ছিলো না। একদিন সুদূরের দিদি সুতপার সঙ্গে কথা

বলছিলেন উনি। দুজনেই ভেবেছিলেন, রূপসা তখন বাথরুমে। কিন্তু রূপসা যে তার আগেই বাথরুম থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে মাথা আঁচড়াচ্ছিলো, ওঁরা তা বুঝতে পারেননি।

মহিলা বলছিলেন, 'একটা বাচ্চা-কাচ্চা হলে অতোটা চিন্তা করতাম না। বাঁধন থাকতো। কিন্তু তা তো হবার নয়। তাই আমার যতো দুশ্চিন্তা। বাইরে যায়, চাকরিবাকরি করে, দু-দশজনের সঙ্গে মেশে—কিছু একটা হয়ে যেতে কতোক্ষণ? ছেলেকে অতো করে বললাম, হয় ওকে ছাড় আর নয়তো ওকে চাকরি থেকে ছাড়া। চাকরিটা না থাকলে অনেকটা নিশ্চিন্তে থাকা যায়। নইলে শেষ অব্দি একদিন একটা কেচ্ছা কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। কিন্তু সে কি কিছু বোঝে, না বোঝার চেষ্টা করে? যতো জ্বালা হয়েছে আমার।'

'ওই মেয়েকে তুষ্ট রাখা তোমার ছেলের ক্ষমতায় কুলোবে না, মা।' সুতপা বলেছিলো, 'দ্যাখো, ইতিমধ্যেই কারুর সঙ্গে কিছু করে বসেছে কি না। এরপর পেটে একটা এসে গেলে, তোমার হবে সাপের ছুঁচো গেলার মতো অবস্থা। না পারবে কাউকে কিছু বলতে, না পারবে হজম করতে। এটা কখনও ভেবে দেখেছো?'

এরপর রূপসা আর কিছু শুনতে চায়নি। তাই ঘরের পর্দা সরিয়ে ওঁদের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো স্থির হয়ে। সুতপা তখুনি উঠে গিয়েছিলো আর ভদ্রমহিলা মুখ নামিয়ে নিজের কাজে মন দিয়েছিলেন—যেন কিছুই হয়নি, এমনি একটা ভাব। ওঁদের সঙ্গে এসব নিয়ে কথা বলার কোনো প্রবৃত্তি হয়নি রূপসার। কিন্তু সেদিনই ও সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো, এঁদের সঙ্গে আর একত্রে থাকা নয়। এবং সিদ্ধান্তটা কাজে পরিণত করতে, যথারীতি খুব একটা বেশি সময়ও ও নেয়নি।

কিন্তু সেদিন তুমিও কেন ওদের মতো অবুঝ হয়ে উঠেছিলে, সুদূর? কেন হাজার রকম বিধি-নিষেধ দিয়ে বেঁধে রাখতে চেয়েছিলে আমাকে? তুমি কি জানতে না, ভালোবাসার চাইতে বড়ো বাঁধন আর কিছু নেই? তুমি কি জানতে না ভালোবাসা না থাকলে অন্য সব বাঁধনই একদিন তুচ্ছ হয়ে যায় অতি অনায়াসে? তবে কেন তুমি নিরপেক্ষ থাকার আড়ালে ওঁদেরই মদত দিয়েছিলে সেদিন? আমি জানি, আসলে তুমি তা চাওনি। আসলে ওই মারাত্মক ব্যাধি শরীরের সঙ্গে সঙ্গে তোমার মনেরও অনেক সর্বনাশ করে গেছে। তোমার মেরুদণ্ডটা নরম রয়ে গেছে তোমার চরিত্র দৃঢ় হতে পারেনি। তোমার মা ও দিদির অত্যধিক স্নেহ ও যত্ন তোমাকে একটি প্রাপ্তবয়স্ক শিশু করে তুলেছে, তাঁরা তোমার ব্যক্তিত্বকে গড়ে উঠতে দেননি। হয়তো তাঁরা নিষ্ঠুর পৃথিবীর সমস্ত বৈরিতা থেকে তোমাকে আড়াল করে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ওঁরা তো চিরদিন থাকবেন না, বাস্তবের মুখোমুখি একদিন তো তোমাকে হতেই হবে! তাই আমি চেয়েছিলাম তোমাকে সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তুলতে। তাই তোমার স্নেহময়ী মা ও দিদির আড়াল থেকে তোমাকে সরিয়ে আনতে আমি সেদিন বিদ্রোহী হয়েছিলাম। আজও আমি হার মানিনি। কিন্তু তোমার সহযোগিতা ছাড়া আমি জিতবো কি করে, সুদূর? তুমি কি আমাকে একটু সাহায্য করবে না?

'সত্যি, তোমার বুদ্ধির প্রশংসা না করে কোনো উপায় নেই,' মাছের ঝোল দিয়ে

ভাত জড়াতে জড়াতে মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়ে তোলে সুদূর।

'মানে?' রূপসা বুঝতে পারে না, আক্রমণ কোন দিক দিয়ে আসবে।

'তোমার কোথাও এতোটুকু ত্রুটি নেই। সারাদিন পরিশ্রম করে টাকা রোজগার করছো। তা সত্ত্বেও আ গুড কুক অ্যাণ্ড আ ভেরি গুড হাউসকিপার।'

রূপসা কোনো জবাব দেয় না।

'কিন্তু আসলে আমাকে শিখণ্ডি দাঁড় করিয়ে তুমি দিনের পর দিন নির্বিবাদে যা খুশি তাই করে চলেছো, কেউ কিচ্ছু বুঝতে পারছে না।'

'বুঝলাম না,' রূপসার ভুরু দুটো কুঁচকে ওঠে।

'ইউ নো হোয়াট আই মিন।'

'নট অ্যাট অল। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'তুমি কি বলতে চাও, তুমি আজ অব্দি অন্য কারুর সঙ্গে শোওনি? তুমি যা সেক্সি মেয়ে, তাতে অ্যাম আই টু বিলিভ ইট?'

'দ্যাটস আপ টু ইউ!' রূপসার মুখ রক্তিম হয়ে ওঠে, 'তোমার যা খুশি তুমি ভেবে নিতে পারো। আয়্যাম নট বদারড।'

'সেটাই তো বুদ্ধির পরিচয়! মাথা ঠাণ্ডা রেখে নিজের কাজ করে যাও। কেউ কিছু বললো তো বয়ে গেলো। আর আমি তো শালগ্রাম শিলা!'

'প্লিজ সুদূর।' রূপসা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, 'ইউ আর গেটিং অন মাই নার্ভস।'

'সেকি।' সুদূর ভুরু তুলে তাকায়, 'আজকাল তুমি কি তাহলে সত্যকে স্বীকার করতে ভয় পাচ্ছো?'

'তোমার কি কোনোদিন, একবারের জন্যেও, তা মনে হয়েছে?'

'তাহলে আজ কেন সেটাকে স্বীকার করছো না?'

'কি?'

'আমাদের বিয়েটা তোমার কাছে একটা আইডিয়াল লাইসেন্স। বোকার মতো ডিভোর্স নিয়ে তুমি এই দামী লাইসেন্সটাকে কিছুতেই হাতছাড়া করতে রাজি নও। বলো, কথাটা কি সত্যি নয়?'

রূপসা কোনো জবাব না দিয়ে বেসিনের কল খুলে হাত ধুতে থাকে। যেন অন্য দিকে ওর মনোযোগ দেবার মতো বিন্দুমাত্র অবসর নেই।

'জবাব দিচ্ছো না যে?'

'বাজে কথার জবাব দেবার মতো মানসিকতা আমার নেই।'

'বাজে কথা? বেশ, তাহলে বলো—আজকাল প্রায়ই তোমার বাড়িতে ফিরতে দেরি হচ্ছে। কেন?'

'কৈফিয়ত দেওয়া আমার স্বভাবে নেই। তবু বলছি, তুমি সময়মতো বাড়ি ফিরলে আমিও হয়তো দেরি করতাম না।'

'চমৎকার অজুহাত। কেন স্বীকার করছো না যে ওই সময়টাতে তুমি ডেটিং করে বেড়াও, তোমার আলাদা অ্যাফেয়ার আছে? ওয়েল, ইচ্ছে করলে তুমি এখনও তা পারো, আই ডোন্ট মাইণ্ড। বলো, তেমন কাউকে টেলিফোনে ডেকে দিতে

হবে?'

'কাকে?' উত্তেজনায় সমস্ত শরীর আঁট হয়ে ওঠে রূপসার।

'যাকে তুমি বলবে। ধরো, অনুভবকে?'

'সুদূর!' একটা অস্ফুট চিৎকার রূপসার গলা দিয়ে বেরিয়ে আসে। 'ইতরামো কোরো না, প্লিজ। ওসব তোমাকে মানায় না।'

কথাটা শেষ করেই শোবার ঘরের দিকে পা বাড়ায় রূপসা। কিন্তু ওর ক্লান্ত মুখে ফুটে ওঠা তীব্র অনীহার অভিব্যক্তি সুদূরের সমস্ত শরীরে যেন একটা নিদারুণ কলরোল জাগিয়ে তোলে। সে ভেবেছিলো এতোদিনের একান্ত মিনতিতে যা হয়নি, এবারে তা হবে। অপমানের খোঁচায় দপ করে জ্বলে উঠবে অহঙ্কারী রূপসা। তারপর রাগ দুঃখ লজ্জা আর তীব্র ক্ষোভে বিচ্ছেদের প্রস্তাব মেনে নেবে। কিন্তু রূপসার শেষ কথাটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও সুদূরের বুকে জ্বালা ধরিয়ে দেয়।

'আমাকে তুমি ইতর বললে?' রূপসার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে সুদূর।

'না। আমি বলেছি, ইতরামো তোমাকে মানায় না।'

'অর্থটা একই।'

'না, তা নয়।'

'কথার মারপ্যাঁচে আমি তোমার সঙ্গে পারবো না, হেরে যাবো। কিন্তু আমার ধারণা দুটোর অর্থে কোনো প্রভেদ নেই। যাই হোক, একটা কথা তুমি মন দিয়ে শুনে রাখো। ইদানীং তোমার চালচলনে আমি ভীষণ বিরক্ত হয়ে উঠেছি। তুমি আমার পুরনো প্রস্তাবটাতে রাজি না হলে, এবারে আমাকে বাধ্য হয়েই অন্য পথে পা বাড়াতে হবে।'

'কি রকম?' অভিব্যক্তিহীন মুখ রূপসার।

'তুমি নিজে থেকে ডিভোর্স না চাইলে, এবারে আমি তোমার বিরুদ্ধে ব্যভিচার এবং মানসিক নিষ্ঠুরতার অভিযোগ আনবো। সেটা কিন্তু তোমার পক্ষে খুব একটা সম্মানজনক ব্যাপার হবে বলে মনে হয় না। তাই নয় কি?'

রূপসার আশ্চর্য চোখ দুটো মুহূর্তের জন্যে ঝিকমিকিয়ে ওঠে। একটু একটু করে নিদারুণ বিদ্রূপে বেঁকে ওঠে ওর পুরুষ্ট ঠোঁট দুটি। তারপর প্রতিটি শব্দ কেটে কেটে সুস্পষ্ট উচ্চারণে একটু একটু করে বলে, 'চেষ্টা করে দেখতে পারো। তবে কোনো লাভ হবে না। তুমি কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না, সুদূর!'

৩

অস্বাস্তটা ক্রমশ বাড়ছিলো অরিতর।

এমন ঘটনা সাধারণত ঘটে না। অবিশ্যি অনুভব যে প্রতিদিন একই সময়ে

অফিস থেকে ফেরে, তা নয়। বরং বিপরীত রীতিটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক। তবে মোটামুটি আটটার চাইতে বেশি রাত খুব একটা হয় না। হলেও, কর্তব্যের খাতিরে ফোন করে বা লোক পাঠিয়ে আরতিকে তা জানিয়ে দেয়। আর দেরি হবে বলে খবর পাঠালে আরতি ধরে রাখে, ওর ফিরতে রাত তিনটেও হতে পারে। এ ব্যাপারে আজকাল আর তেমন মাথা ঘামায় না আরতি। তবু সেই সমস্ত অন্তহীন নিঃসঙ্গ প্রহরগুলোতে অহেতুক আশঙ্কার একটা বিষাক্ত পোকা প্রায়ই ওর মনের কোণে ঘুমিয়ে থাকা অস্বস্তিটাকে অহেতুক খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জাগিয়ে তোলে। তখন আরতির মাথা গরম হয়ে ওঠে, শরীরে ঘাম হয়, নিঃশ্বাস বইতে থাকে ঘনঘন। এমনি করেই কেটে যায় ততোক্ষণ, যতোক্ষণ না অনুভবের গাড়ির আওয়াজ এ বাড়ির দরজার সামনে এসে থামে। শুনে শুনে গাড়ির আওয়াজটা আজকাল চেনা হয়ে গেছে আরতির। কিন্তু গাড়িটা এসে পৌঁছনোর পর থেকে ওর আর কোনো আগ্রহ থাকে না। কারণ ও জানে, তারপর কি ঘটবে। ও জানে, রাত বেশি হবার সম্ভাবণা থাকলে, বিশেষ করে কোনো পার্টি অ্যাটেণ্ড করে ফেরার সময়, অনুভব ড্রাইভারকে আগেই ছুটি দিয়ে দেয়। তখন ওই অবস্থায় লোকটা যে কি করে নিজে গাড়ি চালিয়ে ভালোয় ভালোয় ফিরে আসে তা ঈশ্বরই জানেন। গাড়ির হর্ন শুনলেই মাধব তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে গ্যারাজের দরজা খুলে দেয়। সাহেবকে গাড়ি তুলতে সাহায্য করে। তারপর ঈষৎ অসংযত পদক্ষেপে অনুভব ড্রইংরুমে ঢুকে জুতো খোলে এবং পাজামা পাঞ্জাবি হাতে নিয়ে বাথরুমে যায়। এরপর তার বিছানায় আসার কথা। কিন্তু অনুভব তখন বেডরুম সংলগ্ন ছোটো ঘরটাতে গিয়ে ক্যাসেট প্লেয়ারে খুব নিচু ভলিউমে কোনো সফট ওয়েস্টার্ন মিউজিক অথবা দু-একখানা রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে শুনতে খোলা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে অন্যমনে সিগারেট খায়। এবং তারপর প্রায় চোরের মতো পা টিপে টিপে বেডরুমে ঢুকে, চুপচাপ বিছানায় নিজের জায়গায় শুয়ে পড়ে। ঘরের আবছা নীলাভ আলোয় মানুষটাকে বড়ো ক্লান্ত আর নিঃসঙ্গ বলে মনে হয় তখন।

তবু আরতির রাগ হয়। ঘেন্না হয়। মদ খাওয়া বা মাঝরাত কাবার করে দিয়ে বাড়িতে ফেরা—এর কোনোটাই ওর রক্ষণশীল মধ্যবিত্ত মানসিকতা সহজভাবে মেনে নিতে পারে না। ওর ধারণা, এগুলো খারাপ চরিত্রের লক্ষণ। বিয়ের পর প্রথম প্রথম এসব নিয়ে ও অনেক অশান্তি করেছে। ঝগড়া করেছে, খাওয়াদাওয়া বন্ধ করেছে, এমন কি কয়েক দিন রীতিমতো ঝাঁজ দেখিয়ে গোয়াবাগানে বাপের বাড়িতেও চলে গেছে। অথচ আশ্চর্য মানুষ এই অনুভব। আরতির এমনধারা ব্যবহারে সে কোনোদিনও এতোটুকু রাগ করেনি। কিংবা রাগ করলেও তা প্রকাশ করেনি। দিনের পর দিন অসীম ধৈর্য নিয়ে সে আরতিকে এ কথা বোঝাবার চেষ্টা করেছে যে আসলে এর সব কিছুই বাইরের পোশাক, এগুলো দিয়ে তার ভেতরটাকে চেনা যাবে না, কিন্তু এ সমস্ত অকুপেশনাল হ্যাজার্ডস না মেনেও কোনো উপায় নেই। আরতিও সাময়িকভাবে তাতে নরম হয়েছে, কিন্তু এ সমস্ত হ্যাজার্ডসের তথাকথিত যৌক্তিকতা কিছুতেই ওর বোধগম্য হয়নি। ও আজও পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে না, চাকরির স্বার্থে একটা মানুষকে মদ খেতে হবে কেন? বুঝতে পারে না বিজ্ঞাপন অফিসের কাজ এমন কি একটা আলাদা ব্যাপার এবং সেখানে

এতো কি কাজ থাকতে পারে যে তাতে কাজের প্লাবনে রাত দুপুরেও বাড়িতে ফেরার সময় পাওয়া যাবে না? কিন্তু আজকাল এসব নিয়ে ও আর কথা বাড়ায় না। কারণ ও জানে, তা নিরর্থক। কিন্তু ওই বিশেষ অবস্থায় অনুভব ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করলেই ওর শরীর গুলিয়ে ওঠে। সেটা ও কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারে না।

বিয়ের আগে আরতি বাপের বাড়িতে চিরকাল শাড়ি-ব্লাউজ পরেই রাত কাটিয়েছে। মাকেও তাই দেখেছে। এ বাড়িতে আসার পর অনুভবই ওকে রাত্রিবাস ব্যবহার করতে শেখায়। প্রথম দিন ওই বিদঘুটে পোশাকটা পরে ও লজ্জা ও সঙ্কোচে অনুভবের দিকেও সহজ দৃষ্টিতে তাকাতে পারছিলো না। নিজেকে একটা বেশ্যার মতো বেলজ্জ, অশ্লীল এবং খেলো বলে মনে হয়েছিলো ওর। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুই বদলে যায়। তাই আজকাল, বিশেষ করে গরম কালে, ওই নির্লজ্জ পোশাকটাকেই ওর সব চাইতে আরামদায়ক মনে হয় এবং শুধু রাতে নয়, দিনের বেলাতেও ও ওই পোশাকেই স্বচ্ছন্দে বাড়ির মধ্যে চলাফেরা করে—তবে বাইরের কেউ এলে, ভদ্রতা ও শালীনতা বজায় রাখার তাগিদে, তার ওপরে একটা হাউসকোট চাপিয়ে নেয়।

শুধু তাই নয়। আজকাল শোবার আগে আরতি দিনের আবরণীটা বদলে নিতে ভোলে না। ভোলে না ত্বক-পরিচর্যার শেষে শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশে অকাতরে সুগন্ধি ছড়াতে। এসবই অনুভবের শেখানো। এগুলো সে পছন্দ করে। এসব নাকি তার কল্পনাকে মুক্ত করে দেয়। আরতি গ্রাজুয়েট। কিন্তু এ সমস্ত কথার কোনো অর্থ ও বুঝতে পারে না। মাঝে মাঝে ওর মনটা বেঁকে বসে। ভাবে, অনুভবের 'কল্পনাকে মুক্ত করে দেবার' অর্থ কি তার যৌন বাসনাকে উশকে দেওয়া নয়? এটা কি ওর নিজের পক্ষে খুব একটা সম্মানজনক? ভাবতেই ওর সারা শরীর বিবমিষায় বিমুখ হয়ে ওঠে।

অথচ অনুভব বলে, প্রতিটা খেলারই কিছু নিজস্ব নিয়ম থাকে। এ খেলার এটাই নিয়ম, এতেই সৌন্দর্য, এতে মান-সম্মানের কোনো প্রশ্ন নেই। আরতির কি ভালো লাগে না, রাত্রিবেলা স্নানের শেষে সারা গায়ে পাউডার ছড়িয়ে, অনুভবকে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে বিছানায় আসতে দেখলে? হয়তো লাগে, কিন্তু এ ব্যাপারে আরতির কোনো সজাগ অনুভূতি নেই। চিরকাল ও বাবাকে বাড়িতে লুঙ্গি পরিহিত অবস্থাতেই দেখেছে। সেই সঙ্গে শীতের দিনে ঊর্ধ্বাঙ্গে একটা গেঞ্জি বা ফতুয়া, গ্রীষ্মে তাও নয়। এই নিয়ে আরতির মায়ের মনে কি খেদ আছে এতোটুকুও? সম্ভবত না। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে বরঞ্চ অনুভবের ধোপদুরস্ত হয়ে শুতে আসাটাই খানিকটা বাড়াবাড়ি বলে মনে হয় আরতির।

অনুভবের চরিত্রের আরও একটা বিপজ্জনক দিক আরতিকে রীতিমতো পীড়িত ও ক্ষুণ্ণ করে। শরীর সম্পর্কে মানুষটার কোনো সময়-অসময় জ্ঞান নেই। তার কাছে নির্দিষ্ট সময় বলে কিছু নেই। সকাল, দুপুর, বিকেল, কি রাত্রি—কোনোটাই তার কাছে অসময় নয়। বলে, ইচ্ছেটাই নাকি বড়ো কথা। তবে শুধুমাত্র একজনের ইচ্ছে নয়, দুজনের। নইলে সেটা নাকি রেপ করার সামিল হয়। এ কথারও

কোনো অর্থ আরতির মাথায় ঢোকে না। ও ভেবে পায় না, স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে 'রেপ' নামক অশ্লীল অবৈধ ও ভয়ঙ্কর শব্দটা আসে কি করে। তবে এ-ও সত্যি, অনুভব ওর ইচ্ছেটাকে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করবে না। এবং লজ্জার মাথা খেয়ে আরতিকে স্বীকার করতেই হয়, ইচ্ছেটা তখন জান্তব আগ্রহ হয়ে ওকেও উন্মুখ করে তোলে। অথচ তা সত্ত্বেও, কিছু প্রচলিত ধারণা আর জীর্ণ সংস্কারের বশে, ব্যাপারটা ওর কাছে প্রচণ্ড অরুচিকর এবং অন্যায় বলে মনে হয়।

অনুভবের অফিসের বন্ধুবান্ধবদের কাউকেই তেমন পছন্দ করে না আরতি। অনুভব অবিশ্যি বলে, ওরা তার বন্ধু নয়—সহকর্মী মাত্র, বন্ধুত্ব অমন সহজলভ্য বস্তু নয়। কিন্তু বন্ধুই যদি না হবে তাহলে পার্টিগুলোতে অমন ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতা, অমন গায়েপড়া আদিখ্যেতা কেউ দেখায় নাকি? যে যার সঙ্গে পারছে নাচছে—কোমর জড়িয়ে শরীর দোলানো ওই অসভ্য ভঙ্গিটাকে একমাত্র হিন্দি সিনেমাতেই বোধহয় নাচ বলে চালানো যায়—কথার পিঠে পিঠে হাহা হিহি করে হাসতে হাসতে একজন আর একজনের গায়ে ঢলে পড়ছে, পুরুষ-মহিলাতে কোনো ভেদাভেদ নেই, যে যেমন খুশি মদ গিলছে—ছি ছি ছি, নোংরামো আর বেলেল্লাপনার একেবারে চূড়ান্ত! দু-তিনটে পার্টি অ্যাটেণ্ড করার পর আরতি আর ওসবের মধ্যে যেতে চায়নি। ভাগ্যি ভালো, অনুভবও তা নিয়ে ওকে আর জোর করেনি কোনোদিন।

অফিস বাদে আর যাদের সঙ্গে অনুভবের অন্তরঙ্গতা, তারা সংখ্যায় চারজন। তুহিন, সুদূর, সোনালি আর রূপসা। ওরা সবাই জে. ইউ.তে অনুভবের সঙ্গে ইংরেজি পড়তো। তুহিন এম, এ.তে অ্যাডমিশন নেবার পরেই এল. আই. সি.তে চাকরি পেয়ে পড়া ছেড়ে দেয় এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সোনালিকে বিয়ে করে সংসারী হয়। সোনালি শেষ অব্দি কোর্সটা কমপ্লিট করেছিলো, কিন্তু ঠিক সময় বুঝে বাচ্চাটা এসে যাওয়ায় পরীক্ষাটা আর দিতে পারেনি। ওদের ছেলে টোটার বয়েস তিন। সোনালি চাকরি করে না, আরতির মতো ঘরদোর সামলায় আর বাচ্চার পেছনে লেগে থাকে। ওদিকে এম. এ. পাস করার পর সুদূর একটা প্রাইভেট ইনডাস্ট্রিয়াল ইউনিটে জয়েন করে, রূপসা চাকরি পায় একটা বিদেশী ব্যাঙ্কে। তারপর ওদের বিয়ে হয়। অনুভব তখনও পড়াশুনো শেষ করেনি। তুহিন আর সুদূর যখন বউ আর চাকরিবাকরি নিয়ে ঘোর সংসারী, অনুভব তখন বেলা ভিস্তায় মন দিয়ে এম. বি. এ. করছে। তারপর সিগমা অ্যাড এজেন্সিতে চাকরি এবং মা-বাবার দেখেশুনে পছন্দ করা পাত্রী আরতির সঙ্গে বিয়ে। তাও আজ এক বছরের ওপরে হয়ে গেলো। এর মধ্যে বেশ কয়েক বারই তুহিন-সোনালি এবং সুদূর-রূপসার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ কথাবার্তা হয়েছে আরতির। কিন্তু আরতি ওদের সম্পর্কে কিছুতেই উৎসাহী হয়ে উঠতে পারেনি। আরতির কাছে ওরা যেন এক অন্য গ্রহের অধিবাসী। ওদের কথাবার্তা, চিন্তাভাবনা, চালচলন—এমন কি সাজপোশাকও আরতির কাছে অপরিচিত ও অকল্পনীয়। একবার একটা কারণবিহীন গেট টুগেদারে সোনালিকে ঘাঘরা-কাঁচুলি আর রূপসাকে চুড়িদারের সঙ্গে দোপাট্টা ছাড়া একটা প্রায় স্বচ্ছ কামিজ পরতে দেখে ও নিজেই লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিলো। মাঝখানে ওর মনে একটা ভীষণ ভয় ঢুকে গিয়েছিলো। কে যেন বলেছিলো, এ ধরনের ঘনিষ্ঠ

বন্ধুরা স্রেফ মজা করার জন্যে সস্ত্রীক বাইরে বেড়াতে গিয়ে, নিজেদের ইচ্ছে অনুযায়ী সাময়িকভাবে নাকি শয্যাসঙ্গিনীও অদলবদল করে নেয় এবং তাতে তাদের স্ত্রীরাও নাকি অরাজি থাকে না। শুনে ঘেন্নায় সর্বাঙ্গ শিউরে উঠেছিলো আরতির। সেই থেকে অনুভবের বন্ধুবান্ধব সম্পর্কে ও আরও বেশি করে সতর্ক ও সচেতন হয়ে উঠেছে, কারুর সঙ্গেই মেলামেশায় এতোটুকু আগ্রহ দেখায়নি এবং সুযোগ সৃষ্টি করে যথাসম্ভব ওদের সংস্রব এড়িয়ে গেছে। আরতি মুখে কিছু প্রকাশ না করলেও, অনুভব এ ব্যাপারে ওর মানসিকতা বুঝতে ভুল করেনি এবং প্রথম প্রথম সে ওকে বোঝাবার আপ্রাণ চেষ্টা করলেও, পরে সম্ভবত হাল ছেড়ে দিয়েছে। এখন আরতির সামনে সে বন্ধুবান্ধবদের প্রসঙ্গটাই আর তোলে না।

একদিন, সেদিনও অনেক রাত করে বাড়ি ফিরেছিলো অনুভব, সামান্য একটু টিপসি হয়ে। তারপর স্নান সেরে, পোশাক বদলে সিগারেট খেয়েছিলো ছোটো ঘরের খোলা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে, কি যেন একটা ছাইপাঁশ ইংরেজি গান শুনতে শুনতে। আরতি তখনও ঘুমোয়নি, শুয়েছিলো চোখ বন্ধ করে। এক সময় অনুভব শোবার ঘরে এলো, ওর পাশে বসলো, ডান হাতের তর্জনি দিয়ে সযত্নে সরিয়ে দিলো ওর কপালে লুটিয়ে থাকা অবিন্যস্ত কয়েকটি চুল। চোখের কোণ দিয়ে আরতি দেখলো, মানুষটার আগ্রহী মুখ ক্রমশ নেমে আসছে ওর মুখের দিকে। এবং তৎক্ষণাৎ চরম মুহূর্তের জন্যে নির্দ্বিধায় নিজেকে প্রস্তুত করে নিলো ও।

অনুভবের ঠোঁট ওর ঠোঁট স্পর্শ করতেই দু হাতে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিলো আরতি, 'আমার ঘুম পাচ্ছে।'

'তাই বুঝি?' মিষ্টি করে হাসলো অনুভব, 'আমি তো ভেবেছিলাম তুমি অলরেডি ঘুমের দেশে চলে গেছো।'

'তাই সুযোগ নিতে চাইছিলে? এতো রাতে এসে, আর একজনের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়ে?'

'এতো রাত কোথায়, ডালিং। মোটে তো বারোটা দশ! এ রাত তো এখন সবেমাত্র যুবতী হলো।'

'মদ খাওয়া ঠোঁটে চুমু খেতে আমার ঘেন্না করে।'

'কিন্তু আমি তো এইমাত্র স্নান করে এলাম। আর কি করলে শুদ্ধ হওয়া যাবে, বলো তো?'

'তুমি জীবনেও শুদ্ধ হবে না। ঘেন্না ধরে গেলো আমার।'

'কিসে ঘেন্না, রতি? কাকে?' অনুভবের ঠোঁটে তখনও প্রশ্রয়ের হাসি। 'আমাকে?'

'ঘেন্না নিজেকে,' আরতি পাশ ফিরে শুলো।

'তোমার শরীরটা কি আজ ভালো নেই?'

'কেন?' ফের অনুভবের দিকে ফিরে নিষ্ঠুর হলো আরতি, 'এই মুহূর্তে আমার শরীরটা তোমার কাছে বড্ড বেশি দরকারী, তাই না?'

'রতি!' অনুভব থমকে গেলো।

'সত্যি কথা শুনতে কারুরই ভালো লাগে না। তোমারই বা লাগবে কেন?'

তবু নিবিড় মমতায় সেই নিষ্ঠুর রমণীর বুকে মাথা রাখে অনুভব, 'রাত হয়েছে বলে আমার বুলবুলিটা আজ বড্ড রেগেছে।'

এবং তখনই একটা মোক্ষম অস্ত্র ব্যবহার করলো আরতি। দৃঢ় অথচ হিংস্র গলায় ফিসফিসিয়ে ও বললো, 'যা করার দয়া করে তাড়াতাড়ি করো—করে আমাকে নিষ্কৃতি দাও।'

'রতি!' আহত বিস্ময়ে ওর বুক থেকে মাথা তুললো অনুভব, 'শুধু শরীর নয়, আমি শরীর দিয়ে তোমার মনকে ছুঁয়ে যেতে চাই। কিন্তু এই দুটোর প্রভেদ বোঝার মতো ক্ষমতা বোধহয় তোমার নেই।'

'যার আছে তার কাছে গেলেই পারো? তোমার তো বান্ধবীর কোনো অভাব নেই বলেই জানি।'

আরতি স্পষ্ট দেখলো, অনুভবের মুখ আরক্তিম হয়ে উঠেছে। মুহূর্তের মধ্যে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো সে। তারপর দৃঢ় অথচ মৃদু কণ্ঠে বললো, 'তোমার মধ্যে যদি বিন্দুমাত্রও শালীনতা বা ভদ্রতাবোধ থাকে, তাহলে অন্তত নিজের সম্মান বজায় রাখার আগিদে তুমি ভবিষ্যতে আর কোনোদিনও আমার সামনে আমার বন্ধুদের সম্পর্কে কিছু বলবে না।'

'তা ভেবে দেখবো। তবে তোমার মতো মানুষের কাছ থেকে নতুন করে ভদ্রতা বা শালীনতা শেখার কোনো ইচ্ছে আমার নেই।'

কথার খোঁচায় মানুষটাকে তখন আরও উশকে দিতে চেয়েছিলো আরতি। কিন্তু অনুভব সেদিন আর কিছুই বলেনি। এবং তার পর থেকে সে দৈহিক দিক দিয়েও আরতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার আগ্রহ দেখায়নি কোনোদিন।

অথচ আরতি প্রতিদিনই প্রতীক্ষা করেছে। প্রথম প্রথম ভেবেছে, ও সমস্ত সাধুগিরির আয়ু বড়োজোর হাতে গোনা কয়েকটা দিন। তারপর ভেবেছে, বাঁচা গেলো—নিত্যকর্মপদ্ধতি থেকে বোধহয় রেহাই মিললো। কিন্তু তারপর ও নিজেই অধীর হয়ে উঠেছে। তখন থেকে ওই বিশেষ ব্যাপারটাকে ওর আর ততোটা অশ্লীল বা অরুচিকর বলে মনে হয়নি।

একদিন ও অনুভবকে জিগেস করেছিলো, 'এটাই কি জীবনের সব?'

অনুভব বলেছিলো, 'না, সব নয়। অনেকখানি। তবে এটা শুধু শরীরকে নিয়ে নয়। বলতে পারো আ ফিজিক্যাল নিড, গাইডেড বাই ইমোশনাল ফ্যাকটর্স।'

আরতি সেদিন অতোশতো বোঝেনি, কিন্তু আজ ওই কথাগুলোকে ওর আর ততোটা মিথ্যে বলে মনে হয় না। অথচ ও ভেবে পায় না অনুভব আর ওর মধ্যে বিভেদের যে দেয়ালটা আজ এতোদিন ধরে একটু একটু করে গড়ে উঠেছে, সেটাকে ও ভাঙবে কি করে। আজও সন্ধ্যে থেকে এই একটা কথাই মনের মধ্যে বারবার নাড়াচাড়া করেছে আরতি। ভাবতে ভাবতে এতোখানি রাত হলো, অথচ অনুভব এখনও এসে পৌঁছুলো না। একটা খবর পর্যন্ত নেই। এমন তো হয় না বড়ো একটা! অনুভব কি বোঝে না, তাকে এখন কি ভীষণভাবে চায় ও? নাকি বুঝেও মুখ ফিরিয়ে থাকে, যাতে আরতির জ্বালাটা আরও অসহ্য হয়ে ওঠে ক্রমশ? কিন্তু কিছুই বলা যায় না, কলকাতায় আজকাল ট্র্যাফিকের যা অবস্থা তাতে ঘরের মানুষ

নিরাপদে ঘরে ফিরে না আসা অব্দি কোনো কিছুতেই বিশ্বাস নেই। একটা অঘটন ঘটে যেতে কতোক্ষণ?

কথাটা ভাবতেই বুক কেঁপে ওঠে আরতির। এবং তখনই পরিচিত গাড়ির শব্দটা ওকে আশ্বস্ত করে তোলে। ঘড়ির দিকে নিজের অজান্তেই একবার তাকায় ও। রাত প্রায় সাড়ে দশটা। এমন কিছু নয়, বহুদিনই এর চাইতে অনেক বেশি রাত করে বাড়ি ফিরেছে অনুভব। অথচ তা সত্ত্বেও আজ কেন ওর মন এমন উতলা হয়ে উঠেছে, ভেবে পায় না আরতি।

পরবর্তী ঘটনাগুলো সাধারণত গতানুগতিকতায় বাঁধা থাকে। কিন্তু আজ প্রচলিত রীতি ভেঙে ড্রইংরুমের দোরগোড়ায় গিয়ে দাঁড়ালো আরতি।

'একি, তুমি এখনও জেগে?' ওকে দেখে স্পষ্টতই অবাক হলো অনুভব।

'তোমার এতো রাত হলো?' আরতি প্রতীক্ষায় অবসন্ন হয়ে আসা প্রশ্নটা মেলে ধরলো ক্লান্ত শববীর মতো।

'হয়ে গেলো,' নির্লিপ্ত ঋষির মতো জবাব দিলো অনুভব।

'একটা খবরও তো দাওনি!'

'কিছুতেই লাইনটা পেলাম না।' বেডরুমে ঢুকে অনুভব বললো, 'অনেক বার চেষ্টা করেছি।'

'কাউকে পাঠালেও তো পারতে। তোমার ড্রাইভার ছিলো না? আমার চিন্তা হয় না বুঝি?'

'হয় বুঝি?' অনুভব ক্লান্ত ঠোঁটে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করলো। 'কিন্তু কি করি বলো! যে জন্যে আমার দেবি হয়েছে সেটা তো অফিসের কাজ নয়, তাই অফিসের কাউকে পাঠানোটা ঠিক হতো না।'

'অফিসের কাজ নয়?' আরতি বিহ্বল হয়ে ওঠে, 'তবে?'

'রূপসা ফোন করেছিলো। ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।'

'কোথায়? ওদের বাড়িতে?'

'না, ওর অফিসেই বলতে পারো। তারপর ...'

'তারপর?'

'এসব শুনতে তোমার ভালো লাগবে না, রতি। এখন এগুলো না হয় থাক।'

'না থাকবে না। তাছাড়া ভালো তো আমার অনেক কিছুই লাগে না। কিন্তু সবই যে আমার ইচ্ছেমতো হবে, এমন তো কোনো কথা নেই। তুমি বলো, অবিশ্যি তোমার যদি আপত্তি না থাকে।'

'আমার বলতে কোনো আপত্তি নেই। তবে আমি জানি, সেগুলো শুনতে তোমার ভালো লাগবে না—তাই বলতে চাইছিলাম না।' শার্ট আর গেঞ্জিটা ছেড়ে অনুভব বললো, 'তারপর আমরা গাড়িতে চেপে নিউ মার্কেটের কাছাকাছি গেলাম। একটু খেলাম, একটা সিনেমা দেখলাম।'

'সিনেমা?' বিস্মিত বেদনায় আরতির বুক থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো প্রশ্নটা।

'আমি তো তোমাকে বলেছিলাম, এসব শুনতে তোমোর ভালো লাগবে না।'

পাজামা-পাঞ্জাবি নিয়ে স্নানঘরের দরজা বন্ধ করলো অনুভব, আরতি বিছানার

এক প্রান্তে বসে রইলো স্থাণু হয়ে। কে জানে, কতোদিন ধরে এ সমস্ত চলছে। হয়তো অফিসের কাজে নিয়মিত দেরি হওয়ার এটাই আসল কারণ। হয়তো আজ রূপসা, কাল সোনালি, পরশু অফিসের ওই চালবাজ মেয়েটা—দিব্যা, না কি যেন ওর নাম—আরও কতো আছে কে জানে? আরতিকে শেষ পর্যন্ত কি ওদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে? আরতি কি পারবে ওদের সঙ্গে? যতো রাজ্যের সুন্দরী মেয়ের কি একমাত্র লক্ষ্য এই অনুভব? সে ছাড়া পৃথিবীতে কি দ্বিতীয় কোনো পুরুষ নেই? মেয়েরা যে এমন হ্যাংলা হতে পারে, তা সত্যিই আগে জানা ছিলো না আরতির।

ভাবতে ভাবতেই বাথরুম থেকে ঘরে এলো অনুভব।

'কি হলো? এখনও অমন করে বসে আছো যে?'

'রূপসা কি সিনেমায় যাবার জন্যেই তোমাকে ফোন করেছিলো?'

'না। ওটা হঠাৎ করেই হয়ে গেলো।'

'তবে?'

'তবে কি?'

'ও ফোন করেছিলো কেন?'

'সেটা ওর একটা ব্যক্তিগত কারণে।'

'তার মানে, সেটা কি আমাকেও বলা চলে না?'

'বলা উচিত নয়। তবে এটুকু বলতে পারি যে সেজন্যে তোমার মিছিমিছি মাথা ঘামাবার কোনো কারণ নেই। তুমি বরং শুয়ে পড়ো, রতি। অনর্থক রাত জাগলে তোমার আবার শরীর খারাপ করবে।'

'হঠাৎ তোমার সঙ্গে সিনেমায় কেন?'

'ইচ্ছে হলো বলে! কোনো বন্ধুর সঙ্গে সিনেমায় যাওয়া তো অস্বাভাবিক কিছু নয়।'

'তা হতে পারে। কিন্তু তাই বলে স্বামীর বদলে ...'

'তার স্বামীর অন্য কাজ থাকতে পারে, সিনেমায় যেতে ইচ্ছে না করতে পারে। তাছাড়া স্বামীর সঙ্গে যাওয়া আর বন্ধুর সঙ্গে যাওয়া কি এক কথা?'

'কিন্তু আমি তো কোনোদিন কোনো পুরুষ-বন্ধুর সঙ্গে ...' বলতে বলতে থেমে যায় আরতি।

'সেটা তোমার দুর্ভাগ্য। আমি জানি না তোমার কোনোদিন কোনো পুরুষ-বন্ধু ছিলো কি না, কিংবা আছে কি না। কিন্তু যদি না থাকে তাহলে বলবো, জীবনে একটা সুন্দর সম্পর্কের স্বাদ থেকে তুমি বঞ্চিত থেকে গেছো।'

'তোমার খুব ভালো লেগেছে, না?' দ্বিধাগ্রস্ত সুরে প্রশ্ন করে আরতি।

'কি?'

'ওর সঙ্গে বেড়াতে, সিনেমা দেখতে?'

'লাগবে না? কতোদিন বাদে দেখা!'

'আমি জানি।'

'কি জানো?'

'তুমি ওকে ভালাবাসো।'

'বাসি বইকি!'

'এ কথা তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে মুখ ফুটে বলতে পারলে? তোমার কোথাও এতোটুকু বাধলো না? তুমি কি মানুষ?' আরতির দু চোখে আগুন, অথচ বুকের ভেতরটা যেন দুমড়ে মুচড়ে তছনছ হয়ে যায়।

'বাধবে কেন?' আবেগবর্জিত কণ্ঠস্বর অনুভবের, 'তাছাড়া কথাটা তো আমি কোনোদিনও তোমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার কোনো চেষ্টা করিনি!'

'তুমি একটা ইতর, একটা পশু!'

ক্রোধ আর বিস্ময়ে অনুভবের আহত পৌরুষ অস্থির হয়ে ওঠে। কিন্তু মুখ ফিরিয়ে আরতির দিকে তাকাতেই তার বুকের ভেতরটা স্তব্ধ হয়ে যায়। আরতির টানা টানা চোখ দুটো শিশিরভেজা নীল অপরাজিতার মতো অবসন্ন। ফুলে ফুলে উঠছে ওর তীক্ষ্ণ নাকের পুষ্পিত দুটি পাতা। গাল দুটি আরক্তিম। আবেগপীড়িত বুক দুটির দ্রুত ওঠানামা দূর থেকেই বোঝা যায় স্পষ্ট।

'তুমি কিন্তু পাগলামো করছো, রতি।' এক পা এক পা করে ওব কাছে এগিয়ে যায় অনুভব।

'একে তুমি পাগলামো বলো? ছি ছি, নিজের স্ত্রী থাকতে আবার অন্য একজন ... একটা পরস্ত্রী ... তোমার লজ্জা করে না?'

'একটু খোলা মন নিয়ে সব কিছু বোঝার চেষ্টা করো, রতি।' দু হাতে ওকে তুলে, নিজের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় অনুভব। 'বিয়ে করা মানে ভালোবাসার দাসখত লিখে দেওয়া নয়। ভালো আমি তোমাকেও বাসি, ওকেও বাসি। কিন্তু দুটো ভালোবাসার চরিত্র আলাদা। একটার সঙ্গে অন্যটার যেমন কোনো মিল নেই, তেমনি কোনো বিরোধও নেই। একটুও না। বুঝেছো?'

সেই মুহূর্তে একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলো আরতি। আচমকা ও অনুভবের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, প্রাণপণে তাকে দু হাতে আঁকড়ে ধরলো। তারপর কান্না-কাঁপা গলায় বারবার একটানা শুধু বলতে লাগলো, 'পারবো না, আমি পারবো না, কোনোমতেই পারবো না। কিছুতেই আমি অন্য কারুর সঙ্গে তোমাকে ভাগ করে নিতে পারবো না। কিছুতেই না!'

বেচারী! ভাগাভাগির যে কোনো প্রশ্নই ওঠে না, তা বোধহয় ওর পক্ষে কদাপিও বোঝা সম্ভব নয়। তাই, অনুভব জানে, অহেতুক জটিলতার সৃষ্টি না করে এখন তাকে স্নেহশীল পিতার মতো ওকে কিছু সান্ত্বনা দিতে হবে, প্রেমিক স্বামীর মতো ওকে আরও কাছে টেনে নিয়ে আজীবন ভালোবাসা ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে এবং সেজন্যে এই মুহূর্তে যে কোমল অনুভূতিটার কাছে তাকে হাত পেতে দাঁড়াতে হবে—তার নাম ভালোবাসা নয়, তার নাম করুণা।

পর পর দু বার শাড়ি বদলালো আরতি। কিন্তু তৃতীয় বারও আরশির সামনে দাঁড়িয়ে ওর মনে হলো, এটাও ঠিক হয়নি। একটু বেশি ঝলমল করছে শাড়িটা। অনুভব হলে বলতো, টু্য লাউড। তাহলে কি এটাও বদলাতে হবে? ভাবতেই

ক্লান্তি আসে। অথচ তাই বলে অনির্দিষ্ট কাল চুপচাপ গালে হাত দিয়ে বসে থাকলেও চলবে না। ঘড়ির কাঁটা সময়কে বিসর্জন দিতে তরতর করে এগিয়ে চলেছে ভ্রূক্ষেপহীন অনিবার্যতায়। তাহলে কি আজকের দিনটা থাকবে? একটা দিনে কি আর এসে যাবে এমন? তাছাড়া আজ রোদটা বড্ড বেশি চড়েছে। এই প্রচণ্ড রোদে বাইরে গেলে মাথা ধরবেই। আর ঘাম যা হবে, তা ভাবতেও লজ্জা লাগে। কিন্তু—

আবার সেই 'কিন্তু'। মাঝেমাঝে কিন্তুগুলো সত্যিই বড়ো সমস্যার সৃষ্টি করে। অনুভব একদিন বলেছিলো, 'পৃথিবীর সবকটা ভাষা থেকে 'কিন্তু' আর তার প্রতিশব্দগুলোকে মুছে দিতে পারলে মানুষের জীবন থেকেও অনেক টানাপোড়েন কমে যেতো, জীবন অনেক বেশি সহজ আর স্বাভাবিক হয়ে উঠতো।' আরতি সেদিন অনেক ভেবেও অনুভবের এ কথার কোনো অর্থ খুঁজে পায়নি। আজও পায় না। তবু আচমকা এই মুহূর্তে কথাগুলো মনে পড়লো ওর।

নাঃ, দেরি যা হবার তা ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। কাল বা পরশু রোদ যে আরও বেশি চড়া হবে না, তাই বা কে বলতে পারে। এখন যাইযাচ্ছি করে অযথা আরও দেরি করলে, বেলা দেখতে দেখতে পড়ে আসবে। তারপর অফিস ছুটির মুখোমুখি সময়ে বাড়ি ফিরতে হলে ট্যাক্সি পাওয়া দুষ্কর হবে, দুর্গতির আর সীমা থাকবে না। আজকাল বাস বা মিনিবাসে ওঠার কথা তো কল্পনাই করতে পারে না আরতি।

অথচ চিরটা কাল ও ট্রামে-বাসেই যাতায়াত করেছে। কালেভদ্রে কখনও সখনও মিনিবাসে। ট্যাক্সির কথা তখন মনেও হয়নি। বড়োজোর অলস দিবাস্বপ্নের মতো মাঝে মধ্যে ভেবেছে, বিয়ের পরে ও বরের সঙ্গে প্রতি সপ্তাহে একদিন ট্যাক্সি চেপে সিনেমা দেখতে যাবে। ফেরার পথে কোনো রেস্টুর্যান্টের পর্দা ফেলা কেবিনে বসে মোগলাই পরোটা আর কষা মাংস খেয়ে, আবার ট্যাক্সি চেপে বাড়ি। সেদিন রাতে আর রান্নাবান্নার পাট থাকবে না। কি মজা!

সত্যি, সময় আর অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে কতো বদলে যায় মানুষ! একদিন যার সম্বল ছিলো হাতে গোনা কয়েকটা মাত্র ছাপার শাড়ি, বিয়েবাড়ি যেতে হলে মায়ের পুরনো ঢাকাই কিংবা মুর্শিদাবাদী সিল্ক, আজ তাকে আলমারি খুলে শাড়ি বাছতে গিয়ে হিমশিম খেতে হয়। কিন্তু মহার্ঘ ওই সমস্ত শাড়ি হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখতেও ইচ্ছে করে না আরতির। অনাদরে অবহেলায় নষ্ট হয়ে যায় অব্যবহৃত বিদেশী লিপস্টিক, পারফিউম, মাস্কারা এবং আরও কতো দুর্লভ প্রসাধনি। ওগুলোর দিকে তাকালেই আরতির ভেতরটা কুঁকড়ে ওঠে। নিজের ওপরে ঘৃণা আসে। কারণ ওর দৃঢ় বিশ্বাস, মেয়েদের সাজসজ্জা বা প্রসাধনের আসল উদ্দেশ্য পুরুষের যৌনতাবোধকে উত্তেজিত করে তোলা। কিন্তু অনুভব তা মানতে পারে না। তার ধারণা অন্য রকম। সে মনে করে, প্রসাধিতা রমণীর রমণীয় উপস্থিতি পুরুষের মনকে স্নিগ্ধ সৌন্দর্যবোধে ভরিয়ে তোলে, জীবনের প্রতি আগ্রহ জাগায়, প্রেরণা দেয়। তাই এসব দিকে খরচের ব্যাপারে তার কোনো কার্পণ্য নেই। কার্পণ্য নেই কোনো দিকেই। কথাবার্তা বা আচার আচরণেও না। আর সেটাই হয়েছে আরতির সব চাইতে বড়ো বিপদ। যুক্তি দিয়ে বিচার করতে গেলে ও নিজেও বুঝতে পারে,

মানুষটার সম্পর্কে ওর কোনো অভিযোগই বাস্তবতার দিক দিয়ে সুস্থির নয়। তবু কিসের যেন একটা অভাববোধ ওকে অহরহ বিদ্ধ করে, দগ্ধ করে। ওর মনে হয়, অনুভবের সবটুকু ও পাচ্ছে না, কিছুতেই পাচ্ছে না। কিংবা অনুভব যতোটা দিতে এগিয়ে আসছে, ও ততোটা নিতে পারছে না—কি যেন বাকি থেকে যাচ্ছে কোথায়। তাই আরতি নিজের অক্ষমতার সমস্ত দায় অনুভবের ওপরে চাপিয়ে দিয়ে সর্বক্ষণ এক বিষাদী অস্বস্তিকে তীব্র নেশার মতো প্রাণপণে আঁকড়ে রাখতে চায়।

শেষ পর্যন্ত একটা প্রায় আটপৌরে তাঁতের শাড়িই বেছে নেয় আরতি। চুল আঁচড়ে আধখোলা একটা বিনুনী। সিঁথি আর কপালে সিঁদুর। মুখে হালকা পাউডারের প্রলেপ। ব্যাস, এই যথেষ্ট। অনুভব অবিশ্যি এই বেশে ওকে বাইরে যেতে দিতে চাইতো না। রাগারাগি করতো। কিংবা গুম হয়ে থাকতো অনেকক্ষণ। যাকগে, এখন তো আর সে ওকে দেখতে আসছে না! আর দেখলেই বা কি? সর্বক্ষণ সেজেগুজে পটের বিবি হয়ে তার মন ভোলাতে হবে না কি? বয়ে গেছে। আরতি তার রক্ষিতা নয়, তার স্ত্রী। তার সঙ্গে ওর জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধন। ওকে সে ভালোবাসতে বাধ্য।

সত্যিই কি বাধ্য?

ট্যাক্সিতে বসে ফের কথাটা মনে হতেই, দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ওঠে আরতি। সত্যিই কি এমন কোনো বাধ্যবাধকতা আছে? নিজের অবিবাহিত জীবনে চার চারটি ভাইবোনকে জন্মাতে দেখেছে আরতি। কিন্তু জ্ঞান হওয়ার পর থেকে প্রকাশ্যে মা-বাবাকে ও কোনোদিনও ঘনিষ্ঠ হয়ে কোনো কথাবার্তা বলতে দেখেনি। কথাবার্তা মানেই কথা কাটাকাটি। খুনসুটি নয়, খিটিমিটি। মাঝে মাঝে বড়ো বিরক্ত হতো আরতি। কিন্তু তেমন বিরক্তি প্রকাশ করার মতো সাহস ওর কোনোদিনই ছিলো না। কখনও কখনও মা চড়া গলায় বলতো, 'তুমি তো এ সংসারে বিনে মাইনের ঝি-রাঁধুনি। আমার জীবনে আর কি আছে? দয়া করে খাওয়া পরা আর শোবার জায়গাটা দিয়েছো।' বাবাও চিৎকার করে জবাব দিতো, 'সবই যখন বোঝো, তখন গলাটা একটু খাটো করে কথা বলো। বুঝেছো?' তখন খারাপ লাগতো, বড়ো খারাপ লাগতো আরতির। আরতি ভাবতো, যদিও ওঁরা বহু দিন একই বিছানায় শুয়েছেন, কিন্তু ওঁদের মধ্যে আদৌ কি কোনো ভালোবাসার সম্পর্ক ছিলো কোনোদিন? নাকি প্রেমহীন দাম্পত্যজীবনের ফল হিসেবেই জন্ম হয়েছে ওদের কজনার? ভোজন রেচনের মতো মৈথুনও কি তাহলে শুধু একটা যান্ত্রিক অভ্যেস পালনের অনুষ্ঠান মাত্র? এবং সাগ্রহে ওই নোংরা অপবিত্র অশ্লীল অনুষ্ঠানটাকেই ওঁরা নিষ্ঠাভরে পালন করে এসেছেন আজীবন? ভাবতে ভাবতে সারা শরীর গুলিয়ে উঠতো আরতির। অর্থাৎ কি না ভালোবাসা থাক বা না থাক—কোনো অবস্থাতেই ওই বিশ্রী ব্যাপারটার হাত থেকে রেহাই নেই, নিষ্কৃতি নেই। কিন্তু কে জানে, হয়তো ওই ব্যাপারটাই একটা মানুষকে অন্য একটা মানুষের সঙ্গে বেঁধে রাখে অথবা বেঁধে রাখতে সাহায্য করে!

কিন্তু অনুভব তো আজকাল আর ওই ব্যাপারটাতেও কোনো রকম আগ্রহ দেখায় না। এমন কি ঘুমোবার আগে ওকে চুমুও খায় না একবার। ভালোবাসা থাক ব' না

থাক, বাঁধনটাও কি তাহলে ঢিলে হতে চলেছে? যদি তাই হয়, বাঁধনটা যদি শেষ অব্দি সত্যিই না থাকে, তাহলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে আরতি? এ ব্যাপারে ওর দায়িত্বই বা কতোটুকু? বাঁধন বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ওর কি তাহলে উচিত অনুভবকে আকর্ষণ করা? তাহলে কি দুজনের মধ্যেকার এই দম বন্ধ করা পরিস্থিতিটা হালকা হয়ে যাবে আবার? হয়তো যাবে। কিন্তু আরতি তাতে রাজি নয়, এতোটুকুও রাজি নয়।

কিন্তু এখানে তো হারজিতের কোনো প্রশ্ন নেই, আরতি! তবে?

এ প্রশ্নের জবাব আরতির কাছে খুব একটা স্পষ্ট না হলেও ও বুঝতে পারে অহেতুক এক লজ্জা, অর্থহীন এক সঙ্কোচ কিংবা মূল্যহীন এক দুরন্ত অহঙ্কার ওর পথ জুড়ে দাঁড়ায়—ওকে এগুতে দেয় না। ওর মনে হয়, আমি বাজারের মেয়েমানুষ নই। আমি অনুভবের স্ত্রী। স্ত্রীর অধিকারেই আমি ওর ভালোবাসা পাবার অধিকারী। সেটা পাবার জন্যে আমি নিজের শরীরকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে পারবো না। কেন করবো? আমার কি আত্মসম্মানবোধ নেই?

ট্যাক্সিটা রেসকোর্সের গা ঘেঁষে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। রেড রোড। ভারি সুন্দর রাস্তাটা। ময়দানের ভেতর দিয়ে এভাবে গাড়ি করে যেতে ভারি ভালো লাগে আরতির। তবে অনুভব একেবারে ঊর্ধ্বশ্বাসে গাড়ি চালায়। অমন উদ্দামগতি সহ্য করতে পারে না আরতি। ওর ভালো লাগে না। ভয় করে, বড়ো ভয় করে। অনুভবকে তা বলতে গেলে আরও বিপদ। গাড়ির গতি চোখের পলকে তখন আরও বেড়ে ওঠে আর অমনি ভয়ে ভয়ে চোখ বোজে আরতি। অনুভব তখন গাড়ির গতি একেবারে কমিয়ে দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে কেমন করে যেন হাসে। অস্ফুটে, মৃদুভাষে বলে, 'একটু পাগলের মতো বাঁচতে ইচ্ছে করে না তোমার? একবার একটু 'বিপজ্জনকভাবে', একটু ঝুঁকি নিয়ে বাঁচার চেষ্টা করে দ্যাখো না—মন্দ লাগবে না। একটু অন্য রকম। বেশ থ্রিলিং!' তারপর হাত বাড়িয়ে পাগলের মতোই ওকে বুকের একেবারে কাছে টেনে নিয়ে আদর করে, চুমু খায়। ইচ্ছেমতো। যেন কোনো দিশা নেই। আরতি তখন ছটফটিয়ে ওঠে, 'রাস্তার মাঝখানে ... কতো গাড়ি, লোকজন—ছি ছি, সবাই কি ভাবে বলো তো!'

'কি ভাবে?'

'ভাবে আমি তোমার বউ নই, অন্য কেউ।'

তাই শুনে হো হো করে হেসে ওঠে অনুভব। তারপর ওর নাকটা একটু মুচড়ে দিয়ে বলে, 'তুমি কি আমার পিসীমা, না মাস্টারনী? শোনো রতি, এসব আজকাল ট্যাক্সিতেও চলে। এসব নিয়ে কেউ কিছু ভাবে না, কারুর অতো সময় নেই। আর কেউ ভাবলেও, আমাদের তাতে কিছু এসে যায় না। তাই না?'

আরতি তা বোঝে না, বুঝতে চায় না। ওর বিশ্রী লাগে।

আগে অনুভব প্রায়ই ওকে নিউ মার্কেট, এ.সি. মার্কেট বা তাজের খাজানায় নিয়ে যেতো। তাছাড়া সিনেমা, রেস্তোরাঁ। কিংবা টলি ক্লাব, ক্যালকাটা ক্লাব বা গ্রাণ্ডের পিঙ্ক প্যানথারে। কিন্তু শপিং-এ আরতির কোনো উৎসাহ নেই। সিনেমা ওর ভালো লাগে না। ক্লাবের পার্টি বা ডিসকোথেকের আসর ওর কাছে অসহ্য। ও মনে করে,

একগাদা টাকা খরচ করে ঘন ঘন নামী দামী রেস্তোরাঁয় গিয়ে খাওয়াদাওয়া করার কোনো মানেই হয় না। তাই আজকাল অনুভবের সঙ্গে কোথাও আর বড়ো একটা যাওয়াও হয় না। দেখাই বা হয় কতোক্ষণ? সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর ঘন্টা দেড়েক আর রাতে ঘুমোবার আগে বড়ো জোর ঘন্টা আড়াই। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মোটে চার ঘন্টা। তার মধ্যে রাতের আধ ঘন্টাটাক সময় তো শিঁটিয়ে কাঠ হয়ে থাকা। এই বুঝি শুরু হলো!

একবার ওর নিশ্চল আর নিরুত্তাপ শরীর থেকে আচমকা নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে অনুভব জিগেস করেছিলো, 'তোমার ভালো লাগছে না?'

'না,' এক কথায় জবাব দিয়েছিলো আরতি।

'তাহলে থাক।'

'কেন?

'কারুর আপত্তি থাকলে, এটা অন্যায়।'

'আমার ইচ্ছে না করলে কি করবো?' বিরক্ত হয়েছিলো আরতি।

'হয় অনিচ্ছেটাকে তাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করবে, আন্তরিক চেষ্টা। আর নয়তো স্পষ্ট ভাষায় 'না' বলবে। আমি তোমাকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে চাই না। কিছুতেই না।'

অনুভবের অনেক কথার মতো এ কথারও কোনো অর্থ বুঝতে পারেনি আরতি।

আর একদিন। মিলনের পরে যথারীতি প্রায় অর্ধেক স্নান করে বাথরুম থেকে ঘরে এসে আরতি দেখেছিলো, অনুভব তখনও খোলা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে। ওকে দেখে সে জিগেস করলো, 'এ ব্যাপারের পরে স্নানটা কি খুবই জরুরি?'

'করবো না?' অবাক হয়েছিলো আরতি।

'করতেই হবে, এমন কি কথা আছে?'

'তুমি না করতে পারো, আমি না করে পারি না। বিশ্রী লাগে।'

'আশ্চর্য!' শব্দটা যেন এক টুকরো তীক্ষ্ণ বরফের মতো খসে পড়েছিলো অনুভবের ঠোঁট থেকে। অথচ এটা কি এমন আশ্চর্যজনক ঘটনা, তা আজও স্পষ্ট নয় আরতির কাছে।

ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস আর ব্রেবর্ন রোডের মোড়ে ট্যাক্সি ছেড়ে দিলো আরতি। একদিন ও কার মুখে যেন শুনেছিলো, এর খুব কাছাকাছিই রূপসার অফিস, ব্রেবর্ন রোড ধরে উড়াল পুলের দিকে একটু এগিয়ে। আরতি ভাবছিলো কাউকে জিগেস করে নেবে কি না। কিন্তু তার দরকার হলো না। দু পা এগুতেই সাইন বোর্ডটা ওর চোখে পড়লো। এটাই তো?

কাচের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে মুহূর্তের মধ্যে সঙ্কুচিত হয়ে উঠলো আরতি। প্রথমে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। তারপর ডানদিকে রিসেপশন, বাঁ দিকে ভিজিটার্স লাউঞ্জ। তারপর ফের এক জোড়া কাচের দরজা। এধার থেকে স্পষ্ট দেখা যায়, দরজার ওধারেও বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা এবং তারপরেই দু ধারে, যতোদূর চোখ যায়, একটানা সুদীর্ঘ ও সুদৃশ্য কাউন্টার। তার ওধারে ঝকঝকে চেহারার কিছু

পুরুষ ও মহিলা কর্মী। অনেকগুলো টি. ভি.র মতো যন্ত্র। ওগুলোই বোধহয় কমপিউটার। সবকিছুই যেন নতুন, চতুর্দিক চমৎকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কোথাও এতোটুকু ধুলো ময়লা নেই। ভেতরে লোক আছে, কিন্তু কলরব নেই। এয়ার কণ্ডিশনারের ঠাণ্ডা আবেশ রিনরিনিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে হালকা আদুরে পালকের মতো। চ্যানেল মিউজিক সিস্টেমে পিয়ানোর মিঠে সুর। একি অফিস, না অন্য কিছু? আরতির মন দোলাচলে অস্থির হয়।

তবু পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে রিসেপশনের অ্যাংলো মেয়েটিকে রূপসার কথা জিগেস করে আরতি। মেয়েটির ইংরেজি উচ্চারণ ও সঠিক বুঝতে না পারলেও, ওর ইঙ্গিত মতো লাউঞ্জে গিয়ে বসে। এবং ছোট্ট রুমাল দিয়ে মুখ ও গলার কাছটা একটু মুছে নিয়ে ভাবতে থাকে, রূপসার কাছে কথাটা ও তুলবে কি করে। কিন্তু ভাবনার বিস্তৃতি ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করার অনেক আগে, সম্ভবত মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই, একরাশ বিস্ময় নিয়ে রূপসা ওর সামনে এসে দাঁড়ায়।

'কি ব্যাপার, আরতি তুমি?'

'তোমার সঙ্গে আমার একটা ভীষণ জরুরি কথা আছে, রূপাদি।' আচমকা আরতি অনুভব করলো, প্রবল তৃষ্ণায় ওর গলাটা একেবারে শুকিয়ে গেছে। 'কিন্তু তার আগে একটু জল খাওয়াতে পারো?'

'জল? না কোনো কোল্ড ড্রিংকস?'

'না, জল না হলে এ তেষ্টা মিটবে না। বাইরে যা গরম আজ! ভেতরে বসে কিচ্ছু বোঝা যায় না।'

'তাহলে তুমি বসে একটু জিরিয়ে নাও। আমি এক্ষুনি আসছি।'

যদিও অনুভবের বন্ধু, তবু আরতি রূপসাকে সরাসরি নাম ধরে ডাকে না। রূপাদি বলে। বয়সে কেউ সামান্য মাত্রায় বড়ো হলেও, আরতি তাকে নাম ধরে ডাকতে পারে না। মুখে কেমন যেন আটকে যায়।

একটু বাদেই ফিরে এলো রূপসা। ওর পেছন পেছন জল নিয়ে ওয়াটার বয়। ঢক ঢক করে এক নিঃশ্বাসে গ্লাসটা খালি করে, ফের আলতো রুমালে ঠোঁট মুছলো আরতি। তারপর মুখ তুলে তাকালো রূপসার দিকে এবং তাকিয়েই মুগ্ধ হলো। ও কি নিজে জানে, ওকে কি দারুণ সুন্দর লাগছে এখন? রূপসার রূপ যেন ফেটে পড়ছে। পরনে হালকা চাঁপা রঙের শাড়ি ও সবুজ ব্লাউজ, কানে ও গলায় সবুজ পাথরের অলঙ্কার, বাঁ হাতে সোনার বালা আর ডান হাতে সোনার কেসে বাঁধানো ওভ্যাল শেপের ছোট্ট অটোম্যাটিক কোয়ার্জ। চুল ও কোনোদিনই বাঁধে না, আজও খোলা। কাঁধ ছাপানো স্টেপস করা প্রায় বাদামী রঙের চুলগুলো যেন খুশির রাশি রাশি হালকা বাতাস। মুখে প্রসাধন বলতে তেমন কিছু নেই। শুধু ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক আর স্বপ্নিল চোখ-দুটিতে কাজলের সরু রেখায় অস্ফুট নীলের আবেশ। সমস্ত শরীর পদ্মের মতো পূর্ণ বিকশিত অথচ রজনীগন্ধার মতো ঋজু ও সতেজ। আরতি ওই আশ্চর্য রূপে তন্ময় হতে গিয়েও নিজের বুকের মধ্যে একটা শিরশিরে অনুভূতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলো।

'কি ব্যাপার বলো তো?' নিষ্পাপ দুটি চোখ মেলে ফের প্রশ্ন করলো রূপসা,

'ফোন করলে না কেন?'

'ফোনে হতো না। তাছাড়া আমি তোমার নম্বর জানি না।'

'কি হয়েছে?'

'আসলে আমি খুব বিপদে পড়েছি, রূপাদি,' আপ্রাণ প্রচেষ্টায় নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও কথাগুলো উগরে দিলো আরতি।

'বিপদে পড়েছো!' রূপসার বিস্ময় সীমানার মাত্রা ছাড়ালো, 'কি বলছো তুমি? আমি তো তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না!'

বুঝতে ঠিকই পেরেছে, কিন্তু সব জেনেবুঝেও না বোঝার অভিনয় করছে! ন্যাকামো। রাগে সর্বাঙ্গ রি রি করে ওঠে আরতির। কিন্তু এখন তা প্রকাশ করে ফেললে কোনো কাজ হবে না। সবই মাটি হয়ে যাবে।

'বলছি,' খানিকক্ষণ নিশ্চুপ থেকে নিজেকে গুছিয়ে নেয় আরতি। তারপর রূপসার দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় আস্তে আস্তে বলে, 'কথাটা ভারি লজ্জার, রূপাদি। আরও লজ্জা, সে কথা কাউকে বলা। বিশেষ করে তোমাকে। অথচ এ ছাড়া আমি আর কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছি না।'

রূপসা নির্বাক হয়ে আরতিকে কথা বলার সুযোগ দেয় এবং সেই সঙ্গে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে রাখে ওর অভিব্যক্তির দিকে।

'আজকাল ও আর আমাকে ভালোবাসে না, রূপাদি। আমার বলতে খুব খারাপ লাগছে, কিন্তু আমি জানি, এজন্যে একমাত্র তুমিই দায়ী।'

'তাই বুঝি?' এতোক্ষণে রূপসার ঠোঁটে অস্ফুট হাসির আভাস ফুটে ওঠে, 'কি করে বুঝলে?'

'বোঝা যায়।' আরতি আঁচলের খুঁট আঙুলে জড়াতে জড়াতে বলে, 'ও তোমাকে ভালোবাসে, ভীষণ ভালোবাসে, আমি জানি।'

'তাতে তোমাকে ওর ভালোবাসাটা আটকাচ্ছে কোথায়?' রূপসার কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপের সুর।

'আটকায়। তুমি আমার চাইতে অনের বেশি সুন্দরী শিক্ষিতা আধুনিকা। তুমি ওর সঙ্গে বেড়াও, সিনেমা দেখতে যাও, গল্প করো। এসব করলে আমি তো এমনিতেই তোমার কাছে লড়াইতে হেরে যাবো! কিন্তু এটা কি তুমি উচিত কাজ করছো, রূপাদি? তুমি কি অন্যায় করছো না?'

'তুমি কি আমাকে উচিত-অনুচিত আর ন্যায়-অন্যায় বোঝাতে এসেছো, আরতি? তাহলে তুমি কিন্তু ভীষণ ভুল করেছো। ওগুলোর সম্পর্কে আমার মনে একটা খুব স্পষ্ট ধারণা আছে, যেটা বদলে দেওয়া বোধহয় কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। তুমি অনুভবের স্ত্রী না হলে, আমি এক্ষুনি তোমাকে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে বলতাম।' শান্ত, মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠস্বরে রূপসা বলতে থাকে, 'শোনো আরতি, এটা লড়াইয়ের জায়গা নয়। সুন্দরী হওয়ার ব্যাপারটা কারুর নিজের হাতে থাকে না। তাছাড়া আমার মনে হয়, একমাত্র বোকারাই ওটাকে সব চাইতে বেশি গুরুত্ব দেয়। অনুভব কিন্তু বোকা নয়। আর একটা কথা, যে কোনো মানুষই নিজের ইচ্ছেয় এবং চেষ্টায় শিক্ষিত ও আধুনিকমনস্ক হয়ে উঠতে পারে। সেখানেই মানুষের আসল সৌন্দর্য।

হ্যাঁ, অনুভব আমাকে ভালোবাসে এবং আমিও তাকে ভালোবাসি। এটা আজকের কথা নয়—অনেক, অনেক দিন আগেকার কথা। তখন তোমার কোনো অস্তিত্বই ছিলো না আমাদের জীবনে। কিন্তু তার সঙ্গে তোমাকে ওর ভালোবাসার বা না বাসার কোনো সম্পর্ক নেই, কোনো বিরোধও নেই—এটা তুমি ধরে নিতে পারো। তোমার কি আর কিছু বলার আছে? আর কোনো প্রশ্ন কিংবা কোনো অভিযোগ?'

আরতি মুখ নিচু করে বসে থাকে। লজ্জা ক্ষোভ আর অপমানে ওর চোখ ফেটে জল আসতে চায়। ও ভেবেছিলো, প্রথম থেকেই আক্রমণ করে রূপসাকে ও কোণঠাসা করে ফেলবে। কিন্তু রূপসা যে এভাবে বিষয়টাকে আলোকিত করে তুলবে তা ও কল্পনাও করতে পারেনি। নিজেকে এখন বড়ো অসহায়, বড়ো দুর্বল বলে মনে হয় আরতির। ও ভেবে পায় না এখন ও কি করবে, কোথায় যাবে, কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে।

'একটা কথা একটু মন দিয়ে ভেবে দেখো আরতি,' রূপসা ফের বলতে শুরু করে, 'তুমি কি কখনও অনুভবের সঙ্গী হতে চেষ্টা করেছো? ওকে বুঝতে চেয়েছো?'

আরতি কোনো জবাব দেয় না।

'যদি তা না করে থাকো, তাহলে ঠিক করোনি। অন্যায় করেছো। তোমার একটা বিরাট কর্তব্য বাকি থেকে গেছে। তুমি তার স্ত্রী হয়েছো বলেই সে তোমাকে ভালোবাসবে বা সে তোমার স্বামী হয়েছে বলেই তুমি তাকে ভালোবাসবে—এটা কিন্তু কোনো কাজের কথা নয়। বিয়ের আগে তোমাদের মধ্যে পরিচয় ছিলো না, তাই আগে থেকে পরস্পর পরস্পরকে চিনে নিতে পারোনি, ভালোবাসার সম্পর্কও গড়ে ওঠেনি। এখন সামাজিক সম্পর্ক হয়েছে, তাই পাশাপাশি আছো, পরস্পরকে চেনার সুযোগও এখন অনেক। এবারে তোমাদের ভালোবাসা আসার কথা রূপের মোহ থেকে নয়, মনন থেকে—পারস্পরিক বোঝাপড়া থেকে। তবে বোঝাপড়া তৈরি করতে গেলে দুজনকেই কিছু কিছু জিনিস ছাড়তে হয়, ভালো না লাগলেও অনেক কিছু মেনে আর মানিয়ে নিতে হয়।' এক মুহূর্ত নিঃশব্দে আরতির দিকে তাকিয়ে থাকে রূপসা। তারপর নরম গলায় বলে, 'অনুভবকে আমি তোমার চাইতে অনেক বেশি চিনি, আরতি। আমি জানি সে তোমাকে ভালোবাসে, আরও ভালোবাসতে চায়। এবারে তুমি নিজেকে প্রশ্ন করে দ্যাখো তো, তুমিই তাকে ফিরিয়ে দিচ্ছো কিনা? আসলে ভালোবাসা পাওয়া বড়ো ভাগ্যের কথা। ভালোবাসা কিভাবে অর্জন করতে হয়, সেটা শিক্ষার ব্যাপার। কাজটা কঠিন, তবে তার চাইতেও কঠিন ভালোবাসাকে টিকিয়ে রাখা। বুঝেছো?'

শেষের দিকে রূপসার কণ্ঠস্বর আবছা হয়ে আসে। ভীষণ অবসন্ন আর অন্যমনস্ক বলে মনে হয় ওকে। আরতি অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকায়। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না, এই সুন্দরী মহিলাই ওর সর্বনাশ করতে চাইছে। রূপসা কি তবে অভিনয় জানে?

'আর একটা কথা,' রূপসা ফের বলে, 'আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারো। অন্তত আমার দিক থেকে তোমার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই।'

'তোমাকে একটা কথা জিগেস করবো?' প্রশ্ন করে আরতি।

'কি?'

'রাগ করবে না তো?'

'না,' রূপসার ঠোঁটে মৃদু হাসির আভাস ফুটে ওঠে।

'তোমরা সেই কতোদিন থেকে দুজন দুজনকে চেনো, ভালোবাসো—তাহলে বিয়ে করলে না কেন?'

'পাগল! তাহলে তো একগাদা বিয়ে করতে হয়,' রূপসা এবারে সত্যি সত্যি হেসে ফেলে।

'মানে?'

'কোনো মানুষকে ভালোবাসলেই তাকে বিয়ে করতে হবে? তা কি হয় কখনও? নাকি বিয়ে না করলে ভালোবাসার কোনো অর্থই থাকে না?'

'তাহলে?'

'শোনো আরতি, প্রতিটা মানুষই ঘরের কাঙাল।' আরতির কণ্ঠস্বর আবার পাইনের বনে দোলা জাগানো হিমেল বাতাসের মতো উদাসী অন্যমনস্কতায় ভরে ওঠে। 'অথচ মানুষমাত্রেই বৈচিত্র্য ভালোবাসে। তাই একটানা ঘরে থাকতে থাকতে এমন একটা সময় আসে, যখন সে খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটু সতেজ বাতাসে নিঃশ্বাস নেবার জন্যে আকুল হয়ে ওঠে। তাই বলে ঘরের মর্যাদা আকর্ষণ কিংবা প্রয়োজন—কোনোটাই কিন্তু তখন ফুরিয়ে যায় না। কারণ বারান্দায় কেউ সর্বক্ষণ থাকে না, থাকতে পারে না—বারান্দায় দাঁড়ানো মানুষটাকে শেষ অব্দি আবার ঘরেই ফিরে যেতে হয়। মানুষের জীবনে প্রিয় বন্ধুবান্ধবরা আসলে ওই তাজা নিঃশ্বাস নেবার বারান্দা।'

৪

সকাল থেকেই সারা ব্যাঙ্কে একটা চাপা উত্তেজনাময় পরিবেশ।

আসলে দিন তিনেক আগে ভিন-প্রদেশীয় এক রগচটা অফিসারের সঙ্গে একজন কর্মচারীর কিছু অনাবশ্যক কথা কাটাকাটি হয়েছিলো। অফিসার ভদ্রলোক তখন নাকি 'দেখে নেবো' গোছের কিছু বলে তাকে শাসিয়েও ছিলেন। কিন্তু ব্যাপারটা কেউই তেমন করে গায়ে মাখেনি। কারণ এগুলো নেহাতই পাতি ব্যাপার, একসঙ্গে কাজ করতে গেলে এরকম কথা কাটাকাটির ঘটনা আকছার হয়েই থাকে এবং যথা সময়ে যথা নিয়মে তা মিটেও যায়। কিন্তু গতকাল ছুটির ঠিক আগে সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীটিকে গ্রস মিসকণ্ডাক্টের অজুহাতে আচমকা শো কজ নোটিস ইস্যু করা হয়েছে। ব্যাপারটা এতোই অভাবিত এবং অপ্রত্যাশিত যে ব্যাঙ্কের

ইউনিয়ন এখন এতে রীতিমতো চিন্তিত হয়ে উঠেছে। কারণ এটাকে একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখলে ভুল করা হবে। পরবর্তী বাইপার্টাইট সেটলমেন্টের দিন ক্রমশ এগিয়ে আসছে, ভলান্টারি রিটায়ারমেন্ট স্কিমের রূপরেখা শুধু ঘোষণা করা বাকি—এমতাবস্থায় ম্যানেজমেন্টের দিক থেকে যেচে এভাবে ব্যাঙ্কের শান্ত পরিবেশকে বিঘ্নিত করার মূল কারণ নিশ্চয়ই অন্য কিছু, বলে ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের ধারণা।

ওদিকে আজই ডালহৌসি এলাকার সমস্ত ব্যাঙ্ককর্মীদের বেলা দুটোর সময় নেতাজি সুভাষ রোডের ট্রাফিক আইল্যাণ্ডের কাছে এক সভায় জমায়েত হবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখানে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ইউনিয়নের প্রবীণ নেতারা গ্যাট চুক্তি এবং ব্যাঙ্ক বেসরকারীকরণের সরকারী প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে নিজেদের বক্তব্য রাখবেন।

সব মিলিয়ে পরিস্থিতি রীতিমতো গরম। নানা ধরনের জল্পনা-কল্পনা। সেই সঙ্গে দৈনিক কাজকর্ম। মিছিলের প্রস্তুতি। এরই মধ্যে সময় গড়িয়ে চলে। সবাই যে জঙ্গি ভাবাপন্ন তা নয়, বরং অনেকেই মানিয়ে চলার পক্ষপাতি। কিন্তু উত্তেজনার আঁচ কারুরই বোধহয় মন্দ লাগে না।

এ ব্যাঙ্কের অ্যাংলো মেয়েরা কোনোদিনই মিছিল-টিছিলে যোগ দেয় না। ওরা স্পেশাল গ্রেডের স্টাফ, সবাই ইউনিয়নকে এড়িয়ে চলে। বাঙালী মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ কিছুক্ষণের জন্যে মিছিলে যায়। না গেলেও কেউ কিছু বলে না। রূপসাও যায় না। যেতে বাধ্য করা হলে ও হয়তো চাকরিটাই ছেড়ে দিতে বাধ্য হতো। ওভাবে রাস্তায় নেমে সকলের সঙ্গে শ্লোগানের তালে তালে পা ফেলতে ওর কোথায় যেন বাধে। অনেকেই বলবে, সেটা ওর অর্থহীন আত্মসম্মানবোধ। কিন্তু ওর মনে হয়, এসব মিছিলে ওকে মানায় না—ও এসবের উপযুক্ত নয়। মন থেকে যা আসে না, তা করতে ওর আপত্তি আছে।

কয়েকটা চিঠি জেরক্স করতে গিয়ে হঠাৎ মিশেলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো রূপসার। একটা স্টেটমেন্ট জেরক্স করছিলো মিশেল। ওকে দেখে আন্তরিক হাসলো, 'হাই!'

'হাই!' রূপসাও হাসলো।

'তোমার খোবর বালো?'

'কিসের খবর?' ওর বাংলা শুনে ফের হাসে রূপসা।

'ডেটিং?'

'তোমার ওই এক চিন্তা, সিঙ্গল ট্র্যাক!'

'আরে ইয়ার, এহি হ্যায় জমানা!' কাচের বিভাজক দেয়ালের ওধারে সংক্ষেপে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে গলার স্বর সামান্য নিচু করে মিশেল, 'শ্যাল আই টেল ইউ সামথিং?'

'কি?'

'দ্যাট বাস্টার্ড, আই মিন জর্জ, কাল কি বললো জানো?'

'কি বললো?'

'বললো, আমাকে বিয়ে করো।'

'সাউণ্ডস ফাইন। কনগ্রাটস!'

'ফাক ইওর কনগ্রাটস! ওকে কে বিয়ে করবে?'

'কেন?'

'ও আমাকে মেইনটেইন করতে পারবে? অ্যাণ্ড আই নো, ওর অন্য মোতলব আছে।'

'সে আবার কি?'

'ইয়েস। হি ওয়ান্টস মি টু আর্ন মানি, অ্যাণ্ড হি প্ল্যানস টু এনজয় ইট।' মিশেল চোখ মটকালো, 'ড্রিংকস অ্যাণ্ড আদার গার্লস।'

'বাট ইউ স্লেপ্ট উইথ হিম! এসব বুঝেও তুমি ওর সঙ্গে শুয়েছো?'

'হোয়াই নট? বায়োলজির সঙ্গে ইমোশনকে মিশিয়ে ফেলো না, ডিয়ার।'

'ও,' ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো রূপসা। 'তা তুমি ওকে কি বললে?'

'বললাম, গেট লস্ট!'

হাসতে হাসতে চলে যায় মিশেল। রূপসা ওর কথাগুলোকে নিয়ে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করে। বায়োলজি অ্যাণ্ড ইমোশনস। মানে সেক্স অ্যাণ্ড লাভ। যৌনতা এবং ভালোবাসা। দুটোর মধ্যে দূরত্ব কতোখানি? প্রেমহীন দেহবিলাসে মন কি কখনও সাড়া দেয়? মন সাড়া না দিলে দেহ কি নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে না? হয়তো থাকে না, হয়তো জৈবিক নিয়মেই স্টিমুলেশন হয়, দেহ তখন অজান্তেই সাড়া দিয়ে ফেলে। নিজের অজান্তে। আনকণ্ডিশনাল রেসপনস। হয়তো পেশাদারদের কথা আলাদা। তারা যৌনযন্ত্র বিশেষ। তারা আনন্দ হয়তো দেয়, কিন্তু পণ্ডিতরা বলেন মিলনের সময়ও তাদের দেহ আর মন—দুটোই ঘুমিয়ে থাকে। আবার ভালোবাসা না থাকলেও, কাউকে হয়তো ভালো লাগলো এবং তার ছোঁয়ায় দেহ আর মন দুই-ই হঠাৎ প্রস্তুতি নিয়ে জেগে উঠলো পাগলের মতো। সেটা কি তবে সাইকোলাজিক্যাল রেসপনস? মিশেলের ক্ষেত্রে কোনটা সত্যি, তা হয়তো মিশেল নিজেও জানে না।

বেলা দুটোর একটু আগে বেয়ারা তারকনাথ এসে জানালো, এক মহিলা রূপসার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। আজ আবার কে এলো, কে জানে?

'কোথায়?' জিগেস করলো রূপসা।

'লাউঞ্জেই আছেন।'

আরতি ফের এতো শীগগিরি আসবে না। তাহলে কে হতে পারে? ভাবতে ভাবতে চট করে হাত দুটো ধুয়ে, লাউঞ্জে গিয়ে সোনালিকে দেখে অবাক হয়ে গেলো রূপসা।

'সোনা, তুই!'

'এলাম,' সামান্য হাসলো সোনালি।

'এদিকে কোথায় এসেছিলি?'

'তোর কাছেই।'

'আমার কাছে!' রূপসা স্পষ্টতই বিস্মিত হলো, 'তাহলে বাড়িতে গেলেই পারতিস? এই রোদের মধ্যে এতোটা ঠেঙিয়ে এলি কেন?'

'তোর সঙ্গে আমার একটা বিশেষ কথা আছে।'

'তো?'

'তোর বাড়িতে তুই একা থাকিস না। আমার বাড়িতেও আমি একা নই। কিন্তু আমার কথাটা এক্সক্লুসিভলি তোর সঙ্গে।'

নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে এক মুহূর্ত একটু চিন্তা করে নিলো রূপসা। তারপর বললো, 'চল।'

'কোথায়?'

'চল, ক্যান্টিনে গিয়ে বসি।'

'সেখানে তো এখন হাট বসে গেছে।'

'আজ মোটামুটি ফাঁকাই থাকবে। মিছিল আছে।'

ক্যান্টিনে কোণের দিকে একটা টেবিলে মুখোমুখি হয়ে বসলো দুজনে। দুটো কফির অর্ডার দিয়ে, সোনালির দিকে তাকালো রূপসা, 'বল—'

'তুই কিছু খাবি না এখন?'

'না।'

'কেন?'

'ইচ্ছে করছে না। তুই বল।'

'খুব অবাক হয়ে গেছিস নিশ্চয়ই?'

'সোজাসুজি 'না' বললে মিথ্যে বলা হবে। তুই কি এবারে বলতে শুরু করবি? না কি আরও কিছু ভনিতা বাকি আছে?'

'বলবো বলেই তো এসেছি। কিন্তু বলতে পারছি কই? আসলে কোত্থেকে যে শুরু করবো আর তুই-ই বা সেটাকে কিভাবে নিবি ...'

'ডোন্ট বি সিলি, সোনা!' কথার মাঝখানেই সোনালিকে থামিয়ে দিলো রূপসা, 'তোর কি ধারণা, আমি তোকে ভুল বুঝবো?'

'না, তোর সম্পর্কে সেটুকু আস্থা আমার আছে।' এক চুমুক জল খেয়ে পূর্ণ দৃষ্টিতে রূপসার দিকে তাকালো সোনালি, 'কিন্তু কিছু বলার আগে, আমি তোকে একটা প্রশ্ন করতে চাই।'

'কি?'

'তুই কি মনে করিস, কোনো একজনের অক্ষমতায় সন্তান না হলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়া উচিত?'

'বহুদিন হলো আমরা মধ্যযুগ পেরিয়ে এসেছি, সোনা।' রূপসার কান গরম হয়ে উঠলো, 'তাছাড়া ওই কারণে ডিভোর্স হয় না।'

'তা হলে সে ক্ষেত্রে যে সক্ষম তার উচিত অন্য জনকে আরও নিবিড় করে আঁকড়ে ধরা, ভালোবাসা দিয়ে তার অক্ষমতার দুঃখকে ভুলিয়ে দেওয়া। তাই নয় কি?'

বেয়ারা কফি রেখে গেলো। নিজের কাপে চিনি মেশাতে মেশাতে সোনালির দিকে তাকালো রূপসা, 'সুদূর তোদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলো?'

'হ্যাঁ।'

সমস্ত শরীর টানটান হয়ে উঠলো রূপসার, 'কি বলেছে?'

'বলেছে ও তোকে সহ্য করতে পারছে না, কারণ ইউ আর ট্যু গুড, কারণ ওর সম্পর্কে তোর কোনো নালিশ নেই, কোনো অভিযোগ নেই।'

'আর কিছু?'

'বলেছে, তুই নিজেকে দেবীমূর্তির মতো একটা উঁচু বেদীতে তুলে রেখেছিস। ও তাতে ছোটো হয়ে যাচ্ছে। হীনম্মন্যতা।'

রূপসার মনে হলো, সুদূর প্রকাশ্য রাজপথে ওকে বিবস্ত্র করে তুলছে, ওর ভেতরটাকে অন্যায়ভাবে অবারিত করে তোলার চেষ্টা করছে। অথচ ওর দৃষ্টিভঙ্গি-টাই সম্পূর্ণ একপেশে।

'আমি কোনোদিন ভাবতেও পারিনি, একদিন এই একান্ত ব্যক্তিগত প্রসঙ্গটা নিয়ে আমাকে কোনো তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসতে হবে। কিন্তু আমি ভুল করেছিলাম, এটা আমার অনুমান করা উচিত ছিলো। আসলে সুদূর খুব অসহায়, তাই ওর আত্মবিশ্বাস বড়ো কম।' স্বগতোক্তির মতো অস্ফুটে বললো রূপসা। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সোনালির চোখের দিকে তাকালো, 'না সোনা, আমি দেবীটেবী হয়ে থাকতে চাইনে, কোনোদিনও চাইনি। আমি নেহাতই রক্তমাংসে গড়া একটা মেয়ে।

'তুই তো জানিস, সুদূর ক্রমাগত আমাদের বিয়েটা পেছিয়ে দিচ্ছিলো। কিন্তু কারণ হিসেবে ও যে যুক্তিগুলোকে সামনে এনে দাঁড় করাচ্ছিলো, আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম সেগুলো কোনো যুক্তিই নয়। স্রেফ অজুহাত। তাই ক্রমশ আমার জেদ আরও বাড়ছিলো।

'একদিন বিকেলে আমরা লেকে একটা বেঞ্চিতে বসে রয়েছি, আশেপাশে ঘাসের বুকে কয়েকটা ফুটফুটে শিশু হাসছে খেলছে লুটোপুটি খাচ্ছে। দেখে আমি বললাম, 'কি সুইট। না'?

'ও বললো, 'তুমি বাচ্চা খুব ভালোবাসো বুঝি'?

'আমি বললাম, 'বাচ্চা কে না ভালোবাসে'?

'তাই শুনে ও বেশ খানিকক্ষণ গুম হয়ে রইলো, কোনো কথা বললো না। আমি এর কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তাই ওর সঙ্গে খুনশুটি করার চেষ্টা করছিলাম, ওকে রাগিয়ে দিতে চাইছিলাম—যেমন সর্বদাই করি। কিন্তু তাতে কোনো কাজ হচ্ছিলো না। অনেকক্ষণ বাদে আচমকা খুব নিচু গলায়—নিজের সঙ্গে কথা বলার মতো নিচু গলায়—সুদূর মুখ নিচু করে জিগেস করলো, 'বিয়ের পরে আমাদের যদি কোনো বাচ্চা না হয়'?

প্রথমটাতে খেয়াল করিনি। কিন্তু সুদূর ফের জিগেস করলো প্রশ্নটা। শুনে আমার রাগ হলো। বললাম, 'এ আবার কেমনতরো প্রশ্ন? বাচ্চা হবে না কেন'?

'এতোক্ষণ বাদে ও সরাসরি আমার মুখের দিকে তাকালো, 'ধরো আমার যদি কোনো গোলমাল থাকে'?

'তুই তো জানিস সোনা, হারতে আমার ভালো লাগে না। সেদিন আমি যদি হার মেনে ফিরে আসতাম, তাহলে আজ আর তোর সামনে আমাকে এমন ক'রে

জবাবদিহি দিতে হতো না। কিন্তু আমি তখন একগুঁয়ের মতো বললাম, 'গোলমাল তো আমারও থাকতে পারে। সেজন্যে ডাক্তার আছে'!

'তখন বিকেল প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। শেষ বিকেলের সেই মরা আলোয় সুদূরের মুখটা হঠাৎ কেমন যেন নিষ্ঠুর হয়ে উঠলো। প্রায় দাঁতে দাঁত চেপে ও বললো, 'ধরো গোলমালটা আমারই। চিকিৎসা করিয়েও কিছু হলো না। তখন? তখন কি তোমার মনে হবে না, তোমার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেলো? আমি তোমার জীবনটাকে নষ্ট করে দিলাম'?

'কথাটা শুনে প্রথমে আমি ভীষণ ঘাবড়ে গেলাম। কিন্তু পরক্ষণেই আমার বুকের ভেতরে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগলো। পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, হি মিনস ইট। এজন্যেই ও বারবার বিয়েটা পেছিয়ে দিচ্ছে। এতোদিন ধরে ও আমাকে এটাই বলতে চেয়েছে, কিন্তু বলতে পারেনি। বলতে পারেনি তার কারণ ওর চরিত্রটাই তেমন শক্ত হয়ে গড়ে ওঠেনি—যার পরিচয় আমি আগেও পেয়েছি। কিন্তু আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকায় একটা কথা ও বুঝতে পারেনি, কিংবা বিশ্বাস করতে ভয় পেয়েছে। ও বুঝতে চায়নি যে একটা মানুষ যখন অন্য একটা মানুষকে ভালোবাসে তখন তার গুণগুলোর মতো তার দুর্বলতা, তার দোষগুলোকেও সে মেনে নেয়। তা না হলে আবেগের তীব্রতা যখন কমে আসে, তখনও গভীরতার প্রশান্তি আসে না।

'কিন্তু ওই মুহূর্তে আমার ভালোবাসা আমাকে নিষ্ঠুর করে তুললো, সোনা। আমি ওকে চেপে ধরলাম। আর তাই সেই ভয়ঙ্কর বিকেলটাও নিষ্ঠুরের মতো আমাকে অনেক নির্মম সত্য জানিয়ে দিলো।'

'কি?' সোনালি চোখে মুখে একইসঙ্গে বিস্ময় আর আতঙ্ক নির্বিচারে খেলা করে।

'ছোটোবেলা ওর একবার প্রচণ্ড হাম হয়। অসুখটা খুবই সাধারণ, প্রায় সকলেরই হয়ে থাকে। কিন্তু এক এক জনের ক্ষেত্রে ওই আপাত নিরীহ রোগটাই পরিণামে মারাত্মক হয়ে ওঠে। সুদূরেরও তাই হয়েছিলো।' রূপসার চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে, 'হামের প্রকোপে ওর যে রোগটা হয়, তার ডাক্তারি নাম অরকাইটিস—ইনফ্লামেশন অফ টেস্টিস। এবং তার ফলে ওর বীজসৃষ্টির ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়, ও জন্ম দেবার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলে।'

'তার মানে তুই সবকিছু জেনেশুনেই ...'

'হ্যাঁ, সবকিছু জেনেও আমি ওকে বিয়ে করলাম।'

'কিন্তু এতো বড়ো একটা বোকামো তুই কেন করলি?'

'কেন করলাম? ভাবলাম বিয়ের পরে ওর যদি ওই অসুখটা হতো, তাহলে আমি কি ওকে ফেলে দিতে পারতাম? পারতাম না। তাছাড়া দাম্পত্য জীবনে সন্তান যে সর্বদাই অনিবার্য, তাও তো নয়! তবে আমরা কেন সুখী হতে পারবো না? আফটার অল ডাক্তারদের মতে হি ইজ স্টেরাইল, বাট নট ইমপোটেন্ট—সহবাস করার মতো যোগ্যতা ওর আছে।'

'তোর কথা আমি পুরোপুরি মানতে পারলাম না। একটা লোকের ক্যানসার

আছে জানলে—তাকে যতো ভালোই বাসি না কেন—আমি বোধহয় বিয়ে করতে পারতাম না। সুদূরের ব্যাপারটা তার চাইতে কম সিরিয়াস নয়, বিশেষ করে তোর সামনে যখন পুরো জীবনটা পড়ে রয়েছে। আসলে ভালোবাসা নয়—আমার ধারণা, ওকে বিয়ে করে তুই পুরোপুরি জিততে চেয়েছিলি, নিজের ইগোকে স্যাটিসফাইড করতে চেয়েছিলি।'

'জানি না,' রূপসা রুদ্ধশ্বাসে বললো, 'হয়তো তাই।'

'কিন্তু বিশ্বাস কর, আমরা এতো কথা জানতাম না।' রূপসার একটা হাত চেপে ধরলো সোনালি, 'আমরা ভেবেছিলাম বিয়ের অনেক পরে তোরা জানতে পেরেছিস যে তোদের কোলে সন্তান আসবে না এবং দোষটা সুদূরের।'

'ও কি তোদের তাই বলেছে?'

'না, তা নয়।' সোনালি দ্বিধাগ্রস্ত ভঙ্গিতে বললো, 'আসলে সুদূরকে আমরা কোনো প্রশ্ন করিনি, ওর কথাবার্তা থেকে আমরা এটা অনুমান করে নিয়েছিলাম। ও শুধু বলেছিলো, পরিস্থিতিটা এখন ওর পক্ষে একেবারে অসহ্য হয়ে উঠেছে।'

'কিন্তু সন্তানের অভাবই পরিস্থিতি অসহ্য হয়ে ওঠার আসল কারণ নয়, সোনা। তার কারণ আলাদা। নিঃসন্তান হয়ে জীবন কাটাতে আমার আজও কোনো আপত্তি নেই। সেটা তো আমি মেনেই নিয়েছিলাম।'

'তাহলে, তাছাড়া কি আরও কিছু আছে?'

'হ্যাঁ, আরও একটা কারণ আছে। একেবারে নগ্ন সত্য। তুই শুনবি? আর ইউ রেডি টু ফেস ইট?'

'কি?'

'সেই প্রথম রাতটায়—তোরা সবাই তখন চলে গেছিস—হঠাৎ ঝড় উঠলো। প্রচণ্ড ঝড়। এলোমেলো দমকা বাতাসের সঙ্গে মিশে গেলো মেঘের গর্জন। তারপর বৃষ্টি। সুদূর ক্যাসেটে গান চালালো। 'আমার প্রিয়ার ছায়া বাতাসে আজ ভাসে।' আমি খোলা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিভেজা লেকের দিকে তাকিয়ে ছিলাম স্বপ্নের পাখির মতো। আর ভাবছিলাম, কতোক্ষণে শেষ হবে আমার প্রতীক্ষা—কখন সুদূর আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বলবে—কে জানে, কি বলবে।... তারপর এক সময় ও আমার একেবারে কাছাকাছি এসে দাঁড়ালো। আমাকে জড়িয়ে ধরে, আমার ঠোঁটে ঠোঁট রাখলো। চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিলো আমার সারা মুখ, গলা, আমার খোলা চুল। আমার শরীর কেঁপে কেঁপে উঠলো। ওর শরীরের গন্ধে আমার সমস্ত চৈতন্য একটু একটু করে লুপ্ত হয়ে গেলো। আমরা বিছানায় গেলাম। একজন পুরুষের সঙ্গে—আমার প্রিয় পুরুষের সঙ্গে—সেই আমার প্রথম নিশি যাপন। আবেগ আর প্রত্যাশায় আমার শরীরে কাঁটা দিচ্ছিলো, নেশায় জড়িয়ে আসছিলো দুই চোখ। ও আমার খোলা বুকে মুখ গুঁজলো। ওর চঞ্চল হাত আমার উদগ্রীব শরীরের রহস্য খোঁজার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলো। আমি নতুন করে শিউরে উঠলাম। শুধু ভাবছিলাম, কতোক্ষণ—আরও কতোক্ষণ প্রতীক্ষার এই দুরন্ত জ্বালা সহ্য করতে হবে আমাকে।

'কিন্তু হঠাৎ কি যেন হয়ে গেলো। দ্রুত একটা পাক খেয়ে বিছানা ছেড়ে নেমে

দাঁড়ালো সুদূর। আমি দেখলাম, কি এক যন্ত্রণায় ওর সুন্দর শরীরটা যেন দুমড়ে-মুচড়ে বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। পরমুহূর্তেই বিছানায় বসে দু হাতের অঞ্জলিতে মুখ ঢাকলো মানুষটা।

'ঘটনার আকস্মিকতায় আমি স্থাণু হয়ে গিয়েছিলাম। তবু আস্তে আস্তে, সসঙ্কোচে, ওর পিঠে হাত রাখলাম। ও একটুও নড়লো না। জিগেস করলাম, 'শরীর খারাপ লাগছে'?

'মুখ থেকে হাত সরিয়ে ও আমার দিকে তাকালো। অবাক হয়ে আমি দেখলাম, ঘাম আর চোখের জলে ওর সারা মুখ ভিজে উঠেছে। বললো, 'আমি পারবো না, রূপ! আমি বুঝতে পারিনি, জানতামও না ... কবে যেন আমি সবকিছু খুইয়ে ফেলেছি'।

'আমার বুকের ভেতরটা হিম হয়ে উঠলো। তবু আমি জোর করে ওকে শুইয়ে দিলাম। ভেজা তোয়ালে দিয়ে ওর শরীরের ঘাম মুছে নিলাম। তারপর মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ওকে সাহস দিয়ে বললাম, 'এটা নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই। প্রথম দিন বেশি উত্তেজনায় এ রকম হতেই পারে। অনেকেরই হয়। আমি বইতে পড়েছি'।

'কিছুক্ষণের মধ্যেই ও শিশুর মতো ঘুমিয়ে পড়লো। আর আমি সারা রাত জেগে জেগে বৃষ্টিভেজা সাদার্ন অ্যাভিনিউর দিকে তাকিয়ে রইলাম অপলক।'

'তারপর?' রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করলো সোনালি।

'আমাদের কফি কিন্তু ঠাণ্ডা হয়ে গেলো।' নিঃশ্বাস ফেলে ওর দিকে তাকালো রূপসা।

'তারপর কি হলো বল?' সোনালি এখন অধৈর্য।

'তারপর আর কিছু নেই, সোনা। নাথিং নিউ। ওনলি রেপিটেশন অফ দ্য সেইম ওল্ড স্টোরি। প্রতিদিন, বারবার, নানাভাবে আমরা চেষ্টা করে দেখেছি। কোনো লাভ হয়নি। আর প্রতিবারের বিফলতা সুদূরের আত্মবিশ্বাসের কফিনে একটা করে নতুন পেরেক ঠুকে দিয়েছে। এখন ও আমার স্পর্শকে ভয় পায়, আমাকে সহ্য করতে পারে না, আমাকে এড়াবার চেষ্টা করে। কিন্তু সোনা, তবু আমি হাল ছাড়তে রাজি নই। কিছুতেই না। কারণ আমি জানি, আমি ওকে মুক্তি দিলে ও একেবারে তলিয়ে যাবে, হারিয়ে যাবে।'

'কিন্তু তাই বলে তুই ... এমনি করে আর কতো দিন ... '

সোনালির চোখ দুটো জলে ভরে ওঠে।

'যতোদিন ও স্বাভাবিক না হয়! আমার বিশ্বাস ও একদিন নিশ্চয়ই স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। আমি কয়েকজন ডাক্তারের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলেছি। তাঁরা প্রত্যেকেই বলেছেন, গোলমালটা সম্ভবত ওর মনে—শরীরে নয়।'

'তাহলে কোনো ... '

'সেখানেই তো মুশকিল! সুদূরের ধারণা, ব্যাপারটা পুরোপুরি ফিজিক্যাল। তাই ও কোনো মনের ডাক্তারের মুখোমুখি হতে চায় না। ও মনে করে, রোগটা লজ্জাজনক, এবং এটা সারার কোনো আশা নেই। তাই এ নিয়ে কোনো ডাক্তারের

সঙ্গে আলোচনা করতেও ওর বোধহয় ইগোতে লাগে। বুঝতেই তো পারিস, রোগী কো-অপারেট না করলে যে কোনো রোগই সারানো কতো কঠিন!'

'তাহলে তুই কি করবি?'

'চেষ্টা করবো। অপেক্ষা করবো।'

'কতো দিন?'

'জানি না।'

'শোন রূপা, তোরা দুজনেই আমাদের কাছে ভীষণ প্রিয় মানুষ। কিন্তু একজনের জন্যে তোদের দুজনের জীবনই নষ্ট হয়ে যাবে, এটা মেনে নিতে আমার কষ্ট হচ্ছে। বিশ্বাস কর!'

'নষ্ট হবে বলছিস কেন? হয়তো দুজনের জীবনই একদিন ভীষণ সুন্দর হয়ে উঠবে। নিশ্চয়ই হবে। সেদিন তোরা হাততালি দিবি তো?'

'এখনও তোর রসিকতা আসে?'

'তাছাড়া জীবন চলবে কি করে, বলতো!'

'আর কেউ এসব কথা জানে?'

'জানে। আর একজন।'

'কে? অনুভব?'

'হুঁ।'

'আয়্যাম সারি, রূপা।' রূপসার একটা হাত চেপে ধরলো সোনালি, 'না বুঝে আমরা তোর ওপরে অন্যায় রাগ করেছিলাম। ক্ষমা করে দে।'

'বাজে কথা ছাড়।'

ঘড়িতে প্রায় তিনটে। মিছিল থেকে সকলের ফেরার সময় হয়ে এসেছে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো রূপসা, 'এবারে তুই কেটে পড়। আমাকে ডিপার্টমেন্টে যেতে হবে। অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে। তোরা তিনজনে মিলে সন্ধ্যের পরে আয় না একদিন? অনেকক্ষণ ধরে গল্প করা যাবে? তবে দু-তিন দিন আগে একটা ফোন করে খবরটা জানিয়ে রাখিস। তুহিনকে বলিস ফোন করতে। কেমন?'

রেগুলেটার ঘুরিয়ে ফ্যানের স্পিড সামান্য কমিয়ে দিলো সোনালি। তারপর মাথায় চিরুনি চালাতে চালাতে আরশিতে নিজের দিকে তাকিয়েই বললো, 'গরমটা হঠাৎ বেশ কমে গেলো কিন্তু, তাই না?'

পরপর কয়েক দিন উৎকট গরম ও ভ্যাপসা গুমোটের পর আজ বিকেল থেকে কলকাতার আকাশ রীতিমতো মেঘলা হয়ে এসেছে। সন্ধ্যের পরে ঝিরঝিরে বৃষ্টিও হয়েছে কিছুক্ষণ। কিন্তু তাতেই পরিবেশ এখন অনেকটা সহনীয় হয়ে উঠেছে। কোথায় সেই আন্দামানের কাছে সমুদ্রের আকাশে নাকি প্রবল নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে আর তারই নেশায় ম্যাজিকের মতো বদলে গেছে কলকাতার বিশ্রী ক্লান্তিকর আবহাওয়া। ভাবলে সত্যিই অবাক হতে হয়। কিন্তু নিদারুণ গ্রীষ্মকালে ঘন মেঘের ছায়ায় আর ভেজা বাতাসের প্রসাদে এটুকু স্বস্তি পাবার লোভে স্বেচ্ছায় এমন করে অবাক হতেও আনন্দ।

'কথাটা কি কানে গেলো?' ফের প্রশ্ন করলো সোনালি।

'হুঁ,' বই থেকে মুখ না তুলেই জবাব দিলো তুহিন।

'হুঁ, মানে?'

'হ্যাঁ, কি বলছিলে যেন?' এতোক্ষণে সতর্ক হলো তুহিন।

চিরুনি থামিয়ে মানুষটার দিকে মুখ ফেরালো সোনালি, 'এবারে বইটা আমি জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেবো।'

'কি সর্বনাশ! কেন, বইটা আবার কি দোষ করলো?'

'না, যতো দোষ আমার।'

'এই মরেছে।' তুহিন এখন রীতিমতো বিব্রত, 'কি হয়েছে, বলবে তো?'

'সকালে আমাদের কারুরই সময় থাকে না। তোমার অফিসের তাড়া—আর আমি তো তখন রান্নাবান্না, তোমার টিফিন আর তোমার টোটাকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। ফুরসত বলতে এই সময়টুকু। কিন্তু এখনও যদি তুমি বই মুখে নিয়ে ঠোঁট বুজে বসে থাকো, তাহলে আমরা কথা বলবো কখন?'

'ঠিক বলেছো, এখন বই পড়ার কোনো মানেই হয় না।' একটা প্রবল উৎসাহের ভঙ্গি দেখিয়ে বইটা বন্ধ করে রাখে তুহিন, 'কি যেন বলছিলে তুমি?'

'কিছু না,' আরশির দিকে মুখ ফিরিয়ে উদাসী ভঙ্গিমায় ফের চিরুনি চালানোয় মন দেয় সোনালি।

'আহা, রাগ করছো কেন?' বই তো আমি সেই কখন রেখে দিয়েছি! বলো না, কি বলছিলে যেন?'

সোনালি কোনো জবাব দেয় না।

'বুঝেছি,' তুহিন ছোট্ট করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, বইটা ফের তুলে নেবে কিনা চিন্তা করতে থাকে।

'কি বুঝলে?'

'বুঝলাম আমার কপালে অশেষ দুর্গতি। আজও আমাকে মা মনসার সঙ্গে রাত কাটাতে হবে।'

'খুব খারাপ হচ্ছে কিন্তু!'

'তাহলে বলো, কি বলছিলে?'

'বলছিলাম, মাঝে মাঝে কেমন যেন একটা ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। ওধারের জানলাটা কি বন্ধ করে দেবো?'

'কেন? বেশ তো লাগছে!'

'কিন্তু টোটার যদি ঠাণ্ডা লেগে যায়?'

'ওফ্, এই এক বাতিক হয়েছে তোমার! এই বাতাসে ঠাণ্ডা লাগে না ডার্লিং, শরীর জুড়োয়।'

'তোমার শরীর আর টোটার শরীর এক হলো?' মুখে ময়েশ্চারাইজার ঘষতে ঘষতে প্রশ্ন ছোঁড়ে সোনালি।

'না, তা নয়। তবে এখন থেকে ওকে সবকিছুই একটু একটু করে সইয়ে নেওয়া দরকার। নইলে বড়ো হয়ে আজ সর্দি, কাল গলাব্যথা, পরশু পেট খারাপ—এসব

লেগেই থাকবে। সারাটা জীবন তুমি কি ওকে আগলে রাখবে?'

'ঠিক আছে, তাহলে এখন ওটা না হয় খোলাই থাক। পরে তেমন বুঝলে তুমি না হয় বন্ধ করে দিও। কেমন?'

'ও. কে. বস। তা তুমি পিলটা খেয়েছো তো?'

'এটা জিগেস করতে তো তোমার একদিনও ভুল হয় না?' হাতের কাজ থামিয়ে তুহিনের দিকে অপাঙ্গে তাকালো সোনালি, 'পাজি, বদমাশ কোথাকার!'

'জিগেস না করে উপায় আছে? তারপর গত বছরের মতো ফের একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে বসো যদি?'

'কাণ্ডটা কে বাঁধিয়েছিলো, শুনি?'

'তুমি!'

'হ্যাঁ, কিন্তু তার কলকাঠি কে নেড়েছিলো?'

'তা কে বলতে পারে?'

'তার মানে?' সোনালি বিছানায় বসে চোখ পাকালো, 'তুমি তার কিচ্ছুটি জানো না, তাই না?'

'কি করে জানবো? তবে এটুকু বলা যায় যে সেটা আমিও হতে পারি।'

'তবে রে!'

সোনালি শরীরের ঊর্ধ্বাংশ দিয়ে তুহিনকে বিছানায় চেপে ধরে। তুহিন খানিকক্ষণ হাসিমুখে ওর নিবিড় দৌরাত্ম্য উপভোগ করে। তারপর দু হাতের বলিষ্ঠ-সোহাগী আকর্ষণে ওকে পুরোপুরি নিজের শরীরে তুলে নেয়।

বেশ কিছুক্ষণ পরে সোনালির ঘেমে ওঠা কপালে শ্রান্ত ঠোঁট ছোঁয়ায় তুহিন, 'খুশি?'

'হুঁ-উ! তুমি?' ফিসফিসিয়ে প্রশ্ন করে সোনালি।

'আমিও।'

'জানো, আমি একটা কথা ভাবছিলাম।'

'কি?'

'ভাবছিলাম না, এখুনি ভাবলাম। এইমাত্র, একেবারে হঠাৎ মনে হলো কথাটা।'

'কি কথা?'

'রূপা আর সুদূরের কথা।' সোনালি বললো, 'এইসব স্বার্থপর সুখের মুহূর্তে অন্য কারুর কথাই তো আমাদের মনে হওয়ার কথা নয়, তাই না? তবু আমার ওদের কথা মনে হলো। কেন বলো তো?'

'কি মনে হলো?'

'মনে হলো, ওরা আজও এই আশ্চর্য সুখটার স্বাদ জানতে পারলো না। হাউ স্যাড!'

'স্যাড অ্যাণ্ড ডিজগাস্টিং।'

'ডিজগাস্টিং কেন?'

'তাছাড়া আর কি? সারাটা জীবন নিজেকে বঞ্চিত রেখে অহেতুক একটা নপুংসকের বোঝা বয়ে বেড়ানো—ইমপসিবল! রূপা যে কেন এমন বোকার মতো

গোঁ ধরে বসে আছে, তা সত্যিই আমার মাথায় ঢোকে না।'

'তুমি একটি গবেট, তাই তোমার মাথায় ঢোকে না। সুদূরের অনেক দোষ, অনেক দুর্বলতা সত্ত্বেও রূপা তাকে ভালোবাসে। সেই ভালোবাসার আকর্ষণেই ও এই সুখ, এই আনন্দের আকর্ষণকে উপেক্ষা করছে। বুঝছো?'

'এটা চূড়ান্ত বোকামো, সোনা। এটা কোনো যুক্তিই নয়। ধরো তোমার একজন ভীষণ প্রিয়, কাছের মানুষ—ধরো আমি—আমার একটা ভয়ঙ্কর অসুখ হয়েছে, আমি খেতে পারছি না, আর কোনোদিনও পারবো না এবং তুমিও তা জানো। সব জেনেশুনেও, অর্থহীন বুঝেও—আমি খাচ্ছি না বলে তুমিও কি তখন খাওয়া বন্ধ করে দেবে?'

'দুটো কি এক জিনিস হলো?'

'হয়তো পুরোপুরি এক নয়, কিন্তু বেসিক্যালি এক। আসলে কি জানো, উই আর মোস্টলি মোটিভেটেড বাই ইমোশনস অ্যাণ্ড সেনটিমেন্টস। কিন্তু সেগুলো বাদ দিয়ে তুমি এর প্র্যাকটিক্যাল দিকটা একটু বিচার করে দ্যাখো তো! নিজেকে তুমি রূপার জায়গায় প্লেস করো, তাহলেই বুঝতে পারবে আমি কি বলতে চাইছি।'

'আমি অতো কথা ভাবতে পারি না। আমার ভয় করে।'

'একটা কথা জিগেস করবো?'

'কি?'

'সঠিক জবাব দেবে?'

'চেষ্টা করবো।'

'চেষ্টা কেন? প্রশ্নটা কঠিন নয়।'

'কিন্তু জানা থাকলেও অনেক প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায় না।'

'সাহস থাকলে এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায়। বেশ, তোমার কাজটা আমি আরও সহজ করে দিচ্ছি। তোমার জবাবে—তা যা-ই হোক না কেন—আমি কিছু মনে করবো না। প্রমিস।'

'ওটা তোমার মুখের কথা। অনেক সময় মানুষ মিথ্যে জবাব শুনতে চায়। মন শক্ত থাকলেও, সত্যি জবাব দুঃখ দিতে পারে। অস্বীকার করতে পারো?'

'না। কিন্তু সত্যকে চিরদিন লুকিয়ে রাখা যায় না। তাই ঢাকাঢাকির চেষ্টা না করাই ভালো। তাই নয় কি?'

'কিন্তু বিনা প্রয়োজনে একটা অপ্রীতিকর প্রসঙ্গকে ডেকে এনে কি লাভ?'

'লাভ আছে। আমি নিজের সঙ্গে একটা বাজি ফেলেছি। তাই ফলাফলটা যাচাই করে নিতে চাই। আশা করি আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি?'

'কি প্রশ্ন?'

'আজ রূপার জায়গায় তুমি হলে কি করতে?'

'জানি না।'

'তোমার ইমপালস কি বলে?'

'এই মুহূর্তে আমার ইমপালস কোনো কাজ করছে না।'

'আমি এই মুহূর্তের কথা বলছি না। ধরো আমাদের সবেমাত্র বিয়ে হয়েছে।

টোটা আমাদের কল্পনাতেও আসেনি। তখন দেখা গেলো, আমি অক্ষম। তাহলে?'

'জানি না,' সোনালি এক হাতে তুহিনকে জড়িয়ে ধরে।

'আমি জানি।'

'কি?'

'আমি বাজি জিতে গেছি।'

'মানে?'

'তুমি তখন ডিভোর্সের কথা চিন্তা করতে। এখনকার যে কোনো মেয়েই তাই করবে, কারণ সেটাই স্বাভাবিক। রূপা অহেতুক নিজের জেদ বজায় রাখার চেষ্টা করতে গিয়ে অনর্থক নিজের ওপরে অবিচার করছে। এটা স্বাভাবিক নয়। কিংবা এমনও হতে পারে, এই দুঃখটাই এখন ওর কাছে একটা বিলাস।'

'আমি তা মানতে পারলাম না। তুমি কি বলতে চাও, ওর ভালোবাসাটা কিছু নয়? সবটাই ওর জেদ?'

'সোনা, আজকের দিনে মানুষকে যুক্তি দিয়ে পথ বাছতে হবে, আবেগ দিয়ে নয়। তাহলে অনেক দুঃখ দুর্গতির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। তুমি তো জানো, এটা মেটিরিয়াল ওয়ার্ল্ড!'

'কিন্তু মেটিরিয়াল গেইনটাই কি জীবনের সব? সেটা পেতে গিয়ে জীবনের অন্য দিকগুলো যদি শুকনো খটখটে হয়ে যায়?'

'আমি ওসব মানি না।' একটু থেমে তুহিন বললো, 'রূপা বড্ড প্রাচীনপন্থী, একটুও আধুনিকমনস্ক নয়, ভীষণ বোকা। ওর জন্যে আমার দুঃখ হয়।'

'আর সুদূর? তুমি ওর কথা একটুও ভাবছো না। একবার ভেবে দ্যাখো তো, কি প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে ওকে দিন কাটাতে হচ্ছে!'

'হ্যাঁ, তোমার যন্ত্রণাটা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।'

'মানে?'

'তোমার তো আবার সুদূরের সম্পর্কে মনে একটু গোপন ব্যথা ছিলো! মনে হচ্ছে সেটা এখনও রয়ে গেছে। তাই না?'

সোনালি প্রাণপণে একটা চিমটি কাটলো তুহিনকে। তুহিন অস্ফুট একটা আর্তচিৎকার করেই হেসে ফেললো, 'তার মানে কথাটা তাহলে সত্যি!'

'সত্যি হলেই বা কি?'

'কি আবার। তবে ভাগ্যিস আমি সময়মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে স্রোতের মুখ থেকে তোমাকে তুলে এনেছিলাম। নইলে কি যে হতো!'

জানে না, সোনালি জানে না তাহলে কি হতো। তবে এটুকু জানে, সুদূর ওর সামনে এসে দাঁড়ালে ও কিছুতেই তাকে ফিরিয়ে দিতে পারতো না। কোনোমতেই না। ভাবতে গেলে আজ এতোদিন বাদেও বুকের মধ্যে কোথায় যেন একটা চিনচিনে ব্যথার অনুভূতি হয়। হয়তো তা ব্যথা নয়, জ্বালা। অথচ আজ ওর জীবনে কোনো অভাব নেই। আদর্শ, স্নেহময় স্বামী—যার কাছে মনের সব কথা অক্লেশে খুলে বলা যায়, দেবশিশুর মতো সুন্দর ফুটফুটে ছেলে, সাজানো পরিপাটি সচ্ছল সংসার। কি নেই ওর? তবু কেন এমন হয়?

'একদিন যাবে?' জিগেস করে সোনালি।

'কোথায়?'

'ওদের বাড়িতে?'

'না। আপাতত নয়।'

'কেন? রূপা তো আজ নিজেই আমাকে যেতে বললো।'

'বলুক।'

'মানে?'

'ওরা আমাদের যতোই ঘনিষ্ঠ হোক না কেন, একসঙ্গে থাকলে ওরা আমাদের সামনে খানিকটা অভিনয় করার চেষ্টা করবে। কিন্তু তা গোপন থাকবে না। সে বড়ো অস্বস্তিকর আর মর্মান্তিক। তার চাইতে আমরা বরং আলাদা আলাদাভাবে—এক একদিন ওদের এক একজনের সঙ্গে—যোগাযোগ করবো, খবরাখবর নেবো, দরকার হলে সাধ্যমতো সাহায্যও করবো। সেটাই বরঞ্চ ভালো হবে, তাই না?'

'আচ্ছা,' পাশ ফিরে চোখ বুজলো সোনালি। আর সঙ্গে সঙ্গেই রূপসার মুখখানা ওর চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

একদিন তোর ওপরে আমার রাগ ছিলো, রূপা। কারণ সেদিন আমি তোকে হিংসে করতাম। কারণ তুই সুদূরকে জয় করে নিয়েছিলি, আমি তা পারিনি। আসলে তেমন কোনো সুযোগই আমি পাইনি। কিন্তু তবু, তা সত্ত্বেও, আমরা বন্ধু ছিলাম। অন্তরঙ্গ বন্ধু। তারপর তুহিনকে পেয়ে আমি আমার সব রাগ, সব দুঃখ আর সব হিংসে ভুলে গেলাম। তখন মনে হতো, কি বোকামোই না করতে যাচ্ছিলাম। ভাগ্যিস সময়মতো ফিরে আসতে পেরেছিলাম, নইলে তো তুহিনকেও পেতাম না!

তারপর দেখতে দেখতে কতো দীর্ঘ দিন কেটে গেলো। সময়ের উজান ঠেলে ঠেলে আমরা যে ভালোবাসার ঘাটে ডিঙি ভিড়িয়ে একটু একটু করে স্থিতু হলাম। আমাদের বন্ধুত্বও অটুট রয়ে গেলো। তাই জানিস রূপা, আজ তুই যখন তোদের সব কথা আমাকে খুলে বললি তখন তোদের জন্যে আমি সত্যিই দুঃখিত হয়েছিলাম। আর সেই সঙ্গে হাজার বার ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম নিজের ভাগ্যকে, এমন একটা অদ্ভুত ঘটনার সঙ্গে আমার জীবনটা জড়িয়ে যায়নি বলে।

কিন্তু সেই সঙ্গে, জানিস রূপা—এখন নিজের কাছেও স্বীকার করতে আমার লজ্জা লাগছে—সেই সঙ্গে সেই মুহূর্তে এক অদ্ভুত নির্লজ্জ বিদ্বেষে আমার মন খুশিতে ভরে উঠেছিলো। নিতান্তই জঘন্য এক গ্রাম্য বিদ্বেষ। সুদূর—যাকে আমি নিজের করে পেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তোর জন্যে পাইনি—তাকে তুইও সম্পূর্ণ করে পাচ্ছিস না, সে তোকে সবকিছু দিতে পারছে না, তোরা সুখী হতে পারছিস না—এতে আমার এক আশ্চর্য আনন্দ হয়েছিলো। এ এক অর্থহীন বর্বর আনন্দ। হয়তো আমার ওই মনোভাবের স্থায়িত্ব ছিলো মোটে একটি মুহূর্ত। কিন্তু সেই বিশেষ মুহূর্তটার জন্যে তোর কাছে আমার লজ্জার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। আমাকে তুই ক্ষমা করিস, রূপা। বিশ্বাস কর, আমি কিন্তু সত্যিই তোদের সুখী দেখতে চাই।

'অমন উশখুশ করছো কেন?' আচমকা জিগেস করলো তুহিন।

'ঘুম আসছে না।'

'কেন?'

'জানি না। এদিকের জানলাটা একটু বন্ধ করে দেবে?'

'কেন, ঠাণ্ডা লাগছে নাকি?'

'না।'

'তবে?'

'তুমি বড্ড বকাও। দেখছো না, ঘরে জ্যোৎস্না আসছে? তুমি জানো না, চোখে জ্যোৎস্না এসে পড়লে আমার কিছুতেই ঘুম আসে না?'

৫

আকাশ মেঘলা হলে অনুভবের মনও মেঘে মেঘে ভরে ওঠে। কোনো কাজে মন লাগে না, মন লাগাতে ইচ্ছে করে না। ইচ্ছে করে ক্যাসেটে কোনো ভালো সুর শুনতে শুনতে বিছানায় শুয়ে খোলা জানলা দিয়ে আকাশের দিকে আনমনা দৃষ্টি মেলে রাখতে। অথবা হাই স্পিডে গাড়ি চালিয়ে অপ্রয়োজনে কোথাও উধাও হয়ে যেতে। অথচ আজকাল তা আর হয় না। জীবনটা একেবারে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা হয়ে গেছে। উপায় নেই এ বাঁধন ছিঁড়ে পালিয়ে যাবার। তাই মাঝে মাঝে মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চায়। আর তখন, সেই সব অসহায় মুহূর্তে, একটা অদ্ভুত চিন্তা অনুভবকে ক্রমশ অধিকার করে ফেলে। তার মনে হয়, এমনও তো হতে পারে যে আমি, শ্রীযুক্ত অনুভব সেন, হেভি ব্রেকফাস্ট সেরে আমার স্ত্রী শ্রীমতী আরতি সেনকে যথারীতি একটু আদর টাদর করে অফিসে যাবো বলে গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছি। হাতে সময় বেশি নেই। অফিসে গিয়েই একটা জরুরি কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। সামনে প্রচুর সমস্যা। ঠাণ্ডা মাথায় সেগুলোর সুষ্ঠু সমাধান করা দরকার। কিন্তু তখনই, সেই প্রস্তুতির মুহূর্তে, হঠাৎ কোথায় কি যেন একটা গোলমাল হয়ে গেলো। আমার গ্রে-সেলগুলো থেকে একেবারে অলৌকিকভাবে ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে গেলো আমার অতীত আর বর্তমান। কমপ্লিটলি ইরেজড। আমি ভুলে গেলাম আমার নাম, আমার পরিচয়, ঠিকানা—সবকিছু। তখন? তখন তুমি কি করবে হে, অনুভব সেন? কেন, ওয়ালেটে আমার কার্ড আছে—অফিসের নাম, ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বর লেখা কার্ড। তাছাড়া গাড়িব লাইসেন্স আর রেজিস্ট্রেশন নাম্বার থেকেও মালিকের নাম ঠিকানার হদিশ বের করা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। কিন্তু ধরা যাক, ওয়ালেটটা ভুলে বাড়িতে রয়ে গেছে। কিংবা ওয়ালেটে কোনো কার্ড নেই—গতকাল একজনকে ওই কার্ডটা দিতে হয়েছিলো.

তারপর নতুন করে কোনো কার্ড আর ওয়ালেটে রাখা হয়নি। গাড়িটা যে তোমার, তাও তুমি জানো না। কারণ রাস্তায় গাড়ি পার্ক করে তুমি সিগারেট কিনছিলে, আর ঠিক তখনই কে যেন হঠাৎ সুইচ টিপে তোমার মগজের ওই বিশেষ ইনটিগ্রেটেড সার্কিটটাকে অকেজো করে দিলো। তখন? তেমন হলেই বা মন্দ কি। দায়দায়িত্ব নেই, কর্তব্য-বশ্যতা নেই, নিয়মের রাজ্যে তখন চমৎকার এক অনিয়মের জীবন কাটাতে ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে উঠবে অনুভব সেন। ভালোই হবে। কিন্তু কদিন? তারপর সেই প্রয়োজনহীন জীবন যাপনে নিজেকে কি প্রচণ্ড অসহায় বলে মনে হবে না তোমার? সেই গ্রন্থিবিহীন মুক্তিই কি হয়ে উঠবে না নিষ্ঠুর বন্ধনের অন্য এক নাম?

অনুভব ভাবে। ভেবে কোনো ঠিক ঠিকানা পায় না। তবে এ কথাও সত্যি যে এমন একটা চমৎকার দিনে—যখন আকাশ মেঘলা, অথচ বৃষ্টি নেই, হাওয়া বইছে শনশনিয়ে, সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে ছুটি নিয়েছে ঘাম আর গরমের আতিশয্য—তখন অফিসে যেতে তার একটুও ইচ্ছে করে না। কিন্তু ইচ্ছের দাম আর কতোটুকু! ইচ্ছে না থাকলেও তখন 'উপায় নেই' শীর্ষক একটা অনিবার্য পরোয়ানা সামনে এসে হাজির হয়। ফলে যতোই অনিচ্ছা থাকুক না কেন, তখন নিয়ম অনুযায়ী ফের শুরু করতে হয় কক্ষপথে অর্থহীন পরিক্রমণ।

আজ সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার। বৃষ্টি নামেনি, তবে যে কোনো মুহূর্তে নেমে পড়াও অসম্ভব কিছু নয়। তাপমাত্রা ইতিমধ্যে কিছুটা নেমে গেছে নিশ্চয়ই। হাওয়া বইছে মন পাগল করা। একটু স্যাঁতসেঁতে। সব মিলিয়ে যেন শৈল শহরের আমেজ। ছুটির মেজাজ। অথবা ছুটির নিমন্ত্রণ। ছুটিকে অনুভব কোনো প্রিয় নারী হিসেবে কল্পনা করতে ভালোবাসে।

গাড়ি চালাতে চালাতে ক্যাসেটের গান শোনে অনুভব। 'আর ইউ সাম হোয়্যার ফিলিং লোনলি, অর ইজ সাম ওয়ান লাভিং ইউ, টেল মি হাউ টু উইন ইওর হার্ট, ফর আই হ্যাভন্ট গট আ ক্লু, বাট লেট মি স্টার্ট বাই সেইং, আই লাভ ইউ। অনুভবের ভারি পছন্দের গান। স্যাড সুইট অ্যাণ্ড রোম্যান্টিক। কিন্তু আপাতত এবারে তোমার ছুটি, লাওনেল রিচি। সিগমা অ্যাড এজেন্সি এসে গেলো প্রায়। রোম্যান্টিসিজমের আলস্য কাটিয়ে এবারে ফের নতুন উৎসাহ ও প্রবল প্রতাপে বাস্তবে ঝাঁপ দেবে অনুভব সেন।

অনুভবের মনে পড়লো, ইডেন কসমেটিক্সের নতুন শ্যাম্পু নিয়ে যে প্রজেক্টটাতে হাত দেওয়া হয়েছিলো, আজ তার মোটামুটি একটা ফলাফল বোঝা যাবে। গৌতম মিত্র স্ক্রিপ্টটা ভালোই নামিয়েছে। কিছুদিন আগে দলবল নিয়ে গোয়ার লোকেশ্যানে শুটিং করতে গিয়েছিলো রামানুজ দত্ত। ইদানীং অ্যাড ফিল্মে বেশ নাম করেছে ছেলেটি। ক্যামেরায় আছে প্রবীর ঘোষ—দুর্দান্ত হাত। পার্থ সান্যাল অবিশ্যি চেয়েছিলেন, ফিল্মের ব্যাপারটা পুলকেশ রায়কেই পুরোপুরি ছেড়ে দেওয়া হোক—উনি ভেটারেন লোক, মিডিয়াটা বোঝেন ভালো। কিন্তু অনুভব তাতে রাজি হয়নি, সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে সে রামানুজের হাতেই কাজটা ছেড়ে দিয়েছে। অতএব কাজটা টপ গ্রেডের না হলে, পার্থ সান্যাল তাকে এক হাত না নিয়ে ছাড়বেন না।

তবে অনুভবের বিশ্বাস, রামানুজ তাকে হতাশ করবে না। রামানুজ নিজের বিষয় নিয়ে যথেষ্ট পড়াশুনো করে, পুনার ইনস্টিটিউট থেকে ডিসিপ্লিনড ট্রেনিং পেয়েছে, সাহসী, পরিশ্রমী এবং সব চাইতে বড়ো কথা, ওর কল্পনাশক্তি আছে। কাজেই সুযোগ পেলে তার পক্ষে সফল না হবার কোনো কারণ নেই। তাছাড়া বুড়োরা কি চিরকালই রাজত্ব করে যাবে নাকি? একটা জায়গায় পৌঁছে তাদের তো থামতে শেখা দরকার! নইলে নতুনরা লাইনে আসবে কি করে?

আসলে পার্থ স্যান্যাল এটাই সহজ মনে মেনে নিতে পারছেন না। তিনি জানেন, অনুভব তাঁর পিঠে নিঃশ্বাস ফেলছে। আর কয়েকটা দিন বাদে অনুভবই তাঁর চেয়ারটাতে গিয়ে বসবে। মনে মনে উনিও বোঝেন, অনুভব তাঁব সুযোগ্য উত্তরসূরী। হয়তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনুভব তাঁকেও ছাপিয়ে গেছে। তবু কালকেব ছোঁড়াটাকে নিজের সমমর্যাদায় ভাবতে ভদ্রলোকের কোথায় যেন বাধে। ইগো প্রবলেম। সাদা বাংলায়, হিংসে। অনুভব মৃদু হাসে। আসলে সহ্য হচ্ছে না। আমি তোমাকে অনেক আটঘাট শিখিয়েছি, তুমি সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে ওপরে উঠেছো। খুব ভালো কথা। কিন্তু তাই বলে তুমি আমার সমান হতে চাইছো? এতো আস্পর্ধা! কেন রে বাপু, আমি তো তোকে টেনে নামিয়ে তোর জায়গায় উঠতে যাচ্ছি না! তোর দিন তো এমনিতেই ফুরিয়ে এসেছে! বোর্ড অফ ডাইরেকটর্সের মিটিং-এ গতবারই সাফ ডিসিশন নেওয়া হয়েছে, এটাই সান্যাল সাহেবের লাস্ট এক্সটেনশন। তবে? তবে কেন তুই এখনও বুড়ি শাশুড়ির মতো সংসারের কর্তৃত্ব আগলে রাখতে চাইছিস? চিরকাল কি তাই চলে কখনও?

বসতে না বসতেই প্রবীর রুদ্র ঘরে এসে হাজির। ছাব্বিশ বছর বয়েস, ঝকঝকে স্মার্ট চেহারা, গায়ে হালকা স্ট্রাইপের হাফশার্ট, টাইয়ের নটটি নিখুঁত, চোখে চশমা। একগাল হেসে নড করলো ছেলেটি।

'গুড মর্নিং বস। হ্যাড আ নাইস স্লিপ?'

'ও ইয়েস, থ্যাংক ইউ। বলো, কি সমাচার।'

'আমরা মেরে দিয়েছি, বস। উই হ্যাভ ডান ইট,' প্রদীপের চোখে মুখে আন্তরিক খুশির ঝিলিক।

'মানে?'

'নিজে দেখলেই বুঝবেন। তারপর দেখবেন, ক্যাসেটটা দেখে সান্যাল সাহেবেব মুখখানা কেমন কচু হয়ে যাবে!'

'ডোন্ট বি সিলি,' অনুভব গাম্ভীর্য বজায় রাখার চেষ্টা করে। 'তুমি ক্যাসেটটা দেখেছো নাকি?'

'দেখবো না মানে? দু বার দেখা হয়ে গেছে। মিস শেঠও ছিলেন। আমি, মিস শেঠ, প্রবীর আব গৌতম।'

'বোসো,' কলিং বেলের বোতামে চাপ দিলো অনুভব, 'কফি খাও।'

'শুধু কফিতে মিটবে না।' দরজা ঠেলে দিব্যা শেঠ ঘরে এসে ঢুকলো, 'এ কটা দিন আমরা কর্পোরেট ক্যাম্পেইন নিয়ে রাত দশটা-বারোটা অব্দি ভূতের মতো খেটে

মরেছি। আর এখন আপনি স্রেফ এক কাপ কফি অফার করছেন? তাও শুধু প্রদীপকে? চলবে না, নো চান্স! তুমি কি বলো, প্রদীপ? ডিনার না হোক, অ্যাট লিস্ট একটা লাঞ্চ তো আমরা ডেফিনিটলি ডিজার্ভ করি। তাই নয় কি?'

'রাইট। আমি এতে একমত। তবে আমার কিছু বক্তব্য ছিলো।'

'কি?'

'প্রথমত, ভূতরা কখনও মরে বলে আমার জানা নেই—খেটে মরা তো আরও দূরের কথা। দ্বিতীয়ত, ভূতের দলে নাম লেখাতে আমি একটুও রাজি নই। তৃতীয়ত, ভূত হবার বেসিক যোগ্যতাই তোমার নেই—তবে পেত্নী হবার পক্ষে আইডিয়াল। চতুর্থত ...'

'স্টপ ইট।' দিব্যা চোখ পাকিয়ে প্রদীপের দিকে তাকায়, 'হাউ ডেয়ার ইউ!'

'বারে, আমি তো শুধু ... '

'এনাফ ইজ এনাফ,' মৃদু হেসে ডান হাত তুলে প্রদীপকে থামিয়ে দেয় অনুভব। 'উইথড্র ইওর ওয়ার্ডস।'

বেয়ারা দরজা ঠেলে ঘরে ঢোকায় প্রসঙ্গটা চাপা পড়ে যায়। অনুভব তিনটে কফির অর্ডার দিতেই প্রদীপ বললো, 'কফিটা বরং ও ঘরেই দিতে বলুন। ক্যাসেটটা দেখতে দেখতে মৌজ করে সিপ করা যাবে।'

'এগ্রিড,' একটা সিগারেট ধরিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো অনুভব।

দশটা বাজতে এখনও প্রায় পৌনে এক ঘন্টা বাকি। কয়েকজন ছাড়া অফিস প্রায় ফাঁকা। নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকে জানলার মোটা পর্দাটা টেনে দিলো প্রদীপ। তারপর ভি.সি.আর. চালু করে অনুভবের পাশে গিয়ে বসলো। অনুভবের অন্য পাশে দিব্যা।

টেলিভিশনের পর্দা জুড়ে তখন একটানা সুনীল আকাশ। মাঝে মাঝে ঝকঝকে সাদা মেঘ। ডানা মেলে উড়ে চলেছে সমুদ্রপাখির দল। ক্যামেরা প্যান করে আস্তে আস্তে নিচের দিকে নেমে আসে। আদিগন্ত নীল জল। অনেক উঁচু থেকে—হয়তো কোনো হিলটপ থেকে তোলা হয়েছে দৃশ্যটা। সমুদ্রের ঢেউ পাহাড়ে বাধা পেয়ে ছিটকে উঠছে অজস্র ধারায়, ছড়িয়ে পড়ছে ভেতরের নিম্ন পাহাড়ি অঞ্চলে। সেখানে ঢেউয়ের মাতামাতি নেই। যেন পাথরে বাঁধানো স্বচ্ছ নীল জলের সুন্দর এক জলাশয়। ক্যামেরা এবারে জলাশয়ের দিকে দৃষ্টি নামায়। ব্যাক গ্রাউণ্ডে সমুদ্রের প্রবল গর্জন। এদিকে স্রোতহীন শান্ত নীল জলাশয়ে স্নান করছে আদিম এক গুহা মানবী। জুম শট। মেয়েটির অবারিত পিঠে অজস্র চুলের ছায়াময় অরণ্য। ক্যামেরা ঘুরে গিয়ে ওর সামনের দিকে স্থির হয়। বাতাসে কুয়াশার মতো ভেসে থাকা লক্ষ লক্ষ জলকণা আর মেয়েটির নিবিড় কেশরাশি ওর নগ্নতাকে আড়াল করে রেখেছে। ক্লোজ আপ। মেয়েটির চোখে মুখে দুরন্ত এক বন্য উল্লাসের অভিব্যক্তি। পরক্ষণেই অন্তরাল থেকে পরিচালকের তীক্ষ্ণ নির্দেশ, 'কাট!' ক্যামেরা সোঁ করে বিপরীত দিকে মুখ ঘোরায়। পাহাড়ের গায়ে ক্যামেরা, রিফ্লেকটার এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রোডাকশন ইউনিটের লোকজন। মাথার টুপিটা হাতে নিয়ে পরিচালক উচ্ছ্বসিত ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন, 'সুপার্ব হয়েছে, মিস গুহ। একসেলেন্ট।' ওঁর পাশ থেকে ইউনিটের একটি মেয়ে

দ্রুত নেমে গিয়ে নায়িকার হাতে একটা বাথরোব তুলে দেয়। সেটা অলস ভঙ্গিতে গায়ে জড়িয়ে জল থেকে উঠে আসতে আসতে নায়িকা নিজের দীর্ঘ চুলগুলোকে বুকের দিকে টেনে আনে। ফের ক্লোজ আপ। নায়িকার মুখে এক রাশ দুশ্চিন্তা, 'ইস, লোনা জল আর ভেজা বালিতে আমার চুলগুলোর কি দশাই না হয়েছে!'

'কোনো চিন্তা নেই, মিস গুহ!' ক্যামেরার লেন্স এবারে পরিচালক ভদ্রলোকের দিকে স্থির হয়েছে। সহকারীর সাইড ব্যাগ থেকে উনি একটা কন্টেনার বের করে নায়িকার দিকে তুলে ধরলেন, 'আমি আপনার জন্যে ইডেন শ্যাম্পু নিয়ে এসেছি। এর কোমল স্পর্শে আপনার চুল নতুন জীবন ফিরে পাবে। আরও সতেজ, আরও মোলায়েম হয়ে উঠবে। এতে কণ্ডিশনারও মেশানো আছে।'

পরবর্তী দৃশ্য। বাথটবে অর্ধশায়িত নায়িকা। মাথায় ব্যবহৃত শ্যাম্পুর ফেনাময় ঐশ্বর্য। সমুদ্রের ফেনার মতো নিষ্কলঙ্ক। অবাধ। অজস্র। নায়িকার মুখে আন্তরিক পরিতৃপ্তি। ক্যামেরা ঘুরে যায়। তাকে সাজানো ইডেন শ্যাম্পু।

পরবর্তী দৃশ্য। বাংলোর বাগানে হেঁটে বেড়াচ্ছে নায়িকা। চলাব তালে তালে আর বাতাসের মৃদুল দোলায় নেচে নেচে উঠছে ওর মুক্ত কেশকলাপ। রেশমের মতো কোমল ও মসৃণ। বাউনসিং। মিষ্টি হেসে ক্যামেরার দিকে মুখ ঘোবায় ও, 'শুটিং করার সময় আমার চুলকে অনেক দৌরাত্ম্যি সহ্য করতে হয়। কিন্তু ইডেন শ্যাম্পু আমার চুলের কোনো ক্ষতি হতে দেয় না। এর ভেষজ গুণে চুল ক্রমশ আরও সুন্দর ও সতেজ হয়ে ওঠে।'

টেলিভিশন বন্ধ করে জানলার পর্দা সরিয়ে দিলো প্রদীপ, 'ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ, ঠিকই আছে,' কফির পেয়ালায় শেষ চুমুক দিলো অনুভব।

'সান্যাল সাহেবের মুখ বন্ধ করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট, তাই না?'

'লেট আস হোপ সো। তবে সেটাই কিন্তু একমাত্র কনসিডারেশন হওয়া উচিত নয়।'

দিব্যা অনুভবের পেছন পেছন ওর ঘরে এসে ঢোকে।

'আমি আপনার মুখ দেখেই বুঝেছি।'

'কি, দিব্যা?'

'ফিল্মটা আপনাকে একশো ভাগ খুশি করতে পারেনি। রাইট?'

'রাইট।'

'বাট হোয়াই?'

'বোঝানো শক্ত। তবে মিউজিকটা একটু লাউড। আর একটু ডেপথ থাকলে ভালো হতো। আর নায়িকা ... ' কথা বলতে বলতে ফের সিগারেট ধরায় অনুভব, 'মেয়েটি তো বম্বের, তাই না?'

'হ্যাঁ, দু বছর আগেকার মিস ইণ্ডিয়া।'

'কি যেন নাম?'

'প্রিয়া, প্রিয়া বনশাল। ভীষণ চুজি মেয়ে। পছন্দ না হলে কাজ নেয় না।'

'আই সি। তবে আমি ডিরেকটার হলে সম্ভবত ওকে সিলেকট করতাম না।'

'সেকি! কেন?'

'শি শুড বি মোর ইনোসেন্ট অ্যাণ্ড নেইভ। তুমি কি বুঝতে পারছো, আমি কি বলতে চাইছি? আমার ধারণা এ মেয়ে, মানে প্রিয়া, নিজের সম্পর্কে খুব বেশি কনশাস। কিন্তু আমাদের আদিম মানবী—সে কিন্তু নিজের সম্পর্কে কিছুই জানে না। তার কোনো ধারণাই নেই নিজের সৌন্দর্য সম্পর্কে। তাই না?'

'মাই গড! আপনি তো ফিল্ম লাইনে গেলে হৈচৈ ফেলে দিতেন!'

'কিস্যু হতো না। আমার ফিল্ম হয়তো কোনোদিন কমপ্লিটই হতো না। পারফেকশনিস্টদের নিয়ে কিছু করা খুব মুশকিল। তবে এ ক্ষেত্রে আমি হলে হয়তো ... হয়তো ... '

দিব্যার দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকায় অনুভব। শান্ত, স্নিগ্ধ, বুদ্ধিদীপ্ত। অথচ ওর ধারালো চেহারায় এক ধরনের বন্যতা আছে, যা অভিজ্ঞ দৃষ্টিকে এড়িয়ে যেতে পারে না। পোশাক পরিচ্ছদে ভদ্র ও শালীন, কিন্তু যৌবনের প্রখর ঐশ্বর্যকে অনাবশ্যক আড়াল করে রাখার কোনো সযত্ন ও হাস্যকর প্রয়াস নেই। এটা কি কনশাসনেসের অভাব, নাকি সুচিন্তিত উদাসীনতা?

'আপনি হলে কি করতেন?' প্রশ্ন করে দিব্যা।

'আমি হলে রোলটা সম্ভবত তোমাকে অফার করতাম। রাজি হতে?'

'ওয়েল, অ্যায়্যাম ফ্ল্যাটার্ড!' দিব্যার মুখ লাল হয়ে ওঠে, 'তার ওপরে আবার বস্ বলে কথা।'

'বস যদি আরও কিছু প্রস্তাব দেয়?' একটু দুষ্টুমি করার লোভ সামলাতে পারে না অনুভব।

'ভেবে দেখতে হবে,' পাহাড়ী ঝর্নার মতো শরীর কাঁপিয়ে রিমঝিম সুরে হেসে ওঠে দিব্যা। 'এবারে আমি চলি, হাতে অনেক কাজ।'

দরজা অব্দি এগিয়ে গিয়ে ফের ঘুরে দাঁড়ায় দিব্যা, 'ভালো কথা, চা কোম্পানির প্রেস রিলিজটা বোধহয় আর একবার দেখা দরকার। ফাইনাল লে-আউটটা আমার কেন জানি না খুব একটা পছন্দ হয়নি। সময় হলে বলবেন।'

'আচ্ছা।'

দিব্যা বেরিয়ে যায়। দু চোখ দিয়ে ওর ঋজু শরীরটাকে অনুসরণ করতে করতে অনুভব অন্যমনস্ক হয়ে ওঠে আচমকা। দিব্যা আর প্রদীপ—দুজনেই কোম্পানির লেটেস্ট রিক্রুট। অসংখ্য প্রার্থীর মধ্যে থেকে বাছাই হয়ে ওরা সিগমা ফ্যামিলিতে প্রবেশের অধিকার পেয়েছে। দুজনেরই অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার ব্রিলিয়ান্ট। কিন্তু সেটাই সব নয়। পরীক্ষায় ভালো ফল করে এসেও অনেকে বাস্তব জীবনে তেমন সুবিধে করতে পারে না। তার কারণও থাকতে পারে বহুবিধ। কিন্তু মনে হয়, এদের মেটিরিয়াল আলাদা। দুজনেই যথেষ্ট ইনটেলিজেন্ট, পরিশ্রমী এবং সব চাইতে বড়ো কথা ওরা নিজেদের কাজকে ভালোবাসে। সঠিক গ্রুমিং হলে একদিন এরা অনেককেই কাঁপিয়ে দেবে। অনুভবের কি সেদিন পার্থ সান্যালের মতো অবস্থা হবে? একেবারেই না। তার অনেক আগেই সে এই মরবিড র‍্যাট রেস থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবে।

তবে প্রদীপ বা দিব্যার সম্পর্কে তেমন মিন জেলাসি অনুভবের মনে সম্ভবত

কোনোদিনই আসবে না। ওদের ব্যাপারে তার মনে কখন যেন নিজের অজান্তেই একটা কোমল অনুভূতি গড়ে উঠেছে। ওরাও তাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে এবং ভালোবাসে—যেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার কোনো প্রয়োজন হয় না। মাঝে মাঝে অনুভব তাই আন্তরিক জিজ্ঞাসা নিয়ে ভাবতে চেষ্টা করে—সম্পর্ক থেকে অনুভূতি গড়ে ওঠে, না কি অনুভূতি থেকেই জন্ম হয় সম্পর্কের। কিন্তু শেষ অব্দি এর কোনো পরিণতি খুঁজে পায়নি অনুভব। প্রশ্নটা আজ অব্দি তাই অমীমাংসিতই থেকে গেছে বিশ্বস্ত অনিবার্যতায়।

ঝড়ের গতিতে কেটে গেলো সারাটা দিন। সান্যাল সাহেব ইডেন শ্যাম্পুর ভি.ডি.ও. ক্যাসেটটা রিলিজ করে দিয়েছেন, তবে বাহুল্যবোধে মৌখিক কোনো মতামত প্রকাশ করেননি। অনুভবই বরঞ্চ উপযাজক হয়ে ফিল্মের ডিটেইলসের ব্যাপারে কয়েকটা পয়েন্ট উল্লেখ করে ওঁর সাজেশনস জানতে চেয়েছিলো। উনি নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলেছেন, 'ইচ্ছে করলে কিছু পরিবর্তন বা পরিমার্জন করা যায়, তবে না করলেও দিব্যি চলে যাবে। মডেলটিকে ভালোই এক্সপ্লয়েট করা হয়েছে।' খোঁচাটা খেয়েও অনুভব তারপর আর প্রসঙ্গটা নিয়ে অনর্থক ঘাঁটাঘাঁটি করতে চায়নি। কারণ আপাতত এ ব্যাপারটা ঘাড় থেকে নামলে, চায়ের ব্যাপারটাতে নজর দেওয়া সম্ভব হবে। গতবারের ক্যাম্পেইন গোল্ডেন টি কোম্পানিকে তেমন খুশি করতে পারেনি। মার্কেট সার্ভের ফলাফলও সন্তোষজনক নয়। এবারেও তেমন কিছু হলে অ্যাকাউন্টটা অকালে বেহাত হয়ে যাবার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকবে। মরিসন অ্যাণ্ড কাম্বলে বহুদিন ধরেই ওত পেতে রয়েছে। সুযোগটা যেচে ওদের হাতে তুলে দিলে সিগমার সুনাম বাড়বে না, বোর্ডের কাছেও জবাবদিহি দিতে হবে। কপি রাইটার আর আর্টিস্টকে নিয়েই অনেকটা সময় কেটে গেলো। ওদিকে প্রদীপ কি একটা কাজে গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছে, ফেরার নাম নেই। সাড়ে তিনটে নাগাদ অনুভব নিজেই দিব্যাকে বললো, 'তোমাদের লাঞ্চের প্রোগ্রামটা নেক্সট উইকের আগে মেটিরিয়ালাইজ করবে বলে মনে হচ্ছে না।' দিব্যা হেসে বললো, 'নেভার মাইণ্ড!'

সাড়ে চারটে নাগাদ হঠাৎ সুদূরের ফোন।

'অনুভব, তোর সঙ্গে আমার ভীষণ দরকার। কবে কোথায় এবং কখন তোর দেখা পাওয়া যাবে, এক্ষুনি বল।'

জবাব দেবার জন্যে একটু কি বেশি সময় নিলো অনুভব? মুহূর্তের অবকাশেই কি যেন আঁচ করার চেষ্টা করলো সে। তারপর উলটে প্রশ্ন করলো, 'তুই কবে কখন এবং কোথায় দেখা করতে চাস?'

'অবশ্যই কারুর বাড়িতে নয়।'

'আমার অফিসে?'

'নট আ ব্যাড আইডিয়া। কিন্তু তোর কাজ?'

'যাতে ব্যাঘাত না হয়, তার ব্যবস্থা করে রাখবো।'

'তাহলে বাকি রইলো কবে এবং কখন।'

'যদি বলি আজ, এখুনি?'

'আমি চলে আসছি। যতো শীগগিরি হয়।'

'আয়। আমি অপেক্ষা করছি।'

টেবিলের কাগজপত্র গুছিয়ে নিতে তৎপর হলো অনুভব। রিসিভার তুলে অপারেটার শম্পা দেবনাথকে জানিয়ে দিলো, তার কোনো অফিসিয়াল কল এলে যেন নট অ্যাভেইলেবল বলে দেওয়া হয়। তারপর ইন্টারকমে ডেকে পাঠালো দিব্যাকে। দিব্যাকে দেখেই বোঝা যায়, বেচারী ভীষণ ক্লান্ত—বাড়িতে গিয়ে শুয়ে পড়তে পারলে বাঁচে। মায়া হলো অনুভবের। বললো, 'তোমাকে একটু ট্রাবল দেবো, দিব্যা। এখুনি আমার এক বন্ধু আসবে। তার সঙ্গে আমার কিছু কথাবার্তা আছে। ব্যক্তিগত এবং জরুরি। তারপর হয়তো একসঙ্গেই বেরিয়ে যাবো। ইতিমধ্যে তেমন কোনো দরকার হলে, তুমি একটু ম্যানেজ করে দিও। ডেফার ইট টিল টুমরো। কেমন?'

'ঠিক আছে।'

'আর যাবার সময় তুমি আমার বেয়ারাকে একটু বলে যেও, বন্ধুটি আসার পর কেউ যেন ঘরে এসে আমাকে বিরক্ত না করে।'

'আচ্ছা।'

'একটা সিগারেট নেবে নাকি?'

'নাঃ', লজ্জা পেলো দিব্যা।

'কেন, বোঝা বাড়িয়ে দিলাম? রাগ হয়েছে?'

'না না, আসলে মাথাটা একটু টিপটিপ করছে।'

'মাথার আর দোষ কি?' কবজি ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখলো অনুভব, 'প্রায় পাঁচটা। হোয়াই ডোন্ট ইউ গো? সামন্ত তো রয়েছে।'

'ছোট্ট একটা কাজ রোজই বাকি থেকে যাচ্ছে। ভাবছি আজ ওটা নামিয়ে সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বেরুবো।'

'কাজ কখনও ফুরোয় না, মাই ডিয়ার। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে হয়, বুঝেছো?'

'বুঝলাম।'

'কি বুঝলে?'

'এই মুহূর্ত থেকে আপনি ভীষণ ব্যস্ত। ডিসটার্ব করা নিষেধ।'

'একজাক্টলি,' অনুভব হাসলো।

মিনিট পনেরোর বেশি অপেক্ষা করতে হয়নি। কিন্তু সুদূরকে দেখে মনে মনে চমকে উঠলো অনুভব। সেই সুন্দর সুঠাম শরীর, অথচ মুখটা রীতিমতো কালো। রোদ, না মানসিক যন্ত্রণা? অনুভবের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠলো। তবু মুখে সামান্য হাসির প্রশ্রয় ফুটিয়ে তুললো অনায়াসে।

'আয়, বোস।'

সুদূর চেয়ার টেনে বসলো। দেখে মনে হয় বেশ অবসন্ন। হঠাৎ অনুভবের মনে হলো, ঘরটা অতিরিক্ত ঠাণ্ডা হয়ে রয়েছে। আর কিছুক্ষণ এভাবে চললে রীতিমতো শীত করবে। তাছাড়া সুদূর সবেমাত্র বাইরের গরম ঠেলে এই হিমঘরে এসে ঢুকেছে। আচমকা ওর ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। চেয়ার ছেড়ে উঠে, নব ঘুরিয়ে ঠাণ্ডি-মেশিন বন্ধ করে দিলো অনুভব। তারপর একটা সিগারেট ঠোঁটে

ঝুলিয়ে প্যাকেটটা এগিয়ে দিলো সুদূরের দিকে।

'গরম খাবি, না ঠাণ্ডা?' লাইটার ধরিয়ে জিগেস করলো অনুভব।

'যা হোক কিছু হলেই হয়। গলা শুকিয়ে গেছে।'

'তাহলে চা হোক। আমাদের ক্লায়েন্টের চা। দারুণ। তাছাড়া গ্রীষ্মের তেষ্টা মেটাতে, ঠাণ্ডা পানির চাইতে গরম চা বেশি প্রেফারেবল।'

'তোকে কি বিরক্ত করলাম?' আলটপকা প্রশ্ন করলো সুদূর।

'ন্যাকামো করিস না।'

'জবাবটা দিতে তোর আপত্তি আছে?'

'না,' মৃদু হাসলো অনুভব। 'তবে প্রশ্নটা অপ্রয়োজনীয়।'

'তবু?'

'বিরক্ত কবার অধিকার তোর আছে। তবে তুই নিশ্চিন্ত থাক, আমি একটুও বিরক্ত হইনি। বরং ভালো লাগছে।' বেয়ারাকে চায়ের ফরমাশ দিয়ে রিল্যাক্সড হয়ে বসলো অনুভব, 'তারপর বল, তোর অফিসের কি খবর?'

'অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন।'

'কেন?'

'অফিসের কথা আমি সব চাইতে কম ভাবি। ভাবতে ভালো লাগে না। অ্যাকচুয়ালি ওটা ছাড়তে পারলে বেঁচে যেতাম।'

'ছেড়ে কি করবি? ব্যবসা?'

'ধুস, ওসব আমার আসে না।'

'তাহলে কি সন্ন্যাসী হবি?'

'হতে পারলে ভালো হতো। যাকগে—' ছোটো করে একটা নিঃশ্বাস ফেললো সুদূর, 'তোকে যা বলতে এসেছি ... '

'আগে বল, তোবা কেমন আছিস,' অনুভব ওর মুখের কথা কেড়ে নিলো। 'তোকে যেন একটু ডাউন বলে মনে হচ্ছে?'

'না, আমি ভালোই আছি। তবে ... '

'রূপসা ভালো তো?'

সুদূরের মনে হলো, অনুভব ইচ্ছে করেই বারবার আসল প্রসঙ্গটাকে পিছিয়ে দিচ্ছে। ও কি কিছু জানে? রূপ কি কিছু বলেছে ওকে? ওরা দুজনে অন্তরঙ্গ বন্ধু, কাজেই সেটা অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু সুদূর মরে গেলেও অনুভবকে তা জিগেস করতে পারবে না।

'ভালোই বোধহয়। তোর আর কোনো প্রশ্ন আছে?'

'মানে?'

'আজ আমি একটা বিশেষ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে তোর কাছে এসেছি। উইল ইউ প্লিজ গিভ মি আ পেশেন্ট হিয়ারিং?'

'অফ কোর্স! কিন্তু তুই এতো তাড়াহুড়ো করছিস কেন? ঠাণ্ডায় বসে শরীরটাকে একটু জুড়িয়ে নে, চায়ে চুমুক দিয়ে গলাটা একটু ভেজা। তারপর আমি তো রইলামই!'

হীরালাল চা নিয়ে এলো। কাপে চুমুক দিয়ে সিগারেট ধরালো সুদূর। ফের একটা চুমুক। তারপর ফের সিগারেটে একটা টান দিয়ে খানিকক্ষণ অনুভবের দিকে তাকিয়ে রইলো শূন্য দৃষ্টিতে।

'অনুভব?'

'তোর অসুবিধে না হলে এবারে বলতে শুরু কর। অসুবিধে হলে আরও খানিকটা সময় নিতে পারিস।'

'না!' শিউরে উঠলো সুদূর, 'না, অনুভব। বেশি সময় নিলে শেষ অব্দি আমি হয়তো কিছুই বলতে পারবো না। তোকে সবকিছু খুলে বলার জন্যে আমি আজ সকাল থেকে প্রস্তুতি নিয়েছি, নিজেকে চার্জড করে রেখেছি। আমি জুড়িয়ে যেতে চাই না।'

অনুভব নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকে।

'অনুভব, আমি ... আমি ডিভোর্স চাই। উইল ইউ প্লিজ হেলপ মি?'

অনুভবের কি চমকে ওঠা উচিত? বোধহয়। কিন্তু সে তা পারলো না। শুধু তার ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠলো সামান্য।

'মানে?'

'তুই রূপসার খুব বন্ধু। আমি জানি। তুই একটু বুঝিয়ে বললে. ও হয়তো ... '

'রাবিশ!' আচমকা ফেটে পড়লো অনুভব, 'এটা তুই আশা করিস কি করে? তাছাড়া তুই কি তোর বউকে চিনিস না? কেউ কিছু বোঝাতে চাইলে ও কি নির্বিবাদে তা মেনে নেবার মতো মেয়ে?'

'কিন্তু আমি ওর জীবনটাকে নষ্ট করে ফেলতে পারি না। আই ফিল গিলটি।'

'কি রকম?'

'অনেক দিন আগে, বলতে পারিস নিতান্তই বালক বয়সে, আমার একবার হাম হয়েছিলো। আপাতদৃষ্টিতে নেহাতই একটা হার্মলেস রোগ, বলতে গেলে প্রায় প্রত্যেকেরই হয়। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে সেটা আর হার্মলেস হয়ে থাকেনি। ওই রোগের অভিশাপে আমি জন্ম দেবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলি। বেশ কিছুদিন পর্যন্ত এটা আমি জানতাম না, আমার কাছ থেকে তা লুকিয়ে রাখা হয়েছিলো। কিন্তু একদিন পুরনো কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে আমি দৈবাৎ ব্যাপারটা জানতে পারি। যেদিন জানলাম, সেদিন গোটা দুনিয়াই আমার কাছে অর্থহীন হয়ে গিয়েছিলো। প্রথমে ভেবেছিলাম পাগল হয়ে যাবো। কিংবা আত্মহত্যা করবো। কিন্তু শেষ অব্দি এর কোনোটাই হয়নি। কারণ প্রথমটা আমার হাতে ছিলো না আর দ্বিতীয়টা করতে সাহস হয়নি—ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু তার পর থেকে আমি নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিতে শুরু করি। মা আর দিদি যা বলতো, আমি চোখ বুজে তাই করতাম—নিজের ওপরে কোনো আস্থা ছিলো না। ডুবে থাকতাম পড়াশুনো আর গানবাজনার মধ্যে। ভেবেছিলাম, এভাবেই কেটে যাবে জীবনটা। কিন্তু তা হলো না। এড়াতে চাইলেও শেষ অব্দি রূপসাকে আমি ফেরাতে পারলাম না। একদিন ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেলো। এটা আমার জীবনের একটা চরম ভুল, অনুভব। শুধু ভুল নয়, অন্যায়। আমার এ অপরাধের কোনো ক্ষমা

নেই। লজ্জায়, ঘেন্নায়, দুঃখে এখন আমি আরশিতে নিজের মুখের দিকে তাকাতে পারি না। কিন্তু এভাবে আর চলে না, চলা উচিত নয়। তাই ... তাই আমি ওকে মুক্ত করে দিতে চাই।'

কিছুক্ষণ দুজনেই নির্বাক হয়ে বসে রইলো। সময় ক্লান্ত স্তব্ধতা মেখে স্থবির হয়ে রইলো সুরভিত এয়ার কণ্ডিশনড কেবিনে।

'তোকে আমি কয়েকটা কথা জিগেস করতে পারি?' প্রশ্ন করলো অনুভব।

'কি?'

'তোর কিন্তু শুনতে ভালো লাগবে না।'

'ইটস অল রাইট।'

'তুই তোর অক্ষমতার খবরটা জানতিস। তা সত্ত্বেও তুই রূপসার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিলি। কেন?'

'ভালো লাগতো। ওর কাছাকাছি থাকলে নিজেকে আমার একটা পরিপূর্ণ মানুষ বলে মনে হতো, বয়স্ক শিশু বলে মনে হতো না। মনে হতো, পৃথিবীর কাছে আমারও একটা প্রয়োজন আছে।'

'তখন কি তোর একবারও মনে হয়নি যে তুই একটা প্রচণ্ড অন্যায় করছিস? একটা স্বার্থপরের মতো কাজ করছিস?'

'হয়েছে, বারবার মনে হয়েছে। অনেকবার ভেবেছি, ওকে সবকিছু খুলে বলবো। ওর জীবন থেকে দূরে সরে যাবো। কিন্তু পারিনি, কিছুতেই পারিনি।'

'কেন?'

'আমার ভয় করতো। মনে হতো, রূপসা সব জানলে আমার দিকে আর ফিরে তাকাবে না। আমার কাছে ও চিরদিনের মতো হারিয়ে যাবে। অথচ ও বিয়ের জন্যে তাগাদা দিচ্ছিলো। তাই আমি বারবারই নানান অজুহাতে বিয়েটা পিছিয়ে দিচ্ছিলাম।'

'বিবেকবোধ?' অনুভবের ঠোঁট বিদ্রূপে বঙ্কিম হয়ে ওঠে।

'হয়তো তাই। কিংবা ভয়—চরম লজ্জিত হবার ভয়।'

'তারপর?'

'তারপর একদিন মরিয়া হয়ে ওকে সবকিছু বলে ফেললাম। শুনে ও অবাক হলো, না আঘাত পেলো—বুঝতে পারলাম না। কিন্তু বিয়েটা ও কিছুতেই ভেঙে দিতে রাজি হলো না।'

'আর তুইও তখন বাধ্য হয়ে লক্ষ্মী ছেলের মতো সুরসুর করে ওকে বিয়ে করে ফেললি। তাই না?'

'বলতে পারিস।' সুদূর গাঢ় চোখে অনুভবের দিকে তাকায়, 'আমি জানি তুই আমাকে ক্ষমা করতে পারবি না। কোনোদিনও না। তবু রূপসার কথা ভেবে তুই আমাকে একটু সাহায্য কর। প্লিজ।'

'শোন সুদূর, বিয়ের পরেও অসুখ বা দুর্ঘটনায় কোনো কোনো মানুষের শারীরিক ক্ষতি হয়। কারুর হাত অবশ হয়ে যায়, কারুর পা কাটা পড়ে, কারুর দৃষ্টিশক্তিও নষ্ট হয়ে যায়। এগুলোর কোনোটাই কিন্তু ডিভোর্সের পক্ষে উপযুক্ত কারণ হতে

পারে না।'

'কি বলছিস তুই পাগলের মতো?' সুদূর উত্তেজনায় নড়েচড়ে বসে, 'এটা হাত পা বা চোখের প্রশ্ন নয়, এটা উর্বরতার প্রশ্ন—যেটা বিবাহিত জীবনের একটা ভাইটাল পার্ট!'

'কথাটা তোর বিয়ের আগে মনে হয়নি কেন?'

'হয়েছিলো, কিন্তু তখন এতোটা ভেবে দেখিনি। এখন যতোই দিন যাচ্ছে, মনে হচ্ছে রূপসাকে আমি সারা জীবন এভাবে বঞ্চিত করে রাখতে পারি না। আমার একটা কিছু করা উচিত।'

লায়ার! এখনও ও পাশ কাটাবার চেষ্টা করছে, ভাবলো অনুভব। আচ্ছা, দেখা যাক তুমি কতোটা খেলতে পারো সুদূর মুখার্জি।

'কিন্তু সন্তান তো অনেকেরই হয় না,' অনুভব নির্বিকার মুখে বললো। রূপসার কোনো ত্রুটির জন্যেও এটা হতে পারতো। তখন কি তুই এই একই লাইনে চিন্তা করতিস?'

'কথাটা তা নয়। তুই কেন একটু বোঝার চেষ্টা করছিস না?'

'আমি তো চেষ্টা করেও কিছু বুঝতে পারছি না! রূপসা কি বাচ্চার জন্যে ক্ষেপে উঠেছে?'

'একটা মেয়ের পক্ষে সেটা কি অন্যায়?'

'না। কিন্তু মেয়েটা রূপসা, তাই এটা মেনে নিতে অসুবিধে হচ্ছে। তাছাড়া ডিভোর্সই এ সমস্যার একমাত্র সমাধান নয়। তোরা দত্তক নিতে পারিস। কিংবা কোনো ভালো ডাক্তারের হেলপ নিয়ে ওকে আর্টিফিশিয়ালি কনসিভ করানো যেতে পারে। তাই নয় কি?'

খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলো সুদূর। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কষ্ট হলো অনুভবের। মাথা নিচু করে পরাজিত সম্রাটের মতো বসে রয়েছে মানুষটা। কি ভাবছে ও এখন? ভাবছে, এখানে এসে ভুল করেছে? চলে গেলেই পারে? কিন্তু চলে গেলেও আজ তুই আমাকে এড়াতে পারবি না, সুদূর। আই প্রমিস—আমার পক্ষে তা যতোই অপ্রীতিকর হোক না কেন।

'কি রে, কিছু বলছিস না যে?' অনুভব ফের বললো, 'তুই আমাকে বোঝাবার চেষ্টা কর, সুদূর। আমি প্রাণপণে বুঝতে চেষ্টা করবো। আমি কিন্তু ব্লান্ট নই।'

সুদূর তবুও নিশ্চুপ নিস্পন্দ।

'কি হলো, কিছু বলবি না?'

'বিয়ের পরে আমি নিজের সম্পর্কে আরও একটা ভয়ঙ্কর তথ্য আবিষ্কার করেছি, অনুভব।'

নাউ! নাউ কাম টু দ্য পয়েন্ট! অনুভবের সমস্ত শরীর ঋজু হয়ে ওঠে। কনফেস ইট।

'সেটা কি?' প্রশ্ন করে অনুভব।

'একদিন ... না, ঠিক তা নয়—বিয়ের প্রথম দিনই, একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে আবিষ্কার করলাম, নিজের অজান্তে আমি কবে যেন ইমপোটেন্ট হয়ে গেছি। ইয়েস,

দ্যাট ইজ দ্য ওয়ার্ড—ইমপোটেন্ট।' মুহূর্তের জন্যে নিচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরে সুদূর। ঠাণ্ডা ঘরে বসেও বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে ওর কপালে। 'নারী সংসর্গ করার কোনো ক্ষমতাই আমার নেই, অনুভব। আয়্যাম নো মোর আ ম্যান—নট অ্যাট অল আ ম্যান। ভাবতে পারিস? নিজেকে তুই একটা ইউনাক বলে কল্পনা করতে পারিস? এর পরেও কি তুই বলবি রূপসাকে আমার বেঁধে রাখা উচিত?'

সুদূরের চোখ দুটো জলে ছলছল করে ওঠে।

অনুভবের রাগ হয়। দুঃখ হয়। দুঃখ সুদূরের জন্যে, রূপসার জন্যে। এবং কি আশ্চর্য, তার নিজের জন্যেও! নিজেকে বড়ো অসহায় বলে মনে হয় তার। সে জানে, সমস্ত সাধারণ মানুষের মতো সুদূরও খানিকটা লোভী এবং স্বার্থপর। তাই সবকিছু জেনেবুঝেও সে রূপসার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিলো। কিন্তু রূপসাকে আন্তরিক ভালোবাসে বলেই ওকে সে বিয়ে করতে চায়নি, এড়াবার চেষ্টা করেছে। এড়াতে যে পারেনি, তার আসল কারণ ওর চরিত্রের অমোঘ দুর্বলতা এবং রূপসার প্রবল ব্যক্তিত্ব ও একগুঁয়েমি। নিজের অক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন ছিলো বলেই সুদূর লেখাপড়া ও গানবাজনার একটা শক্ত খোলস তৈরি করে, তার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলো। শামুকের মতো খোলসের নিচে সর্বদা সে ভয়ে ভয়ে থাকতো, পুরোপুরি খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসার সাহস সে কোনোদিনই সঞ্চয় করে উঠতে পারেনি। সম্ভবত এ জন্যে অনেকটাই দায়ী তার মা এবং দিদি। অক্ষমের প্রতি অত্যধিক স্নেহ ও অবধারিত করুণায় চিরদিন ওঁরা সুদূরকে আগলে আগলে বড়ো করে তুলেছেন আর নিজের অজান্তে সুদূর একটু একটু করে ওঁদের হাতের খেলনা হয়ে উঠেছে। সুদূরের জন্যে ওঁরা হয়তো একটি পুতুল-পুতুল, শান্ত-ভীরু গোছের মেয়েকেই বউ করে আমাকে চেয়েছিলেন—যে পুতুল বাইরের পৃথিবীর হাতছানি দেখতে জানবে না, যে পুতুল রাগ করবে না, অভিযোগ জানাবে না, নিজের ভাগ্য ছাড়া অন্য কাউকে দোষারোপ করবে না, বিদ্রোহী হবার কল্পনা যার স্বপ্নেরও সীমার বাইরে। কিন্তু ওঁদের সে স্বপ্ন সফল হয়নি। শেষ অব্দি রূপসাই মুক্ত পৃথিবীতে ছিনিয়ে এনেছে সুদূরকে।

কিন্তু তাতে কি লাভ হলো, রূপসী? তুমি তো একটা গোটা পুরুষকে আপন করে পেতে চেয়েছিলে, তুমি তো কোনো খেলনা চাওনি! অথচ এখন সুদূর নিজেই তোমার প্রতিপক্ষ। তবু আজ, এতোদিন বাদে এই প্রথম, সুদূরকে আমার মেরুদণ্ডি প্রাণী বলে মনে হচ্ছে। অনেক দেরিতে হলেও এখন ও মেরুদণ্ডটাকে সোজা করে তুলতে চেষ্টা করছে।

'অনুভব?'

'বল।'

'যদি বুঝতাম রূপসা আমার কাছে যা পাচ্ছে না, অন্য কোনো ঘনিষ্ঠ পুরুষের কাছ থেকে তা পুষিয়ে নিচ্ছে, নিজেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে রাখছে না—তাহলে খারাপ লাগলেও আমি বোধহয় খুশি হতাম।'

'ভেরি কনসিডারেট হাজব্যাণ্ড!' অনুভব বিদ্রূপের খোঁচা মারলো।

'মানে, আমি বলতে চাইছি যে, তাহলে আমার নিজেকে বোধহয় এতোটা দোষী বলে মনে হতো না।' এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে অনুভবের চোখের দিকে তাকালো সুদূর, 'তুই কি বুঝতে পারছিস, আমি কি বলতে চাইছি?'

'বুঝলাম।'

'তুই কিছু বলবি না?'

'কি বলবো? সিদ্ধান্ত নেবার মালিক তো শুধু তোরা দুজন।'

'তবু কিছু অন্তত বল। প্লিজ।'

'তুই কোনো ডাক্তারের সঙ্গে এ ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করেছিস?'

'কোনো লাভ নেই।'

'কি করে বুঝলি? তুই কি সর্বজ্ঞ?'

'না, তা নয়।'

'তবে?'

'এ রোগ সারে না, অনুভব।' সুদূরের কণ্ঠস্বর আর্তনাদের মতো শোনায়, 'ফাইনাল জাজমেন্টের মতো এর কোনো নড়চড় হয় না।'

'হাউ ডু ইউ নো? এ কথা তোকে কে বলেছে?'

'আমি জানি।'

'কিন্তু কি করে জানলি? কোনো ডাক্তারের মুখ থেকে তুই কিছু শুনিসনি। তাহলে কি ধরে নিতে হবে যে এ ব্যাপারে তুই কোনো দৈববাণী শুনেছিস?' একটু থেমে অনুভব নরম গলায় বললো, 'এমনও তো হতে পারে, তুই যা মনে করেছিস এটা আদৌ সে রোগ নয়?'

'কাউকে মিথ্যে আশা দিতে নেই, অনুভব। নিজের মনকে তো কখনই নয়।' সুদূর ম্লান হাসলো, 'তাছাড়া আমি চাই না ... '

'কি চাস না? আচ্ছা, তোর নিজের কথাটা না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু তুই কি রূপসাকে সুখী করার চেষ্টা করতে চাস না?'

'তা নয়, তা নয় অনুভব।' ডান হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে থাকা পেপার ওয়েটটাকে বাঁ হাতে চালান করে দিয়ে সিলিঙের দিকে তাকায় সুদূর, 'আমি নিজের দুর্বলতার কথা, অক্ষমতার কথা, জনে জনে অমন করে যেচে যেচে শোনাতে চাই না। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি মার্কড টু ট্যু মেনি পার্সনস। এর মধ্যে ডাক্তারও ইনক্লুডেড। কারণ তারাও মানুষ। তারাও আমাকে দেখে মনে মনে হাসবে, হয়তো সহানুভূতিও দেখাবে। এবং আজ এক ডাক্তারের কাছে গেলে, আমি জানি, কাল আমাকে ফের আর একজন ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। তার পরদিন আবার আর একজন। এইভাবেই জানাজানি বাড়বে, হাসাহাসি বাড়বে, সহানুভূতির বোঝাও বাড়বে—এর অন্য কোনো বিকল্প নেই, থাকতে পারে না। কিন্তু আমি কারুর সিমপ্যাথি চাই না। বাট প্লিজ ট্রাই টু এমপ্যাথাইজ মি, উইল ইউ?'

উত্তেজনায় টান টান হয়ে ওঠা শরীর নিয়ে অনুভবের জবাবের প্রত্যাশায় স্থির হয়ে বসে থাকে সুদূর। যেন অনুভবের জবাবের ওপরেই নির্ভর করছে তার সমস্ত ভবিষ্যৎ, সারাটা জীবন। বুকের মধ্যে অস্পষ্ট দাগ কেটে যাচ্ছে অস্বস্তিকর সেই

চিনচিনে ব্যথা। অথচ অনুভব যেন ধ্যানস্থ ঋষির মতো নির্লিপ্ত। নির্বিকার।

'ঠিক আছে,' অবশেষে এক সময় ধ্যান ভাঙে অনুভবের, 'আমি তোকে সাহায্য করতে রাজি।'

'রিয়্যালি?' সুদূরের চোখ দুটোতে ম্লান হাসির ছোঁয়া লাগে। অনুভবের দিকে নিজের ডান হাতটা এগিয়ে দেয় সে, 'থ্যাংক ইউ!'

'কিন্তু তুই যেভাবে আশা করছিস, সেভাবে নয়।' অনুভব নিজের হাত বাড়ায় না। 'আমি অন্য কোনো পদ্ধতিতে তোকে সাহায্য করার চেষ্টা করতে পারি।'

'কি রকম?' সুদূরের এগিয়ে দেওয়া হাত অসহায়ের মতো ফিরে আসে।

'ডাক্তারের কথা আমি আপাতত তুলছি না। তার আগে আমি নিজে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নিতে চাই। কিন্তু সবই নির্ভর করছে তোর ওপরে।'

'আমার ওপরে?'

'হ্যাঁ।'

'মানে?'

'আমার একটা প্রশ্নের খোলাখুলি জবাব দিবি?'

'কি প্রশ্ন?'

'আমি কি তোর কাছ থেকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা পাবো?'

সুদূর কিছুই বুঝতে পারে না। অনুভবের প্রশ্ন যেন এক দুর্বোধ্য প্রহেলিকা। তাই তার নীরব অভিব্যক্তিতে শুধুমাত্র অবাধ বিস্ময় নিঃসঙ্কোচে খেলা করে।

চেয়ার ছেড়ে আস্তে আস্তে সুদূরের কাছে গিয়ে দাঁড়ায় অনুভব। তারপর ওর কাঁধে একটা হাত রেখে অস্ফুটে বলে, 'আমাদের পুরনো বন্ধুত্বের কথা মনে করে, আমাকে তুই একটা চেষ্টা করার সুযোগ দে সুদূর। প্লিজ!'

গত কয়েক দিনের মতো আজও দুপুর থেকে সাজ সাজ রব উঠেছিলো, ঘটা করে ক্রমশ মেঘ জমছিলো আকাশে। শনিবারের অফিস ফেরত এ কাজ সে কাজ করে রূপসা যখন বাড়িতে ফিরে এলো তখনও ঠিক বিকেল হয়নি, কিন্তু তার মধ্যেই প্রদোষের ছায়া নেমে এসেছে কলকাতার সর্বাঙ্গে।

সাধারণত শনিবার রূপসা অফিস থেকে সরাসরি বাড়িতে ফেরে না। কাজে বা অকাজে, কিংবা কাজের ছুতোয় ঘন্টা দুয়েক সময় ইচ্ছেমতো ঘুরে ঘুরে কাটিয়ে দেয় এখানে সেখানে। কখনও চৌরঙ্গি অঞ্চলে, কখনও বা গড়িয়াহাটে। কখনও সঙ্গে কেউ থাকে, কখনও স্রেফ একা। এটা ওর উইক এণ্ডের রিল্যাক্সেশন। কিন্তু সেই তুলনায় আজ ও যথেষ্ট তাড়াতাড়িই বাড়িতে ফিরেছে। ফেরার কারণ মোটামুটি দুটো। প্রথমত, সঙ্গে ছাতা ছিলো না। আসলে ছাতাটার যা চেহারা হয়েছে তাতে ওটা নিয়ে অফিসে গেলে প্রচুর আওয়াজ শুনতে হবে। তবু ওই রং-চটা পুরনো ছাতাটা ও প্রাণে ধরে যমুনাকে দিতে পারছে না। কারণ ছাতাটা তুহিনের দেওয়া। কবে যেন কি একটা কথার পিঠে তুহিন বলেছিলো, প্রতি বছর সে রূপসাকে একটা করে ছাতা প্রেজেন্ট করবে। প্রস্তাবটা হাস্যকর, সবাই শুনে হাসি ঠাট্টা করেছিলো, কিন্তু তুহিন তা গায়ে মাখেনি। এ ছাতাটা তিন বছর আগেকার। গতবারেরটা

কোথাও হারিয়ে গেছে, কিংবা কেউ চুরি করেছে। নতুন ছাতা হারিয়েও তখন খুব একটা দুঃখ পায়নি রূপসা, কারণ সেটা ওর খুব একটা মনোমতো ছিলো না। তাই ওই পুরনো ছাতাতেই দিব্যি কেটে গিয়েছিলো গত বছরটা। কিন্তু এ বছরে সেটা আর চালানো যাচ্ছে না। তুহিন এখনও এ ব্যাপারে আশ্চর্য নীরব, হয়তো ভুলেই গেছে ব্যাপারটা। বর্ষা শেষ হতে এখনও অনেক বাকি। তবু রূপসা নিজেও একটা ছাতা কিনে নিতে পারছে না। ভাবছে, নিজে কিনলে তুহিন হয়তো দুঃখ পাবে—এই সামান্য কারণে একটা মানুষকে দুঃখ দিয়ে কি লাভ! অথচ মুখ ফুটে তুহিনকে ও কিছু বলতেও পারছে না। বললে, তুহিন অবশ্যই কিছু মনে করবে না। বরং খুশিই হবে। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু চাওয়া রূপসার স্বভাবে নেই। তবে জোর করে কেউ কিছু দিলে, ও ভীষণ খুশি হয়।

তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফেরার দ্বিতীয় কারণ, অনুভব। গত বুধবার বেলা একটা নাগাদ সে অফিসে ফোন করে বলেছিলো, 'তোমার সঙ্গে আমার একটা ভীষণ জরুরি কথা আছে, রূপসী।'

'কি কথা?' জিগেস করেছিলো রূপসা।

'বললাম তো। জরুরি কথা।'

'বলো?'

'টেলিফোনে এভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়।'

'তাহলে?'

'আসছে শুক্রবার অব্দি আমি খুব ব্যস্ত থাকবো। অনেকগুলো মিটিং আছে। শনিবার তোমার সঙ্গে দেখা করা যাবে কি? একটু বেশি সময় দিতে হবে কিন্তু।'

'কোথাও গিয়ে বসতে চাও? কোনো রেস্তোরাঁয়?'

'আই ডোন্ট মাইণ্ড। তুমি যা বলবে।'

'ঠিক আছে,' একটু চিন্তা করে রূপসা বলেছিলো, 'তুমি বরং আমাদের বাড়িতেই চলে এসো।'

'কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে একটু একান্তে কথা বলতে চাইছি।'

'এতোদিন পরে? ব্যাপারটা কেমন একটু গোলমাল শোনাচ্ছে না?' রূপসা রসিকতা করেছিলো। 'তবে তোমার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। সুদূর শনিবারও রাত আটটা বাজিয়ে বাড়িতে ফেরে।'

'বেশ, তাহলে নেক্সট শনিবার আমি তোমাদের বাড়িতে যাচ্ছি কেমন?'

'কখন?'

'ধরো সাড়ে-তিনটে নাগাদ?'

'না। আমি ভর দুপুরে আমার বরের অনুপস্থিতিতে অন্য একটা পুরুষমানুষকে সঙ্গে নিয়ে এসে ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করলাম—এটা আমার প্রতিবেশীদের চোখে ভালো নাও লাগতে পারে।'

'তাই নাকি? কিন্তু আমি তো জানতাম, কে কি বললো না বললো তা নিয়ে রূপসী কখনও মাথা ঘামায় না।'

'তুমি ঠিকই জানো। তবে কিছু কিছু সময়ে, বিশেষ কোনো কারণ থাকলে,

মানুষকে একটু সতর্ক হয়ে চলতে হয়। বুঝেছো?'

'বুঝলাম। তাহলে?'

'তুমি বরং পাঁচটা নাগাদ এসো।'

'তখন প্রতিবেশীরা কেউ কিছু মনে করবে না?'

'সেটা আমি বুঝবো।'

'ঠিক আছে, তাহলে ওই কথাই রইলো। শনিবার বিকেল পাঁচটা। তাই তো?'

'হ্যাঁ, পাঁচটার এক মিনিটও আগে নয়।' রূপসার কণ্ঠস্বরে সুস্পষ্ট কৌতুকের সুর।

'অগত্যা!' সামান্য হেসে রিসিভার রাখতে গিয়েও অনুভব বলেছিলো, 'রূপসী, ইউ আর আনপ্রেডিকটেবল। ইউ আর আ বাণ্ডল অফ কনট্রাডিকশনস—ডু ইউ নো দ্যাট?'

কথাটা শুনে মৃদু রাগ হয়েছিলো রূপসার। রাগ কিংবা অভিমান। অনুভব কেন ওকে বুঝতে পারে না? কেন ওকে মুখ ফুটে বলে দিতে হবে যে রূপসাকে এখন একটা সরু সুতোর মতো পথ ধরে, দেহের ভারসাম্য বজায় রেখে, এক অনির্দিষ্ট উজানের উদ্দেশ্যে ক্রমাগত পা টিপে টিপে এগিয়ে যেতে হচ্ছে? ও কেন বোঝে না, এ এক বিপজ্জনক পথ চলা—এ চলার পথে অসতর্কতার কোনো ক্ষমা নেই?

আসলে অনুভবটা চিরদিন বোকাই রয়ে গেলো। বাস্তব বুদ্ধি একফোঁটাও নেই—আ বিগ জিরো। আসলে সর্বক্ষেত্রে ও বুদ্ধি খাটায় না, খাটাতে চায় না। ও মনে করে গোটা দুনিয়াই ওর নিজের মতো। অথচ সেটা যে একটা মস্তবড়ো ভুল, তা ও বুঝতে চায় না। আগে ওকে বোকা বললে, মাঝে মাঝে ক্ষেপে উঠতো। আজকাল হাসে। বলে, ও সব নাকি শুনে শুনে গা-সওয়া হয়ে গেছে। একদিন শুধু বলেছিলো, 'আই হেট প্রিটেনশনস, রূপসী। প্রিটেনশন না থাকা, ওপর-চালাকি করতে না জানা, সোজা কথার ভেতর থেকে প্যাঁচালো অর্থ খুঁজে বের করতে না পারা—এগুলো যদি বোকামোর চিহ্ন হয়, তবে আমি হাজার বার বোকা। সারা জীবনই বোকা থাকতে রাজি। তাতে আমার এক বিন্দুও আফসোস নেই।'

সত্যিই বোকা। বোকা অনুভব!—রূপসা হাসলো।

হাতে অনেকটা সময়। এতো তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরলে শনিবারের মজাটাই মাটি। তবে আজ আকাশের যা অবস্থা তাতে অহেতুক ঝুঁকি নিয়ে ঘোরাঘুরি করাটাও বোধহয় ঠিক হবে না। যে কোনো মুহূর্তে জমাটবাঁধা মেঘগুলো বৃষ্টি হয়ে ছুটে আসতে পারে। সে ক্ষেত্রে পাঁচটার মধ্যে বাড়ি ফেরাও অনিশ্চিত হয়ে উঠবে। পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে মিনিবাস থেকে নেমে রূপসার মনে হলো, খুব ভুল হয়ে গেছে—সব চাইতে ভালো হতো, অনুভবকে গ্লোবের কাছে বা অন্য কোথাও অপেক্ষা করতে বললে। তাহলে একসঙ্গে খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে কিছুটা সময় কাটিয়ে, পাঁচটা নাগাদ বাড়িতে ফেরা যেতো। কিন্তু এখন আর ওসব ভেবে কোনো লাভ নেই। অবিশ্যি অনুভবের অফিস এখান থেকে খুবই কাছে এবং সম্ভবত মাঝখানের এই দু ঘন্টা সময় সে অফিসেই কাটাবে। কাজেই ইচ্ছে করলে এখন সেখানেও যাওয়া যেতে পারে। তাহলে নিঃসন্দেহে ভীষণ চমকে উঠবে অনুভব। কিন্তু

অফিসে গিয়ে কারুর সঙ্গে দেখা করাটা রূপসা খুব একটা পছন্দ করে না। কেমন যেন অস্বস্তি হয়। তবে একটা টেলিফোন নিশ্চয়ই করা যায়, তাহলেই গাড়ি নিয়ে চলে আসবে অনুভব। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবনাটাকে মন থেকে খারিজ করে দেয় রূপসা। থাক, তার চাইতে বরং তাড়াতাড়ি মার্কেটটা একবার ঘুরে নেওয়া যাক।

গত বছর রূপসার জন্মদিনে মিশেল ওকে একটা কার্ড দিয়ে উইশ করেছিলো। আসছে বুধবার মিশেলের জন্মদিন। বেছে বেছে ওর জন্যে সুন্দর একটা কার্ড কিনলো রূপসা। তারপর নাহুম থেকে কিছু চিজ-স্ট্র আর পেস্ট্রি। সুদূর চায়ের সঙ্গে চিজ-স্ট্র চিবোতে ভালোবাসে। অনুভবকেও দেওয়া যাবে। এখানকার প্রেস্ট্রিও ওর ভীষণ প্রিয়। রূপসা অবিশ্যি মিষ্টি খুব একটা পছন্দ করে না। চা-ও বিনা চিনিতে। দেখে অনুভব হাসে, 'বাব্বাঃ, এতো ফিগার কনশাস!' অথচ সে জানে, কথাটা রূপসার ক্ষেত্রে একেবারেই সত্যি নয়।

একটা নাইটি কেনা দরকার। একটা নয়, এক জোড়া। গড়িয়াহাট থেকেই যে কোনো দিন কিনে নেওয়া যায়। তবে এখানে যখন আসাই হয়েছে, তখন কাজটা আর ফেলে রাখা কেন? তাছাড়া গড়িয়াহাটের অধিকাংশ জিনিসই বড্ড কমন। আসলে কল্পনাশক্তির অভাব। রূপসার বিরক্ত লাগে। অনুভব একদিন বলেছিলো, 'সবাই তো তোমাকে জানে না—জানলে শুধু তোমার জন্যেই কয়েক প্রস্থ এক্সক্লুসিভ আইটেম রেডি করে রাখতো।'

নাইটি দেখতে গিয়েই হঠাৎ বহুদিন বাদে সুকৃষ্ণাদির সঙ্গে দেখা। ছেলেবেলা বহুকাল ওরা পাশাপাশি বাড়িতে থেকেছে। সুকৃষ্ণা রূপসার চাইতে বছর দশেকের বড়ো। কিন্তু দেখে তা বোঝা যায় না। দারুণ ফিগার, ফর্সা রং, শার্প ফিচার্স। ছেলেদের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। এ যাবৎ কতো কাণ্ড যে করেছে, তার কোনো ঠিকানা নেই। প্রথমে ছিলো এয়ার হোস্টেস। তারপর মডেল। তারপর শোনা গেলো, সুকৃষ্ণা সেন খুব শীগগিরি বম্বে ছবির হিরোইন হতে চলেছে। সি রক হোটেলে এক নামজাদা হিরোর সঙ্গে তাকে নাকি খুব অন্তরঙ্গ পরিস্থিতিতে দেখা গেছে বলে খবর বেরুলো একটা সিনেমা পত্রিকায়। তারপর সব একেবারে চুপচাপ। আবার হঠাৎ একদিন শোনা গেলো, ও নাকি কাকে বিয়ে করে স্টেটসে চলে গেছে। এটাও বছর চারেক আগেকার কথা। তারপর থেকে এতোদিন আর কোনো খবর ছিলো না। আজ যে এমন হঠাৎ করে এখানে ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, ভাবতেই পারেনি রূপসা।

'ওমা, রূপসা তুই!' ওকে প্রায় জড়িয়ে ধরলো সুকৃষ্ণা।

'কি আশ্চর্য, সুকৃষ্ণাদি তুমি! আমি তো ভাবতেই পারছি না!' রূপসার মনে হলো, সুকৃষ্ণা আগের চাইতেও রূপমতি হয়েছে, 'কেমন আছো? কবে এলে?'

'চলে যাচ্ছে। এখানে এসেছি মাস দুয়েক হলো।'

'কদ্দিন আছো?'

'এই তো, হয়ে এলো প্রায়। আর মোটে দিন দশেক। তা তুই কেমন আছিস?'

'ভালো।'

'আমি তোর বিয়ের খবর পেয়েছিলাম। মা জানিয়েছিলো। ভেবেছিলাম অন্তত

একটা ... কিন্তু তখন আমার এমন অবস্থা ... যাকগে সে কথা, বর পছন্দ হয়েছে তো? শুনছি সে নাকি দারুণ দেখতে?'

'হুঁ-উ,' অতর্কিতে রূপসার কান দুটো গরম হয়ে উঠলো, 'একদিন এসো না, ও খুব খুশি হবে।'

'এবারে বোধহয় আর সময় হবে না। বাবা নেই, ভাবছি মাকে নিয়ে যাবো কিন্তু মা দেশ ছেড়ে যেতে রাজি হচ্ছে না। ভয় পাচ্ছে। আসলে আমার ওপরে ভরসা রাখতে পারছে না বোধহয়। আমি যা উড়নচণ্ডী! মাকে যদি নিয়ে যেতে পারি, তাহলে এ দিককার কিছু বন্দোবস্ত করে যেতে হবে। আর মা একান্তই যদি না যায়, তাহলে আবার আলাদা ব্যবস্থা। তাই বুঝতেই পারছিস, হাতে এখন অঢেল কাজ—এক মুহূর্তও সময় নেই। তবে ভবিষ্যতে যদি আবার কখনও এ দেশে আসি, তখন খোঁজখবর করে তোর বাড়িতে একবার নিশ্চয়ই যাবো। তখন তোদের দুজনের সম্পর্কটাও একটু পুরনো হবে। এখন তোর বাড়িতে যাওয়া মানে তে কাবাবে হাড্ডি!'

'মোটেই তা নয়!' রূপসা ওর হাত চেপে ধরলো, 'চলো না গো, সুকৃষ্ণদি—প্লিজ! ছেলেবেলায় তোমাকে দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে যেতাম। আজও কি ভালোই যে লাগছে।'

'পাগল একটা। আইসক্রিম খাবি?'

'আমি বুঝি এখনও সেই বাচ্চা মেয়ে?' রূপসা হাসলো।

'কে বলেছে? দুদিন বাদে তো বাচ্চার মা হবি।'

'তোমার শুধু বাজে কথা।'

'মোটেই না। ওদেশে বুড়ো বুড়িরাও আইসক্রিম চোষে, তা জানিস?'

'জানলাম। তা তুমি কি করছো আজকাল?'

'একটা কমপিউটার ট্রেনিং সেন্টারে আছি।'

'আর তোমার বর?'

'নেই।'

'মানে?' রূপসা অবাক হলো।

'বছর খানেক আগে ডিভোর্স হয়ে গেছে।' সুকৃষ্ণার সুগৌর মুখখানা ঈষৎ ম্লান হলো, 'অনেক চেষ্টা করেছিলাম, জানিস! আমি অমন এক্সট্রোভার্ট, কিন্তু বিয়েটে বাঁচাবার জন্যে আমি নিজের লাইফস্টাইলও বদলে ফেলেছিলাম। কিন্তু তাও শেষরক্ষা হলো না। দিনরাত অমন খিটিমিটি চেঁচামেচি করে একসঙ্গে থাকার কোনো অর্থ হয় না।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো সুকৃষ্ণা, 'আজকাল আমি সবাইকে কি বলি, জানিস?'

'কি?'

'বলি, ভালোবাসাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইলে, ভালোবাসার মানুষটিকে ভুলেও বিয়ে কোরো না। ভালোবাসা হলো জড়োয়ার নেকলেস। কালেভদ্রে ব্যবহার করলে, সারা জীবনই নতুন থেকে যায়। কিন্তু প্রতিদিনের ব্যবহারে তার চাকচিক্য নষ্ট হয়, রঙবেরঙের দামী পাথরগুলো অজান্তে খসে পড়ে।'

রূপসার বুকের ভেতরটা মুচড়ে ওঠে।

'তোমার একা লাগে না, সুকৃষ্ণাদি?'

'লাগে রে, ভীষণ একা লাগে। এতো একা লাগবে, আগে বুঝিনি। তবে বুঝলেও আমার আর কিছু করার ছিলো না। যাকগে—চল, গলাটা বড্ড শুকিয়ে গেছে। এক্ষুনি একটা কিছু গলায় ঢালা দরকার।'

'আমি খাওয়াবো। কি খাবে, বলো।'

'চিলড বিয়ার হলে সব চাইতে ভালো হতো। কিন্তু এখন হাতে অতো সময় নেই। যা হোক একটা সফট ড্রিংক হলেই চলবে।'

মার্কেট থেকে বেরিয়ে চট করে একবার আকাশের দিকে চোখ বুলিয়ে নেয় রূপসা। গতিক মোটেই সুবিধের নয়। এবারে তাড়াতাড়ি বাড়ির পথে পা না বাড়ালে, নির্ঘাত মুশকিলে পড়তে হবে। অথচ মুখ ফুটে সুকৃষ্ণাদিকে তা বলাও যাচ্ছে না। ঠাণ্ডা পানীয়ের বোতলে স্ট্র ডুবিয়ে ওর দিকে তাকালো রূপসা, 'ওই দেশটাকে তোমার কেমন লাগছে, সুকৃষ্ণাদি?'

'খুবই সুন্দর, ছবির মতো সাজানো গোছানো। ডিসিপ্লিনড লাইফ, ঝাঁ চকচকে পথঘাট, ভেজালহীন খাবার। তবে সেগুলোই সব নয়। প্রয়োজনের চাহিদা মেটাতে ওখানকার মানুষ সব সময় দম দেওয়া পুতুলের মতো ছুটে বেড়াচ্ছে। ফলে সচ্ছলরা আরও সচ্ছল হচ্ছে, কিন্তু চাহিদাও সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে, তাই কিছুতেই সমতা আসছে না—মাঝখান থেকে মানুষের মধ্যে আবেগ বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকছে না। নতুন জেনারেশনের অবস্থা তো আরও ভয়ঙ্কর।'

'কি রকম?'

'ওটা বোধহয় অতিরিক্ত সচ্ছলতার অভিশাপ। ছেলেমেয়েদের জন্যে অতিরিক্ত সময় দেবার মতো অবকাশ নেই ওখানকার মানুষের। তারা নিজেদের জীবন নিয়ে বড়ো বেশি ব্যস্ত। ছেলেমেয়েরা এটাকে স্নেহহীনতা বলে ধরে নিচ্ছে, নিজেদের উপেক্ষিত বলে মনে করছে। তাই অল্প বয়েস থেকেই তারা হয়ে উঠছে দুর্বিনীত, বেপরোয়া এবং অসভ্য। সংসারে বন্ধন বলে কিছু থাকছে না। শুধু হতাশা আর ভয়ঙ্কর এক শ্রদ্ধাহীনতায় ভুগছে এই নতুন জেনারেশনটা। ওদের কাছে জীবনের অর্থ শুধু জাংক ফুড, সেক্স, ড্রাগস আর হার্ড রক।' একটু থেমে সুকৃষ্ণা ফের বললো, 'বাচ্চা টাচ্চা আসার আগে তোরা দুজনে একবার আমার কাছে চলে আয় না! ওখানকার সব দায়িত্ব আমার। নায়াগ্রা, গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস, অরল্যাণ্ডোর ডিজনেল্যাণ্ড, ইউনিভার্সাল স্টুডিও—সব দেখিয়ে দেবো। দেখে তাজ্জব হয়ে যাবি।'

'দেখি,' হবে না জেনেও জবাব দিলো রূপসা। তারপর বললো, 'তোমাকে একটা কথা ভয়ে ভয়ে জিগেস করবো? কিছু মনে করবে না তো?'

'কি কথা?'

'তুমি আর বিয়ে করবে না?'

'ভেবেছিলাম করবো না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, কার্লকেই বিয়ে করে ফেলি। আমার চাইতে তিন বছরের ছোটো, কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। তবে আমার

মনে হয় ফের বিয়ে করতে হলে, কোনো উইডোয়ার বা ডিভোর্সড পুরুষকেই প্রেফার করা উচিত। কারণ যারা প্রথম বার বিয়ে করছে, পার্টনারের কাছ থেকে তাদের প্রত্যাশাটা বেশি থাকে—তাই তাদের পক্ষে ডিজইলিউশনড হবার সম্ভাবনাও অনেক বেশি। জানি না, শেষ অব্দি কি করবো। তবে মাঝে মাঝে আবার মনে হয়, বিয়ের চাইতে ওদেশে যেটার চল বেশি, মানে লিভিং টুগেদার—সেটাই বরং ভালো। অহেতুক বন্ধন নেই। দায়িত্ব নেই, তাই অধিকারও নেই। মানাতে পারলে ভালো, নয়তো কেটে পড়ো। মানসিকভাবে যারা বিচ্ছিন্ন, বাস্তবে তাদের একসঙ্গে থাকার কোনো অর্থ হয় না। তবে যা-ই করি না কেন, একা থাকা আমার পক্ষে বোধহয় সম্ভব হবে না।'

আরও মিনিট পাঁচেক কথা বলার পর হাত দেখিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরলো সুকৃষ্ণা টালিগঞ্জে যাবে। পথে মুদিয়ালির মোড়ে নেমে গেলো রূপসা। সেখান থেকে অটো রিক্সায় বাড়ি।

তখনও বিকেল চারটে বাজতে মিনিট পনেরো বাকি। মেঘ ডাকছিলো ঘন ঘন মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলকানি। তারপর দেখতে দেখতে ঝড়। দুরন্ত, উদ্দাম দরজা খুলে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াতেই রূপসার মনে হলো, দামাল বাতাস অনায়াসে তাকে ব্যালকনি থেকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে দূরে কোথাও ছুঁড়ে ফেলে দেবে। অজস্র ধুলোর কণা চতুর্দিক থেকে ঝরা পাতা কুড়িয়ে এনে পাক খেতে খেতে বাসুকির উদ্ধত ফণার মতো উঁচু হয়ে উঠছে, আবার পরক্ষণেই এক ঝাপটায় ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। কোথাও বুঝি জাদুকরের ডুগডুগি বাজছে। ঝুপসি মাথা অসহায় গাছগুলো তাই আতঙ্কে কেঁপে উঠছে থরথরিয়ে। এই কি তবে মহাকালের নাচন, নাকি প্রলয়ের পূর্বাভাষ?

রূপসা অনুভব করলো, মুহূর্তের অবকাশে ধুলো জমে উঠেছে ওর মাথার চুল চোখের পাতা, গলা, আর শরীরের আবৃত ও অনাবৃত সমস্ত খাঁজ ভাঁজে। ধুলে রয়েছে, অথচ গ্লানি নেই। সারা শরীরে এক প্রগাঢ় স্নিগ্ধতা। যেন সদ্য স্নানের অনুভূতি। কিন্তু ঘরগুলো এতোক্ষণে নিশ্চয়ই মিহি ধুলোয় ভরে উঠেছে। যমুন আসবে কাল সকালে। ওর ভরসায় কাজ ফেলে রাখলে পরে হয়তো বিপদে পড়তে হবে। তাছাড়া ওই ধুলোময় ঘর অতোক্ষণ ওভাবে ফেলে রাখা যায় না কাজেই সময় থাকতে থাকতে কাজে হাত লাগানো দরকার।

ব্যালকনির কাচের দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে আসবাবপত্রের ধুলো ঝাড়তে শুরু করলো রূপসা। মুহূর্তের অসতর্কতায় এক চরম বিভ্রান্তিকর অবস্থা হয়েছে গোটা ফ্ল্যাটটার। ঘরদোর সাফ করে রূপসা যখন বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো, তার একটু আগেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। শ্যামপু করে, তাড়াতাড়ি গা ধুয়ে নিলো ও। হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে চুল শুকিয়ে, শরীরের আনাচে কানাচে ইমপালস স্প্রে করলো। নাইটির ওপরে হাউস কোট জড়িয়ে, ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে মাথা আঁচড়ালো তারপর ঠোঁটে লাইট শেডের লিপস্টিকটা বুলিয়ে নিলো আলতো করে। এবারে একটু চা হলে ভালো হতো। কিন্তু থাক, অনুভব এলে একসঙ্গে খাওয়া যাবে। ঘড়ি দেখলো রূপসা। পাঁচটা বাজতে এখনও পনেরো মিনিট বাকি। এখনও কে

আসছে না অনুভব? পাঁচটা মানে কি সত্যিসত্যি একেবারে কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটা? পনেরো মিনিট আগে কি কিছুতেই আসা যায় না? আগে এলে রূপসা কি তাকে তাড়িয়ে দিতো? বোঝে না, অনুভব কিচ্ছু বোঝে না। আসলে বোকা, অনুভবটা ভীষণ বোকা।

কাচের দরজা খুলে ব্যালকনিতে যেতে গিয়েও সংযত হলো রূপসা। বাইরে গেলে মুহূর্তের মধ্যে ভিজে চুপসে যেতে হবে। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, সঙ্গে তুমুল বাতাস। বাজ পড়ছে ঘনঘন। পৃথিবীতে আর কোনো শব্দ নেই—শুধু সেতারে সুরমল্লারের ঝালা আর মাদলে মেঘের গুরু গর্জন। কাছের সাদার্ন আভিনিউ, দূরের লেক, সাঁতারের ক্লাব—সমস্ত কিছুই বৃষ্টির স্বচ্ছ ওড়নায় ঢাকা। রাস্তা জনহীন। শুধু মাঝে মাঝে কয়েকটা গাড়ি চলে যাচ্ছে সতর্কভঙ্গিতে। আর কিছুক্ষণ এমন বৃষ্টি হলেই দেশপ্রিয় পার্ক আর ঢাকুরিয়া ব্রিজের কাছে জল দাঁড়িয়ে যাবে। এই ঝড় জল ডিঙিয়ে আসতে পারবে কি অনুভব? যদি ওর গাড়ি জলে আটকে যায়? যদি ও আসতে না পারে? না এলে খারাপ লাগবে, ভীষণ খারাপ লাগবে রূপসার। একটুও ভালো লাগবে না। কি যেন কথা আছে—সেদিন বলেছিলো অনুভব। কি কথা? নিশ্চয়ই জরুরি। কিন্তু কথা থাক বা না থাক, অনুভব আসুক। আজ। এখুনি। ওকে ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে রূপসার। বুকের মধ্যে চেপে রাখা একটা বিশ্রী বোঝা রূপসাকে প্রতি মুহূর্তে ক্লান্ত, আরও বেশি ক্লান্ত করে তুলছে। অনুভব এলে সেই বোঝাটা বোধহয় হালকা হয়ে যাবে। অনেকখানি।

একটা উর্দু শের মনে পড়লো রূপসার।

(বৃষ্টি, তুমি এসো না—তুমি এলে, সে আসতে পারবে না। বরং সে এলে তুমি এসো, তাহলে সে যেতে পারবে না।)

দু চোখ বুজে এলো রূপসার। আবেগে কিংবা ভাবনায়।

অনুভব, তুমি আমার বড়ো কাছের মানুষ। বড়ো আপনার। কিন্তু তুমি তা জানো না, জানতে পারবেও না কোনোদিন। তুমি মনে করো, তোমার ওপরে আমি অহেতুক নিষ্ঠুর। কিন্তু তুমি জানো না, আসলে আমি অনেক বেশি নিষ্ঠুর নিজের ওপরে। তাই তোমার কাছে আমি নিষ্ঠুর হয়ে থাকি।

চোখ মেলে রূপসা দেখলো, বৃষ্টি ভিজতে ভিজতে অনুভবের সাদা মারুতি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। জানলার কাচ তোলাই আছে। এবারে ও গাড়ি থেকে নেমে দরজা লক করে, সিঁড়িঘরের খোলা দরজার দিকে ছুটে আসবে। একটা ছাতা নিয়ে এক্ষুনি নিচে নেমে যাবে নাকি রূপসা? কিন্তু তার আর সময় নেই। ওই তো, গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে অনুভব। ওর পরনে হালকা নীল রঙের জিনস, গায়ে কলারওলা সাদা টি শার্ট। শনিবার ওর অফিস ছুটি, তবু যায়। এমনি ক্যাজুয়াল পোশাকে। সিঁড়ি ভেঙে এইবার দ্রুত ওপরে উঠে আসবে অনুভব। এক দুই তিন চার ...

চকিতে ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় নিজের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে, ডোর বেল বাজার আগেই দরজা খুলে দাঁড়ালো রূপসা। ঠোঁটে এক চিলতে রূপসী হাসির সুস্পষ্ট আভাস।

'এসো।'

মুহূর্তের জন্যে যেন থমকে গেলো অনুভব। তারপর অপ্রস্তুতের মতো হেসে বললো, 'ভিজে গেলাম।'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি।' অনুভবকে ভেতরে আসার জায়গাটুকু ছেড়ে দিয়ে এক পাশে সরে দাঁড়ালো রূপসা, 'বোকা তো।'

'মানে?'

'গাড়িতে বসে হর্ন দিলেই পারতে!' দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়ালো রূপসা, 'আমি ছাতা নিয়ে নিচে নেমে যেতাম।'

'পাগল নাকি?'

'মানে?'

'বেশি আশা করতে গিয়ে ঠকে যাই আর কি।'

অনুভবকে পেছনে রেখে লিভিং রুমের দিকে এগিয়ে যাবার পথে তার দিকে একটা মৃদু কটাক্ষ ছুঁড়ে দিলো রূপসা। অনুভবের ভেতরটা বোধহয় দুলে উঠলো একটু। এতোক্ষণে এই প্রথম তার মনে হলো, পালকের মতো নরম ও হালকা, অথচ আশ্চর্য এক আকর্ষণীয় সৌরভ রহস্যময়ী করে রেখেছে রূপসাকে।

'চিরদিন তুমি তো ঠকেই এলে, তাই না?'

'বোকারা চিরদিনই ঠকে, এতে নতুনত্ব কিছু নেই।'

'বড্ড দেরিতে বুঝলে। এনি ওয়ে, তুমি তো পুরো ভিজে গেছো। জুতোটা আগে খোলো।'

'তারপর? আরও কিছু?'

'দাঁড়াও, সুদূরের স্পেয়ার পাজামা পাঞ্জাবি এনে দিচ্ছি। বাথরুমে গিয়ে, হাতমুখ ধুয়ে চেঞ্জ করে নাও।'

'আমার ইঙ্গিতটা কি বৃথাই গেলো?'

'অনেক সময় অনেক কথা ইচ্ছে করেই বুঝতে হয় না। বুঝেছো?'

'বুঝলাম। কিন্তু চেঞ্জ করার কোনো দরকার ছিলো না। আমার কোনো অসুবিধে হতো না।'

'আমার হতো। আমার ঘরদোর ভিজে সপসপে হয়ে যেতো। তাছাড়া তোমার অসুখবিসুখও হতে পারে। তারপর আরতি যখন জানবে যে তার মূলে ছিলাম আমি, তখন কিন্তু ... '

'আরতিকে সব কথাই জানাতে হবে, এমন কোনো কথা নেই।'

রূপসা তক্ষুনি এ কথার কোনো জবাব দিলো না। এক মুহূর্ত কি যেন ভাবলো অনুভবের দিকে তাকিয়ে। তারপর চিন্তিত মুখে বললো, 'তুমি একটু বোসো, আমি তোমার পোশাক নিয়ে আসছি।'

শোবার ঘরের আলমারি থেকে সুদূরের একপ্রস্থ পোশাক আর একটা তোয়ালে বের করতে গিয়ে রূপসার মনে হলো, অনুভবকে বোধহয় সত্যিই ঠকানো হচ্ছে। কিন্তু আজ হঠাৎ অনুভব যদি কোনো বাড়তি আবেগ প্রকাশ করে. তাহলে নিজেকে বশে রাখাও বোধহয় খুব কঠিন হয়ে উঠবে। এই মুহূর্তে প্রকৃতিও যেন এক নিখুঁত

ষড়যন্ত্রের নিপুণ অংশীদার। কি দরকার ছিলো ওকে বাড়িতে আসতে বলার? কি এমন কথা আছে ওর, যা টেলিফোনে বলা যায় না? কি প্রয়োজন ছিলো, ওর কথা শোনার জন্যে আজকের দিনটাকেই নির্দিষ্ট করে বেছে নেবার? ঘটনাচক্রে সুদূর যদি আজই তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরে এসে আবিষ্কার করে যে বাইরে উদ্দাম প্রকৃতিকে প্রহরী রেখে অনুভব তার পোশাক পরে তার ঘরে বসে তারই স্ত্রীর সঙ্গে নিভৃতে আলাপ করছে, তাহলে দৃশ্যটা কি তার কাছে খুব একটা প্রীতিপ্রদ বলে মনে হবে? বোধহয় না। তাহলে?

অথচ পরক্ষণেই এক বিপরীতমুখী চিন্তা রূপসার বিপন্ন মনকে উত্তেজনায় টান টান করে তোলে।

কেন, আমার কি নিজের কোনো ইচ্ছে-অনিচ্ছে থাকতে নেই? নিজের ঘরে বসে কারুর সঙ্গে কোনো ব্যক্তিগত কথা বলার অধিকার নেই? সেখানে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি কি একান্তই প্রয়োজনীয়? তা তো অবিশ্বাস আর অপমানেরই নামান্তর! বিশ্বাসের ভিত যদি এতোই পলকা হবে, তবে পারস্পরিক সম্পর্কের মর্যাদা আর কতোটুকু?

তবে অনুভবকে আজ কয়েকটা কথা বলা দরকার। আরতির সম্পর্কে। নইলে ওদের দ্বৈত জীবন ক্রমশ আরও বেশি অস্থির হয়ে উঠতে পারে। আরতির সুখ-অসুখ নিয়ে রূপসার কোনো মাথাব্যথা নেই। কিন্তু রূপসাকে কেন্দ্র করে অনুভবের দাম্পত্য সুখ বিপন্ন হলে, রূপসার নিশ্চয়ই তা ভালো লাগবে না। ভালো লাগবে না ওর জন্যে অনুভবের কোনো মারাত্মক ক্ষতি হয়ে গেলে। কারণ অনুভবের সে ক্ষতি পুষিয়ে দেবার কোনো ক্ষমতা রূপসার নেই। অনুভব তাহলে সত্যিই পুরোপুরি ঠকে যাবে।

ভেজা পোশাকে সোফায় বসেনি অনুভব। একটা মোড়ায় বসে সে অন্যমনে সিগারেট টানছিলো। রূপসা তাকে তাড়া লাগালো, 'এ কি, এখন আবার ওটা ধরালে কেন? শীগগিরি বাথরুমে যাও।'

'দাঁড়াও দাঁড়াও, অতো ব্যস্ত হচ্ছো কেন? সবেমাত্র মৌজ করে সিগারেটটা ধরিয়েছি। মৌজটাকে একটু মেজাজে জানতে দাও!'

'অতো মৌজ করে কাজ নেই,' সিগারেটটা আলটপকা কেড়ে নিয়ে অ্যাশট্রেতে গুঁজে দেয় রূপসা। 'যাও, তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে এসো। আমি চায়ের জল বসাচ্ছি। ইচ্ছে করলে স্নানটাও সেরে নিতে পারো।'

অনুভব বিনা প্রতিবাদে উঠে দাঁড়ায়। ওকে বাথরুমে পাঠিয়ে টোস্টারে রুটি সেঁকে নেয় রূপসা। তারপর আভেনের এক দিকে চায়ের জল বসিয়ে, অন্য দিকে দুটো বাটার পোচ করে নেয়। চা, টোস্ট, ডিমের পোচ, নাহুমের চিজ স্ট্র আর পেস্টি। মন্দ কি? অনুভবের নিশ্চয়ই খিদে পেয়ে গেছে। খেতে খেতেই কাজের কথাগুলো সেরে নিতে হবে। নইলে হঠাৎ যদি সুদূর এসে হাজির হয়, তাহলে আজ আর কিছুই বলা বা শোনা হবে না।'

'হেলপ করবো?'

প্রায় কানের কাছে অনুভবের কণ্ঠস্বর শুনে একটু চমকে উঠেই নিজেকে সামলে

নিলো রূপসা। নিজের ভাবনায় ও এতোই তন্ময় ছিলো যে বুঝতেই পারেনি, অনুভব কখন কিচেনে এসে ঢুকেছে।

'এই প্লেট দুটো টেবিলে নিয়ে রাখো।' কপালে খসে পড়া চুলগুলোকে আলতো হাতে সরিয়ে দিলো রূপসা। 'আমি চা নিয়ে যাচ্ছি।'

অনুভব বাধ্য ছেলের মতো প্লেট দুটো নিয়ে বেরিয়ে গেলো। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো রূপসা। রান্নাঘরের স্বল্প পরিসরে অনুভবের উপস্থিতিতে ওর অস্বস্তি হচ্ছিলো। অথচ এটা হবার কথা নয়। তবে কি ও নিজেই খানিকটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে আজ? কেন এমন হয়? নিজেকে চোখ রাঙালো রূপসা—নাঃ, অস্বস্তিটা কাটিয়ে ফেলা দরকার এবং তা এখুনি।

চা ঢালতে ঢালতে অনুভবের দিকে এক ঝলক তাকালো রূপসা। নির্বিকার মুখে টোস্ট চিবুচ্ছে অনুভব। যেন পরিবেশ ও পরিস্থিতি দুই-ই অত্যন্ত স্বাভাবিক।

'তোমার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে, অনুভব।'

'সেকি!' যেন ভীষণ অবাক হয়ে, টোস্টে কামড় দিতে গিয়েও থমকে গেলো অনুভব। 'আমার তো ধারণা, আমিই তোমাকে কিছু বলবো বলে আজ এখানে এসেছি।'

'ঠিক। কিন্তু তার আগে আমি কিছু বলতে চাই।'

'শুট, হোয়াইল আই গ্র্যাব।'

'তোমার আমার সম্পর্কটা আরতির কাছে কতোদূর গ্রহণযোগ্য হতে পারে, তা কখনও ভেবে দেখেছো?'

'হঠাৎ এ প্রসঙ্গ?' এবারে সত্যিই অবাক হলো অনুভব।

'দরকার আছে। বলো, ভেবে দেখেছো কখনও?'

'দেখেছি।'

'কি বুঝছো?'

'ওর কাছে ব্যাপারটা রীতিমতো রহস্যজনক—কিংবা খানিকটা সন্দেহজনকও বলতে পারো।'

'তুমি ওর সন্দেহকে ভেঙে দেবার কোনো চেষ্টা করোনি?'

'এক সময় করতাম।'

'তারপর?'

'তারপর বুঝতে পারলাম, চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। কারণ সকলের পক্ষে সবকিছু বোঝা সম্ভব নয়।'

'আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা যে কতোখানি, আমরা যে মাঝে মাঝে বিনা উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়াই, গল্প করি বা সিনেমায় যাই—এ সমস্ত কথা তুমি ওকে বলো?'

'সব সময়েই যে বলি, তা নয়। তবে মাঝে মধ্যে বলি।'

'মানে, বার তিনেক দেখাসাক্ষাৎ হলে একবারের কথা বলো?'

'ঠিক তাই।'

'কেন?'

'নইলে অহেতুক জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে।'

'বুঝিয়ে বললেও জটিলতা আসবে কেন?'

'আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকলে মানুষ ইনসিকিওরড ফিল করে। এ ক্ষেত্রে সেটাই জটিলতার মূল উৎস।'

'ইনসিকিওরিটি? আমার জন্যে?'

'হ্যাঁ।'

'আশ্চর্য! আমি নিজে চাকরি করছি, সুদূর চাকরি করে—আমার আবার নিরাপত্তার অভাব কোথায়? আমি তো দু দিক দিয়ে নিরাপদ!'

'এবারে তুমি নিজেই একটা বোকার মতো কথা বললে।' অনুভব গম্ভীর গলায় বললো, 'আসলে আরতি জানে, আমি তোমাকে ভালোবাসি। এবং ওর নিজের ধারণা, তুমিও আমার জন্যে পাগল—যদিও এ ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল। তোমার দিক থেকে এটা যে স্রেফ বন্ধুত্ব, জাস্ট একটু ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব এবং তার চাইতে বেশি কিছু নয়—এটা ওর পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন। আরও কঠিন ওকে তা বিশ্বাস করানো। ও ভাবে, হঠাৎ আমরা দুজনে যদি একটা সাংঘাতিক স্টেপ নিয়ে ফেলি, যদি দুজনেই প্রথম বিয়েটাকে বাতিল করে দিয়ে নতুন করে ঘর বাঁধতে চাই—তাহলে ওর কি হবে? এখানেই ওর ইনসিকিওরিটি বোধটা প্লে করে। ও ভয় পায়। তাছাড়া অসম্মান বা অপমান বোধের প্রশ্নটাও এর মধ্যে থেকে যায়। কিন্তু ও বোঝে না যে তুমি কোনোদিনই এগিয়ে এসে আমার দিকে হাত বাড়াবে না। আর তুমি হাত বাড়ালেও, আমি অন্য সবকিছু ঠেলে ফেলে দিয়ে তোমার বাড়িয়ে দেওয়া হাতখানা ধরতে পারবো না। কারণ তোমার বা আমার কাছে তা অর্থহীন এবং অনাবশ্যক।'

'ঠিক এই কথাগুলো ওকে কোনোদিন বলে দেখেছো?'

'বহুবার বহুভাবে বলেছি। কিন্তু ও যে পরিবেশে যে মানসিকতা নিয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে, তাতে ওর নিজের পক্ষে ওই একপেশে দৃষ্টিভঙ্গিটা বদলানো খুব কঠিন। হয়তো আদৌ তা সম্ভব নয়। ওর ধারণা, জীবনে একবারই ভালোবাসা সম্ভব, তার পরিণতি বিয়ে এবং সেখানেই তার সমাপ্তি। ও মনে করে স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসা, যাকে বলে একেবারে পবিত্র প্রেম। এবং তা মোটামুটিভাবে কামগন্ধহীন। তাছাড়া অন্য সব প্রেমই নোংরা, অরুচিকর, অপবিত্র এবং অন্যায়।'

'আমার মনে হয়, তোমার উচিত ওকে একটু বেশি করে সময় দেওয়া। নইলে ও মনে করবে, তুমি ওকে অবহেলা করছো। তাহলে তুমি ওকে কিছুতেই মনের কাছাকাছি আনতে পারবে না, ইচ্ছেমতো ভালোবাসতে পারবে না। অন্য কাউকে ভালোবেসে তুমি তো শেষ অব্দি কিছুই পাবে না, অনুভব। তখন একদিন তোমার নিশ্চয়ই মনে হবে, সারাটা জীবন নিজের বউকে অবহেলা করে কেন মিছিমিছি অন্যের পেছনে জীবনের সেরা সময়টাকে নষ্ট করলাম।'

'ভালোবাসা নামের জিনিসটা রঙীন চশমা নয়, যে তাকে ইচ্ছে করলেই চোখ থেকে খুলে ফেলা যাবে। আর অবহেলার কথা বলছো? কেউ যেচে নিজেকে অবহেলিত করে তুললে, অন্য কেউই তার অস্তিত্ব থেকে উপেক্ষার ধুলো ঝেড়ে ফেলতে পারে না। তাই নয় কি?' অনুভবের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠলো।

'জানি না।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রূপসা বললো, 'তবে আমার মনে হচ্ছে এ

ব্যাপারে তোমার কিছু করা দরকার। ইটস হাই টাইম।'

'তুমি আমাকে কি করতে বলছো?'

'ধরো ইচ্ছেমতো ওকে নিয়ে কোথাও ঘুরে বেড়ালে, সিনেমায় নিয়ে গেলে বা কলকাতার বাইরে কোথাও—মোট কথা, ট্রাই টু মেক হার ফিল মোর ইমপর্টান্ট।'

'সিনেমায় গেলে ওর মাথা ধরে, উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ানোর মানে অর্থহীন পাগলামো, বেড়াতে গেলে পুরো সময়টা স্রেফ মৌনী হয়ে কাটায়, শপিং করতে গেলে মানুষের ভিড়ে বিরক্ত হয়, সেনসেশনাল ফ্লোর শো ওর কাছে অসভ্যতার নামান্তর। মেলে না রূপসী, আমি কিছুতেই নিজেকে ওর সঙ্গে মেলাতে পারি না।'

'ও কি চায়, তা তুমি কখনও বুঝতে চেষ্টা করেছো?'

'সেটা জল পড়ে পাতা নড়ের মতোই সহজ ও সরল। আসলে ও চায়, অফিস থেকে রোজ যথাসময়ে সোজা বাড়িতে ফিরে গিয়ে আমি চা আর মশলা মুড়ি খেতে খেতে ওর সঙ্গে সাংসারিক আলাপ আলোচনা করবো, এর-ওর-তার নামে অহেতুক নিন্দা বা সমালোচনা মন দিয়ে শুনে উপভোগ করবো, টেলিভিশনে বোকা-বোকা বাংলা-হিন্দি সোপ সিরিয়াল দেখে মুগ্ধ হবো এবং তারপর তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে একখানা গীতা হাতে নিয়ে শুয়ে পড়বো।'

'আবার বাজে কথা?'

'বাজে কথা নয়, রূপসী। এটাই ঘটনা। যাকগে, সেটা আমার প্রবলেম অ্যাণ্ড আই শ্যাড নো হাউ টু ট্যাকল ইট। কিন্তু তুমি আজ হঠাৎ এ প্রসঙ্গটা কেন তুলতে গেলে, বলো তো?'

'কারণ তোমার প্রবলেমটি এখন পথে পা বাড়িয়েছে।'

'মানে?'

'কিছুদিন আগে ও আমার অফিসে এসেছিলো।'

'বলো কি!'

'হ্যাঁ, তাই। মনে হলো খুবই বিচলিত। প্রথমটাতে ওর বক্তব্য শুনে আমি খুবই ক্ষেপে গিয়েছিলাম—জানোই তো, চিরকালই আমি হট হেডেড। তবে তারপর মাথা ঠাণ্ডা করে ওকে অনেক আশ্বাস দিয়েছি। বলেছি, আমার দিক থেকে ওর আশঙ্কার কোনো কারণ নেই। কিন্তু তাতে ও কতোটা আশ্বস্ত হয়েছে, তা বলা কঠিন।'

'অনেক উন্নতি হয়েছে দেখছি,' অনুভব হেসে ফেললো। 'একা একা ওর পক্ষে এতোটা যাতায়াত করা, তোমার সঙ্গে দেখা করে সরাসরি অভিযোগ জানানো—তাও আবার অফিসে গিয়ে—ইটস রিয়্যালি সামথিং।'

'বুঝতেই পারছো, ও কতোটা ওয়ারিড। নইলে অমন বেপরোয়া হয়ে আমার কাছে ছুটে আসে কখনও? প্লিজ অনুভব, ওকে এমন অশান্তির মধ্যে রেখো না। টেলিভিশনের সোপ অপেরা তোমার ভালো না লাগলে, পছন্দ মতো সিনেমার ক্যাসেট এনে বাড়িতে বসে দুজনে মিলে দ্যাখো। ওর শপিং করতে ভালো না লাগলে, গাড়ি নিয়ে কোনোদিন বেলুড়-দক্ষিণেশ্বর বা কোনোদিন অন্য কোথাও বেড়াতে চলে যাও। মাঝে মাঝে হাটখোলায় ওর দিদির বাড়িতে সারপ্রাইজ ভিজিট দাও—তাঁরা তো ওর খুব প্রিয়, তাই আইডিয়াটা নিশ্চয়ই ওর পছন্দ হবে।

মোটকথা ট্রাই টু কমপ্রোমাইজ, গট মাই পয়েন্ট?'

'দেখি।'

'ফাইন।' জানলার পর্দা সরিয়ে বাইরের দিকে তাকালো রূপসা, 'বৃষ্টিটা একটু ধরেছে।'

'পুরোটা ধরুক। তারপর ওঠার কথা ভাববো।'

'ফের যদি বাড়ে?'

'ফের অপেক্ষা করবো।'

'ততোক্ষণে রাস্তায় যদি জল দাঁড়িয়ে যায়?'

'তাহলে রাতটা এখানেই কাটিয়ে যাবো।' অনুভব মিটিমিটি হাসে।

'পাগল নাকি? আরতি ভাববে না?'

'ফোন করে জানিয়ে দেবো,' অনুভব শরীর এলিয়ে বসে।

'কি জানাবে? তুমি আমার সঙ্গে এক বাড়িতে রাত কাটাচ্ছো? তাহলে কেলেঙ্কারির আর কিছু বাকি থাকবে ভেবেছো?' রূপসার চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়।

'এক বাড়িতে রাত কাটাবো, এক বিছানায় তো নয়! তাছাড়া এ বাড়িতে তুমি একা থাকো নাকি? সুদূরও তো রয়েছে।'

'তাতে কিছু এসে যায় না। ওসব ছাড়ো, বাড়িতে তোমাকে ফিরতেই হবে—তা যতো রাতই হোক না কেন।'

'তার মানে তুমি ভয় পাচ্ছো।'

'এতে মোটেই তা প্রমাণ হয় না।'

'আসলে তোমার সব চাইতে বেশি ভয় নিজেকে।'

'এই নিয়ে আমি এখন তোমার সঙ্গে আদৌ কোনো তর্কে জড়াতে চাই না। কারণ এতোক্ষণ কথায় কথায় আসল কথাটাই আমরা ভুলে গেছি।'

'এগুলো তাহলে নকল কথা? আসল কথা নয়?'

'বাজে কথা ছাড়ো। তুমি আজ কি মতলবে এসেছো, তা বললে না তো?'

'বলে ফেললেই তো উঠতে বলবে। তাছাড়া বলার মতো সুযোগই বা এতোক্ষণ পেলাম কোথায়?'

'অনুভব, প্লিজ স্টপ ইওর গৌরচন্দ্রিকা। বলো, কি বলবে?'

'সুদূর ইতিমধ্যে একদিন আমার অফিসে গিয়েছিলো,' সংক্ষেপে বললো অনুভব। রূপসা কিছু না বলে অপেক্ষা করে রইলো।

'কথাটা শুনে তুমি কিন্তু একটুও অবাক হলে না।' ফের বললো অনুভব।

'না, কারণ আমি এটাই আশা করেছিলাম। তবে অন্য একটা কথা ভেবে একটু অবাক লাগছে।'

'কি?'

'আরতি আমার কাছে এসেছে, আর সুদূর তোমার কাছে গেছে। অথচ দুজনের উদ্দেশ্য কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। একজন সম্পর্কটাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছে, আর একজন সেটাকে ভেঙে ফেলার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। আশ্চর্য, তাই না?'

'তুমি কি করে জানলে যে সুদূর আমাকে ... ও কি তোমাকে কিছু বলেছে?'

'না, কিন্তু আমি জানি। ও ইঙ্গিত দিয়েছে, স্পষ্ট ইঙ্গিত। ওকে বুঝতে আমার ভুল হয় না। কিছুদিন আগে ও তুহিন-সোনালির সঙ্গেও দেখা করেছে, যাতে ওরা আমাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ডিভোর্সের জন্যে রাজি করায়।'

'তোমাকে তা কে বললো?'

'সোনালি আমার অফিসে এসেছিলো।'

'ওরা কি পুরো ব্যাপারটা জানে?'

'সুদূর খানিকটা বলেছে, মানে কথা প্রসঙ্গে বলতেই হয়েছে। বাকিটা আমি সোনালিকে জানিয়ে দিয়েছি। তবে জানিয়ে ঠিক করেছি কি না, বুঝতে পারছি না। হয়তো না বললেই ভালো হতো। কিন্তু তখন আমার যে কি হয়ে গেলো—ঝোঁকের মাথায় সব বলে ফেলাম সোনালিকে। কাজটা বোধহয় ঠিক হয়নি, তাই না?'

'তেমন কোনো ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হয় না। কারণ সোনা এ কথা তুহিন ছাড়া আর কাউকে বলবে না—ওর ওপরে এটুকু আস্থা নিশ্চয়ই রাখা যায়। আর তুহিন কথাটা শুনে, বড়োজোর আমার সঙ্গেই আলোচনা করতে আসবে। অতএব এ ব্যাপারে তোমাকে অনর্থক মাথা না ঘামালেও চলবে।'

'সুদূর তোমার সঙ্গে দেখা করে কি বলেছে, বললে না তো? নিশ্চয়ই আমাকে রাজি করাবার জন্যে তোমাকে সাহায্য করতে বলেছে?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর?'

'আমি রাজি হয়েছি।'

'তুমি?' উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ায় রূপসা।

'ব্যস্ত হয়ো না, বোসো। আমি ওকে সাহায্য করবো, কারণ তাতে তোমাকে সাহায্য করা হবে। ডাক্তারের প্রসঙ্গটা আপাতত তুলছি না, সুদূর তাতে রাজি হবে না। তবে আমি ওকে একটু বাজিয়ে দেখতে চাই। যদি প্রমাণ করে দিতে পারি যে ওর অক্ষমতাটা মানসিক—শারীরিক নয়, তাহলে তখন ওকে একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে অনেক সহজ হবে। অ্যাম আই ক্লিয়ার?'

'কিন্তু সেটা কিভাবে করবে?'

'তার দায়িত্ব আমার, তবে তুমি যদি আমাকে সে দায়িত্ব নেবার অনুমতি দাও।'

'অনুমতির প্রশ্ন উঠছে কেন?'

'সুদূর ভুলে গেছে বা ভুলে যেতে চাইছে, যে ও সক্ষম। একটা মারাত্মক ধাক্কা দিয়ে, বলতে পারো একটা ঝাঁকুনি বা শক দিয়ে, এটা ওকে মনে করিয়ে দিতে হবে। বোঝাতে হবে, ওর ধারণাটা মিথ্যে। তারপরের ব্যাপারটা ডাক্তারের সাহায্যে স্বাভাবিক হয়ে উঠবে বলেই আমার ধারণা। তবে ওকে ওই ঝাঁকুনি দেবার জন্যে যে পথ আমি বেছে নিতে চাইছি, সেটা অনেকের কাছেই অস্বাভাবিক বলে মনে হবে। তুমি কি ভরসা করে আমার হাতে ওকে ছেড়ে দিতে পারবে?'

'যার হাতে নিজেকেই নিশ্চিন্ত মনে ছেড়ে দিতে পারি ... '

'থাক, ওটা আমাকে বিশ্বাস করতে বোলো না।' উঠে গিয়ে জানলার পর্দা সরিয়ে বাইরের দিকে তাকালো অনুভব, 'বৃষ্টি থেমে গেছে। তুমি বরং একটা ঠোঙায় আমার ভিজে পোশাকগুলো গুছিয়ে দাও। আমি এবারে যাবো।'

নিঃশব্দে স্নানঘর থেকে অনুভবের ছেড়ে রাখা পোশাকগুলো নিয়ে এসে, একটা পলিথিলিনের ব্যাগে সেগুলোকে গুছিয়ে দিলো রূপসা। তারপর বন্ধ দরজাটা খোলার জন্যে ছিটকিনিতে হাত রেখেও ঘুরে দাঁড়ালো অনুভবের দিকে।

'আমার ওপরে তোমার বড্ড অভিমান, তাই না অনুভব? সারা জীবন আমি তোমার কাছ থেকে শুধু পেয়েই এলাম, বিনিময়ে কোনোদিনও কিছু দিলাম না।'

'আই লাভ ইউ, রূপসী!' ব্যাগটা মেঝেতে রেখে, সাগ্রহে ওর কাঁধ দুটো আঁকড়ে ধরলো অনুভব। তারপর প্রায় অস্ফুট গাঢ় স্বরে বললো, 'তুমি একবার, শুধু একটি বার বলো, দ্যাট ইউ লাভ মি টু। দ্যাট উইল বি এনাফ ফর মি, আমি আর কোনোদিনও তোমাব কাছে কিছু চাইবো না। নেভার।'

'আই কেয়ার ফর ইউ।' বিষণ্ণ সন্ধ্যার মতো অনুভবের মুখের দিকে মুখ তুলে তাকালো রূপসা, 'তুমি আব কিছু শুনতে চেও না, অনুভব। প্লিজ!'

'তুমি এতো নিষ্ঠুর, এতো কৃপণ।' অসহায় আর্তনাদের মতো শোনালো অনুভবের ম্লান কণ্ঠস্বর।

রূপসার অবাধ্য চোখ দুটো জলে ভরে উঠলো। ও বুঝতে পারছিলো, অনুভবের ব্যাকুল ঠোঁট ক্রমশ ওর তৃষ্ণার্ত ঠোঁটের দিকে এগিযে আসছে। বুঝতে পারছিলো, ওর নিজের আতপ্ত শরীরে আচমকা জেগে উঠেছে খাণ্ডবদহনের লেলিহান আগুন। তার উত্তাপে লাল হয়ে উঠেছে ওর সারা মুখ। আগুনের দুটো তরল স্রোত দ্রুত নেমে যাচ্ছে ওর নাভিমূল ছাড়িয়ে দুই অশক্ত উরুব দিকে। তীব্র প্রতিরোধ সত্ত্বেও বরফের কাঠিন্যে ফাটল ধরছে। একটু একটু করে গলে যাচ্ছে, তরল হচ্ছে, জমাট তুষাবেব স্তূপ। রূপসা বুঝতে পারছিলো এক বন্য প্রত্যাশায় ওর গোপনাঙ্গ আর্দ্র হয়ে উঠেছে, দৃঢ় হয়েছে উদগ্রীব দুটি স্তনবৃন্ত! তবু ও নিজের মুখ সরালো না। কিন্তু হাত বাড়িযে অনুভবেব আগ্রাসী মুখখানার গতিবোধ করলো।

'না!'

এক মুহূর্ত একটু থমকে রইলো অনুভব। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো রূপসার প্রায় ধূসর রঙের চোখ দুটির দিকে, যেখানে ওর নাকচাবির সঙ্গে রঙ মিলিয়ে ঝিলমিল করছিলো উন্মুখ দুটি অশ্রুবিন্দু। ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস হতাশায় ভরিয়ে তুললো দুজনের ব্যাপক ব্যবধান। নিচু গলায় অনুভব বললো, 'দরজাটা খোলা। আমি এবারে যাবো।'

দোরগোড়ায় দাড়িয়ে অনুভবকে ক্লান্ত পদক্ষেপে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যেতে দেখলো রূপসা। বুকের ভেতরটা দুমড়ে মুচড়ে কান্না এলো ওর।

অনুভব জানলো না, কোনোদিনও জানবে না—আজ এই অহল্যা মুহূর্তে শাবীরিক ও মানসিকভাবে তার কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলো রূপসা। অথচ তাকে ও ফিরিয়ে দিলো। অকারণে।

৬

নিয়ন-উজ্জ্বল চওড়া রাস্তা ধরে যেতে যেতে এক সময় বাঁ দিকে মোড় ঘুরে, ঘড়ির দিকে এক ঝলক তাকালো অনুভব। প্রায় নটা। রাস্তায় লোকজন তেমন নেই। কদিনের একঘেয়ে টিপটিপে বৃষ্টি মানুষকে বোধহয় তাড়াতাড়ি গৃহের নিরাপত্তায় ফিরে যেতে বাধ্য করেছে। নেহাত কোনো জরুরি প্রয়োজন থাকলে আলাদা কথা। তবে 'জরুরি প্রয়োজন' শব্দটাও বোধহয় আপেক্ষিক। ঝড়জল সত্ত্বেও মধ্যরাতের উদ্দাম উন্মত্ততা কিছু কিছু মানুষের কাছে জরুরি প্রয়োজন বলে মনে হতে পারে। তাই শহরের বিশেষ বিশেষ 'স্পট' প্রাকৃতিক বিপর্যয় সত্ত্বেও জনহীনতায় তেমন করে বিপর্যস্ত হয় না। অন্তত অনুভব তাই মনে করে। আসলে বিজ্ঞাপন জগতের সঙ্গে জড়িত থাকার সুবাদে বিভিন্ন সুযোগে নৈশ কলকাতার কিছু কিছু আশ্চর্য রূপ দেখে অনুভবের মনে এ ধরনের একটা বিশ্বাস ক্রমশ দৃঢ় হয়ে উঠেছে। তাই আবহাওয়ার এমন অবনতি সত্ত্বেও সুদূরের সঙ্গে পূর্ব-নির্ধারিত সাক্ষাৎকারের সময়-সূচী সে এতোটুকু রদবদল করেনি। বরং বুক ঠুকে বেরিয়ে পড়েছে উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিখাদ সঙ্কল্প নিয়ে। এখন সবই ললাট-লিপি আর হাতযশের ব্যাপার।

আড় চোখে পাশে বসে থাকা সুদূরের দিকে পলকের জন্যে তাকালো অনুভব। গম্ভীর, নির্লিপ্ত, নির্বিকার। হয়তো বা উদাসীন। অথবা উদাসীনতার অভিনয়। কি ভাবছে ও এখন? না কি কিছুই ভাবছে না, মনটা একেবারে শূন্য? কোনো কৌতূহলও কি নেই ওর? এক বিন্দুও না? না কি প্রচ্ছন্ন সচেতনতায় মুখে একটা নৈর্ব্যক্তিকতার মুখোশ এঁটে রেখেছে অতি সন্তর্পণে, যাতে অনুভব ওর কৌতূহলের আভাসটুকু পর্যন্ত না পায়? কিন্তু কেন? কি প্রমাণ করতে চাইছে সুদূর? ও কি বোঝাতে চাইছে যে অনুভবের সমস্ত প্রচেষ্টাই আসলে অর্থহীন এবং তা জেনেও অনুভবকে ও একটা সুযোগ দিয়েছে, যাতে অনুভব শেষ অব্দি ওর প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায়?

'কি রে, একেবারে ঠাণ্ডা মেরে গেলি যে?' জিগেস করলো অনুভব। প্রশ্নটার পেছনে কোনো উদ্দেশ্য ছিলো না, শুধু নীরবতা ভাঙার উদ্দেশ্যটুকু ছাড়া।

সুদূর কোনো জবাব দিলো না।

'ভয় করছে নাকি?'

'ভয়?' সুদূরের কণ্ঠস্বরে বিস্ময়ের বাঞ্ছিত প্রকাশ, 'নাঃ, ভয় করবে কেন? তুই কি আমাকে কিডন্যাপ করছিস নাকি?'

'কৌতূহল হচ্ছে না? জানতে ইচ্ছে করছে না, আমি তোকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি?'

'করছে, তবে মাত্রাছাড়া কৌতূহল নেই। তুই নিয়ে যাচ্ছিস, কিন্তু তোর

উদ্দেশ্যটা আমি জানি না। যে কোনো কারণেই হোক, তুই আমাকে তা জানাতে চাইছিস না। তবে জানবো নিশ্চয়ই, একটু দেরি হবে—এই যা। আর এটুকু জানি, তুই আমার কোনো ক্ষতি করবি না।'

'এ বিশ্বাসটা কি তোর সত্যিই আছে? নাকি আমার মনরাখা কথা?'

'না তা নয়। কারণ আমি জানি ... ' কি যেন বলতে গিয়েও থেমে গেলো সুদূর।

'কি জানিস?'

'আমি জানি, রূপসাকে তুই সুখী দেখতে চাস।'

'তার মানে তুই বলতে চাইছিস, রূপসা মাঝখানে আছে বলেই আমি তোর কোনো অনিষ্ট হতে দেবো না। তাই তো?'

'ঠিক তা নয়। তবে এটাও সত্যি যে রূপসার গায়ে এতোটুকু আঁচ লাগলে, তোর কাছে তা অসহ্য হয়ে ওঠে। অস্বীকার করতে পারবি?'

'না।'

'তুই আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিবি?'

'চেষ্টা করবো।'

'আমি রূপকে যা দিতে পারছি না, তুই ওকে তা দিচ্ছিস না কেন? নিশ্চয়ই আমার কথা ভেবে নয়?'

'না।'

'তবে? তোরা তো যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ, তবু কেন ও এভাবে বঞ্চিত হয়ে থাকছে?'

'তুই একটা গাড়ল। রূপসা তোর কাছে যা পাবার আশা করে, আমি শত চেষ্টা করেও ওকে তা দিতে পারবো না। কোনোদিনও না। এতোদিনে তুই এটুকু বুঝতে পারলি না?'

সুদূর নিশ্চুপ হয়ে রইলো। এই মুহূর্তে পাঁজরের নিচে সেই অস্বস্তিকর যন্ত্রণাটা ফের তাকে বিব্রত করে তুলেছে। যন্ত্রণাটা কিসের তা আজও জানা হলো না। হয়তো হবেও না কোনোদিন। আসলে জানার ইচ্ছেটাই মরে যাচ্ছে একটু একটু করে।

গাড়ি থামিয়ে অনুভব বললো, 'এসে গেছি।'

'কোথায়?'

'জাহান্নাম বলতে পারিস। আয়, আজ তোকে এমন একটা জিনিস দেখাবো যা তুই কোনোদিন কল্পনাও করতে পারিসনি।'

পাড়াটা সুবিধের নয়। বহু ছিঁচকে চোর এ অঞ্চলে নানান ধান্দায় ঘুরে বেড়ায়। হয়তো ফিরে এসে গাড়ির হেড লাইট বা টেইল লাইট কিংবা ব্যাটারিটা পাওয়া যাবে না। চাই কি পুরো গাড়িটাও লোপাট হয়ে যেতে পারে। গাড়ি লক করে, বিপরীত ফুটপাথের সিগারেটের দোকানিকে পাঁচটা টাকা দিয়ে গাড়ির দিকে একটু নজর রাখতে অনুরোধ করলো অনুভব। সেই সঙ্গে গাড়ি নিখুঁত অবস্থায় পাওয়া গেলে আরও পাঁচটা টাকা দেবার নিখাদ অঙ্গীকার। এই অবকাশে পাশের বাড়িটার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিলো সুদূর। অন্ধকার গায়ে মেখে অতিকায় কোনো প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর জীর্ণ কঙ্কালের মতো কোনোমতে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাড়িটা।

অধিকাংশ পলেস্তারাই খসে পড়েছে। দাঁত বের করা লোনা ধরা ইটের ফাঁক ফোকড় থেকে ইতস্তত বেরিয়ে এসেছে অনেক আগাছা আর বট-অশ্বত্থের সতেজ শরীর। কি আশ্চর্য প্রাণশক্তি এই উদ্ভিদগুলোর। এই অনুর্বর পোড়ামাটির বুক থেকেও ওরা যে কি করে প্রাণরস সংগ্রহ করে নেয়, তা সত্যিই এক নিদারুণ বিস্ময়।

খোলা সদর দিয়ে ভেতরে ঢোকার সময় দারোয়ান গোছের লোকটা একবার বিস্ময়হীন দৃষ্টি মেলে ওদের দিকে তাকালো। কিছু জিগেস করলো না, নিজের টুল ছেড়েও উঠলো না। সিঁড়িঘরের উঁচু সিলিং থেকে দুটো সরু তারকে অবলম্বন করে একটা স্বল্প পাওয়ারের বাল্‌ব ঝুলছে। চারদিকে আবছা ভৌতিক আলো। ডান দিকে ঘেঁষে ইংরেজ আমলে তৈরি কাঠের চওড়া সিঁড়ি দুটো ভাঁজ কেটে দোতলার দিকে উঠে গেছে। কেমন যেন গা ছমছমে পরিবেশ। হিচককের মুভির মতো রহস্যময়।

সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে অনুভব চাপা গলায় বললো, 'এখানে তুই যা কিছু দেখবি, এখান থেকে বেরিয়েই ভুলে যাবার চেষ্টা করবি। সম্ভব হলে বাড়িটার হদিশই মুছে ফেলবি মন থেকে। কেমন?'

'তাহলে তুই মনে রেখেছিস কেন?'

'বলতে পারিস, ওয়ান অফ দোজ অকুপেশনাল হ্যাজার্ডস। এটা একটা বিশেষ ধরনের ঠেক। সময়-অসময়ে এগুলো অনেক কাজে আসে। তাই এ রকম নানান ধরনের ঠেকের খুঁটিনাটি আমাদের জেনে রাখতে হয়। এক সাংবাদিক বন্ধু আমাকে এ জায়গাটা চিনিয়ে দিয়েছিলো।'

'এটা কিসের ঠেক?' সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে জিগেস করলো সুদূর।

'গৃহস্থ বাড়ির ব-কলমে এটা একটা হাই সোসাইটির ব্রথেল। এখানে ঘন্টা হিসাবে ঘর ভাড়া পাওয়া যায়। বাইরে থেকে পার্টনার নিয়ে আসা চলে। আর এখান থেকে কাউকে পছন্দ করলে, তাকেও দক্ষিণা দিতে হয়—পার শট অথবা পার আওয়ার। ড্রিংকসও অ্যাভেইলেবল, অফকোর্স এগেইনস্ট এক্সট্রা মানি।'

'আমাকে এখানে নিয়ে এলি কেন?' সুদূরের গলা কেঁপে উঠলো।

'একটা জিনিস দেখাবো বলে। আয়—'

সুদূরের হাত ধরে প্রায় টানতে টানতে দোতলায় এসে উঠলো অনুভব। লক্ষ্য করলো, সুদূরের আপাত নির্বিকার মুখটা ইতিমধ্যে পুরোপুরি ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। মৃদু হাসলো অনুভব, 'ভয় পাচ্ছিস কেন? আমি তো রয়েছি, তোকে ফেলে পালাবো না। আমি সত্যিই তোর কোনো ক্ষতি হতে দেবো না। প্রমিস।'

সিঁড়ির ঠিক মুখোমুখি পিতলের মোটা কড়া লাগানো দু পাল্লার বিশাল দরজা। ডান দিক আর বাঁ দিকে আরও দু জোড়া। অনুভব ফের বললো, 'কিছুদিন আগে ক্রিকেটার ইমরান খাঁর একটা ব্লো-আপ সারা বিশ্বে ছেলে-ছোকরাদের মধ্যে প্রচণ্ড সাড়া ফেলে দিয়েছিলো। ইমরানের টি-শার্টে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা ছিলো, বিগ বয়েজ প্লে অ্যাট নাইট। মনে আছে তো? এখানে বিগ বয়রা কিন্তু দিবারাত্রিই খেলা করে। ম্যানলি গেম। এটা তাদের একটা হ্যাপি হান্টিং গ্রাউণ্ড।'

'প্রতিবেশীরা কেউ কিছু বলে না?'

'পাগল হয়েছিস? যেচে কেউ সাপের গর্তে হাত দেয়?'

'মানে?'

'কতো ইনফ্লুয়েনসিয়াল লোক এখানে পায়ের ধুলো দেন, জানিস? তাঁদের অসুবিধে ঘটাবার দায়িত্ব কি কেউ নিতে চায়?'

'পুলিস?'

'আসে না। এলেও, আগেভাগে তার খবর পৌঁছে যায়।'

সামনের দরজায় ডোর বেলের বোতামে মৃদু চাপ দেয় অনুভব, 'কোনো কিছুতেই অবাক বা অপ্রস্তুত হবি না। স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা কর।'

পকেট থেকে রুমাল বের করে কপাল মুছলো সুদূর, 'আমি এ প্রহসনের কোনো অর্থ বুঝতে পারছি না।'

'পারবি।'

সুদূর ফের কিছু বলার আগেই চাবি ঘোরানোর শব্দ শোনা গেলো। নিরাপত্তার শেকল লাগিয়ে ঈষৎ উন্মুক্ত করা হলো দরজার একটি মাত্র পাল্লা। স্বল্প পরিসরে যতোটুকু দেখা যায় তাতে সুদূরের মনে হলো, মেয়েটি সম্ভবত একজন পরিচারিকা। সে কিছু বলার আগেই অনুভব দরজার ফাঁক দিয়ে নিজের কার্ডটা ভেতরে চালান করে দিলো। মেয়েটি মৃদু হেসে, দরজা তেমনি ঈষৎ উন্মুক্ত রেখেই, বিনা বাক্যব্যয়ে ফের উধাও হয়ে গেলো।

'মেয়েটি কিন্তু ঠিক করলো না,' অনুভব বললো।

'কি?'

'যদিও ও আমাকে চেনে, কিন্তু দরজাটা ওর পুরোপুরি বন্ধ করে যাবার কথা।'

'হয়তো চেনে বলেই বন্ধ করেনি। ও তো তোকে দেখে হাসলো।'

'হুঁ।'

'চেনে, তবু কার্ড দিলি কেন?'

'সেটাই নিয়ম।'

'যদি কার্ড না থাকে?'

'প্রপার আইডেন্টিফিকেশনের জন্যে অন্য একজন আসতো।'

'তুই প্রায়ই এখানে আসিস বুঝি?'

'মাঝে মাঝে না এসে উপায় থাকে না।' অনুভব ম্লান হাসলো, 'তখন খুব ঘেন্না হয় নিজের ওপরে। মনে হয়, কোম্পানির গোলামি করছি বলে ওরা আমাকে দিয়ে বেশ্যার দালালিও করিয়ে নিচ্ছে—আর আমিও শালা মুখ বুজে তাই করে যাচ্ছি। তখন মনে হয় চাকরির মুখে জুতো মেরে চলে আসি, তারপর যা হবার হবে। কিন্তু শেষ অব্দি কিছুই হয় না। পরদিন সকালে আবার টাই বেঁধে যথানিয়মে ঠিক অফিসে গিয়ে হাজির হই।'

আচমকা মি. দাভের কথা মনে পড়লো সুদূরের। আর ঠিক তখুনি মেয়েটি হুক থেকে শেকল নামিয়ে দরজার একটি পাল্লা খুলে ধরলো, 'আইয়ে সাহাব।'

সুদূর দেখলো মেয়েটির মুখে আন্তরিক হাসি ফুটে উঠেছে।

'তুমি ভালো আছো, সরোজা?' অনুভব প্রশ্ন করলো।

'জি সাহাব।'

ওয়ালেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে ওর দিকে এগিয়ে ধরলো অনুভব, 'এই নাও, তোমার মেয়েকে ক্যাডবেরি কিনে দিও।'

মাথা নিচু করে সসঙ্কোচে ঘাড় নাড়লো মেয়েটি, 'নেহি, মাফ কিজিয়ে সাহাব। কৃপা করকে মুঝে দুসরা কোই কাম দিজিয়ে।'

'কাজ কি এতো চট করে পাওয়া যায়, সরোজা? তবে তোমার কথা আমার মনে আছে। তেমন কোনো খোঁজ পেলে আমি নিজে এসে তোমাকে খবর দিয়ে যাবো। কেমন? এবারে এটা নাও তো, এটা তোমার মেয়েকে আমার উপহার।'

কৃতার্থ ভঙ্গিতে মৃদু হেসে হাত বাড়িয়ে টাকাটা নেয় সরোজ। তারপর ওদের বসতে বলে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

'বেচারী। আমাকে ও যে কি ভেবে নিয়েছে কে জানে।' স্বগতোক্তির মতো অস্ফুটে বললো অনুভব।

'কেন?'

'এখানকার চাকবিতে মাইনেটা বড়ো কথা নয়, বকশিশই আসল। অথচ ও আমার কাছ থেকে কিছুতেই বকশিশ নিতে চায় না। অন্য কোনো কাজ দেখে দেবার জন্যে বারবার কাকুতি মিনতি করে।' সোফায় বসে সিগারেট ধরায় অনুভব, 'ওর স্বামী ট্রাক চালাতো। আ্যাকসিডেন্টে শরীরের নিচের দিকটা সম্পূর্ণ প্যারালাইজড হয়ে গেছে। আজ দু বছর হলো সে শয্যাগত। সরোজাই এখন সংসার চালায়। ও যে কি করে এখানে এসে জুটলো তা আর জিগেস করার সুযোগ হয়নি। তবে এ কাজটা ওর পছন্দ নয়। ইদানীং দেখা হলেই একটা কাজ খুঁজে দিতে বলে—যে কোনো কাজ—ভদ্র পরিবেশে। কিন্তু তেমন কাজ করে কটা টাকা ও রোজগার করবে! তাই দিয়ে সংসার খরচ, স্বামীর চিকিৎসা, দুটো বাচ্চা ... এখানে আর যাই হোক বকশিশ নিয়ে রোজগার তো খুব একটা খারাপ হয় না। আসলে এখানে ও বোধহয় ভয় পায়।'

'কিসের ভয?'

'লোভ। লোভে খারাপ হয়ে যাবার ভয়।'

সুদূর হয়তো কিছু বলতো। কিন্তু তার আগেই পর্দা সরিয়ে এক মহিলা ঘরে এসে ঢুকলেন। ঠোঁটে কফি রঙের গাঢ় লিপস্টিক। আই লাইনার শোভিত তীক্ষ্ণ চোখে সুস্পষ্ট বুদ্ধির ঝিলিক। পার্ম করা চুল। নাভির নিচে পরা জামরঙের স্বচ্ছ শাড়িতে নামমাত্র আব্রুরক্ষার সচেতন প্রয়াস। এ ধরনের মহিলারা কক্ষনো ট্রামে বাসে যাতায়াত করেন না।

'ওয়েলকাম, মি সেন!' মহিলার দাঁতগুলো রোম্যান্টিক জোৎস্না ছড়ালো, 'এবারে কিন্তু অনেক দিন বাদে এলেন। দরকার ছাড়া আমাদের কথা মনে পড়তে নেই বুঝি?'

'কি যে বলেন, মিসেস সুদ!' অনুভব বিগলিত হলো, 'আপনার কথা কি কোনো পুরুষমানুষের পক্ষে ভুলে থাকা সম্ভব?'

'থাক, আর বেশি বলবেন না। মন দুর্বল হয়ে পড়বে, সামলাতে পারবো না!' নবীনা যুবতীর মতো শরীর কাঁপিয়ে হাসলেন মহিলা। ওঁর প্রয়োগ নৈপুণ্যে চমৎকৃত হলো সুদূর।

'একটু হুইস্কি দিতে বলি? রয়্যাল চ্যালেঞ্জ?' জিগেস করলেন মিসেস সুদ।

'না না, আপনি ব্যস্ত হবেন না।' অনুভব ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

'তাহলে ট্যাংগো? জিন উইথ অরেঞ্জ স্কোয়াশ? গরমে ভালো লাগবে, শরীর জুড়োবে।'

'আপনি কিন্তু মিছিমিছি ব্যস্ত হচ্ছেন, মিসেস সুদ। এখন ওসব থাক, কিচ্ছু লাগবে না।'

'ঠিক আছে, তাহলে একটু চা বা কফি দিতে বলি।'

'ওহো! আপনি কেন এতো ফর্মাল হচ্ছেন, বলুন তো? আমি কি আজ এখানে নতুন এলাম?'

অনুভবের কণ্ঠস্বরে অসহ্য ন্যাকামোপনা। ও যেন অতিরিক্ত ঘরোয়া হবার চেষ্টা করছে মহিলার সঙ্গে। ব্যাপারটা ঠিক পছন্দ হয় না সুদূরের। অনুভব কেন এমন তোয়াজ করছে মহিলাকে? ওঁর কাছে অনুভব কি কোনো কারণে উপকৃত? হতে পারে। অনেক গল্প উপন্যাসেই এ জাতীয় ঘটনার উল্লেখ আছে। কতো বয়েস মহিলার? ভালো করে দেখলে মনে হয় চল্লিশের ঊর্ধ্বে। কিন্তু চট করে বিচার করতে গেলে ঠকে যাবার সম্ভাবনাই বেশি। গায়ের রঙে খুব একটা চমক না থাকলেও মালিন্য নেই। চেহারা এতোটুকু টসকায়নি, বয়েস যেন থমকে গেছে পঁয়ত্রিশে পৌঁছে। কোমরে মেদের ঢল নামেনি, কিন্তু নিতম্বের শোভা সম্ভবত যে কোনো নারীর চোখেই ঈর্ষণীয়। শুধু হাসার সময় চোখের দু কোণ সামান্য কুঁচকে ওঠে, তাছাড়া মুখের কোথাও কোনো ভাঁজ নেই। গলার চামড়া এখনও মসৃণ। তাছাড়া ওর দীঘল গলার ব্লাউজ থেকে উদাসীনের মতো উঁকি মেরে থাকা বুকের ভাঁজটার দিকে অকস্মাৎ চোখ পড়লে, যে কোনো পুরুষেরই দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইবে।

'আরে বাবা, আপনি না হয় পুরনো বন্ধু। কিন্তু আপনার এই বন্ধুটি? উনি কি করে বুঝবেন যে গেস্টদের সব দিক দিয়ে এন্টারটেইন করাই আমাদের মটো অ্যাণ্ড ট্রাডিশন? আপনি কি আমাদের বদনাম করাতে চান নাকি?'

মহিলা কি অবাঙালী? অনুভব তো ওঁকে 'মিসেস সুদ' বলে সম্বোধন করছে। তাহলে উনি এতো সাবলীল বাংলা বলছেন কি করে? অবিশ্যি বলা যায় না— হয়তো উনি নিজে বাঙালী, বিয়ে করেছেন অবাঙালীকে। অথবা অবাঙালী হয়েও জন্ম থেকেই উনি হয়তো কলকাতায় মানুষ। কিংবা এটা হয়তো আদপেই ওঁর সত্যিকারের নাম নয়। হয়তো ছদ্ম পরিচয়। মরুকগে যাক, সুদূর এসব নিয়ে অনর্থক মাথা ঘামাবে কেন?

'আসলে আজ আমরা হাতে খুব কম সময় নিয়ে এসেছি, মিসেস সুদ। ওসব আর একদিনের জন্যে তোলা থাক, প্লিজ।' অনুভব এবারে গলার সুর বদলালো, 'ও হ্যাঁ, আমার বন্ধুটির সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি। এ আমার খুব

নিকট বন্ধু—অসিতাভ, অসিতাভ সিনহা। আর অসিতাভ, তুই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিস—ইনিই সেই মিসেস সুদ, যাঁর কথা আমি তোকে অনেক বলেছি।'

যাঃ শালা, আমার নাম গোত্র সবই যে বদলে গেলো! এটাই কি এখানকার রীতি? তা এখন কি ওঁকে আমার হাতজোড় করে নমস্কার জানানো উচিত?

সুদূর কিছু বলার আগেই মিসেস সুদ হিন্দি সিনেমার নায়িকাদের মতো এক টুকরো মদির হাসি ঠোঁটে মেখে নিজের নিটোল ডান হাতখানা সুদূরের দিকে এগিয়ে দিলেন, 'গ্ল্যাড টু মিট ইউ, মি. সিনহা। আপনি মি. সেনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু—এখানকার দরজা আপনার জন্যে সব সময় খোলা রইলো। যখনই রিল্যাক্স করার ইচ্ছে হবে, সোজা চলে আসবেন।' মিসেস সুদ আন্তরিক ঘনিষ্ঠ সুরে সুদূরকে আশ্বস্ত করতে থাকেন, 'এখানে আপনার কোনো অসুবিধে হবে না। কোনো চিন্তা নেই। আপনার বন্ধু নিশ্চয়ই আপনাকে সব কিছু খুলে বলেছেন। তবু বলে রাখি, রিলায়েবাল রেফারেন্স ছাড়া, আমি নতুন কোনো গেস্টকে এখানে অ্যাকসিড করি না। এখানে যাঁরা আসেন, তাঁরা প্রত্যেকেই আমার অনারেবল গেস্ট। এখানে এসে তাঁদের কাউকে কোনোদিনও কোনো আনওয়ান্টেড ঝামেলা ফেস করতে হয়নি, হবেও না—এটা আমার গ্যারান্টি। আর আমার মেয়েরা প্রত্যেকেই ভীষ-ষণ ভালো। কেউ স্টুডেন্ট, কেউ চাকরি করে, কেউ বা হাউস ওয়াইফ। কাজেই বুঝতেই পারছেন ...'

মিসেস সুদ কথা শেষ করার আগেই অনুভব উঠে গিয়ে ওঁর পাশে বসলো। মহিলা কথা থামিয়ে অনুভবের দিকে তাকালেন। অনুভব খুব নিচু গলায় ওঁকে কি যেন বলতে শুরু করলো, সুদূরের শুনতে ইচ্ছে করলো না। সে লক্ষ্য করলো, কমার্শিয়াল প্লাইয়ের পার্টিশন লাগিয়ে এই এক চিলতে বসার জায়গাটাকে অন্য একটা ঘর থেকে আলাদা করে নেওয়া হয়েছে। যে পর্দাটা সরিয়ে মিসেস সুদ এখানে এসেছিলেন, তার ওধার থেকে 'লাভ ইন সি মাইনর'-এর সুর ভেসে আসছে। মাঝে মাঝে নারীকণ্ঠে টুকরো টুকরো অস্পষ্ট সংলাপ। অধিকাংশই ইংরেজিতে। চাপা হাসি। আসলে হোরস আর ওয়েটিং দেয়ার। আ বাঞ্চ অফ হোরস। কিন্তু অনুভব আমাকে এখানে নিয়ে এলো কেন? হোয়াই?

সুদূর দেখলো, অনুভব কয়েকটা বড়ো সাইজের নোট মহিলার হাতে তুলে দিচ্ছে। মহিলা হাসিমুখে নোটগুলো নিলেন, গুনে দেখলেন, তারপর হাসিটা ঈষৎ রহস্যের মোড়কে জড়িয়ে অনুযোগের সুরে বললেন, 'এতো তাড়াহুড়োর কিন্তু সত্যিই কোনো দরকার ছিলো না, মি. সেন। আপনি তো আর পালিয়ে যাচ্ছেন না!'

'তা নয়, মিসেস সুদ। কিন্তু আপনি তো জানেন, জুয়া মদ আর এসব ব্যাপারে কক্ষনো খাতির করে কিছু বাকি রাখতে নেই। এটাই তো এসব ব্যবসার নিয়ম!'

'আপনার সঙ্গে আমাদের তাহলে শুধু ব্যবসার সম্পর্ক?' মিসেস সুদ নিপুণ কটাক্ষ ছুঁড়লেন।

'না, ঠিক তা নয়। তবে রীতিটা বোধহয় না ভাঙাই ভালো। তাই নয় কি?'

'ঠিক আছে, আসুন।' মহিলা ডান হাতে পর্দা সরিয়ে সুদূরের দিকে তাকালেন, 'আসুন ভাই।'

মিসেস সুদের পেছনে অনুভব আর অনুভবকে অনুসরণ করে সুদূর পর্দা সরিয়ে

ওধারের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। সামনের প্লাসটিক ইমালশন লাগানো আইভরি কালারের দেয়ালে ক্রুশবিদ্ধ যীশু। ডান দিকের দেয়ালে কথাকলির মহার্ঘ মুখোশ। বাঁ দিকের দেয়ালটা ফাঁকা। ওখানে বোধহয় ব্লু-লেগুনের ধারে দাঁড়ানো বুক শিল্ডসের পূর্ণাবয়ব পোস্টার থাকার কথা। কিংবা আফ্রিকার কোনো নির্জন সমুদ্রতটে আনমনা বো ডেরিক। ঘরের একধারে দামী মিউজিক সিস্টেম। দুটো সোফা আর একটা ডিভানে ছড়ানো ছেটানো গুটিকয়েক যুবতী। কেউ কেউ গল্পগুজব করছে, যার বিষয়বস্তু নিঃসন্দেহে চটুল। দু-একজনের হাতে ফ্যাশান কিংবা সিনেমা সংক্রান্ত ম্যাগাজিন। প্রায় প্রত্যেকেরই ঠোঁটে অথবা আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট। ক্যাসেটটা শেষ হয়ে গিয়েছিলো। একটি মেয়ে উঠে গিয়ে সেটা বদলে দিলো।

ওদের দেখে ঘরের গুঞ্জন বন্ধ হলো।

'বারবারা?'

'ইয়েস ম্যাম?' একটি মেয়ে উঠে দাঁড়ালো।

মিসেস সুদ মেয়েটির কাছে এগিয়ে গিয়ে, ওর বাঁ কাঁধে হাত রেখে নিচু গলায় কিছু বললেন। মেয়েটি ঘাড় নেড়ে সায় জানালো। মহিলা এবারে অনুভবের দিকে ফিরে তাকালেন, 'সি ইজ বারবারা, জেম অফ আ গার্ল। ও আপনাদের নিয়ে যাবে। ও কে?'

'ও. কে, থ্যাংক ইউ।' যথাসম্ভব বিগলিত ভঙ্গিতে হাসলো অনুভব।

বারবারা হাসিমুখে ওদের পেরিয়ে গিয়ে, বাঁ দিকের উঁচু দরজাটা খুলে এক পাশে সরে দাঁড়ালো, 'প্লিজ।'

দরজা দিয়ে বেরিয়ে একটা সরু প্যাসেজ, কিংবা করিডোর। দু ধারে পার্টিশন করা ছোটো ছোটো কুঠুরি। সম্ভবত প্রয়োজনের তাগিদে একটা বড়ো হলঘরকে এভাবে টুকরো টুকরো করে নেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনটা কিসের, তা ভাবতে গিয়ে সুদূরের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো।

পেছনের দরজাটা টেনে দিয়ে মেয়েটি খুশিয়াল ভঙ্গিতে সুদূরের দিকে ডান হাত এগিয়ে দিলো, 'হাই হ্যাণ্ডসাম! আই ডিডন্ট এক্সপেক্ট ইউ রিয়্যালি!'

সুদূর যন্ত্রের মতো হাত বাড়ালো। নির্বাক। ঠোঁটে সৌজন্যের হাসিও ফুটলো না।

'আমি এখেনে সোপ্তাহে তিন দিন আসি। সর্ট অফ সাইড বিজনেস, ইউ নো—পার্টটাইম লাভার!' মেয়েটি মিষ্টি করে হাসলো, 'এখেনে আমি কিন্তু বারবারা। তুমি আবার আসল নামটা বলে ফেলো না, কেমন?'

'আমি তো তা জানি না!' কোনোক্রমে বললো সুদূর।

'তুমি আমাকে চেনো না?' বারবারা অবাক হলো।

'না তো!' সুদূর সচকিত হলো। কি বলতে চায় মেয়েটা?

'আমি মিশেল, রূপসা আমার কলিগ। একবার আমাদের অফিসে তোমার সঙ্গে আলাপ হলো, ডোন্ট ইউ রিমেম্বার?'

আচমকা সুদূরের মনে হলো, বহু কাল সে জলের আস্বাদ পায়নি। ঠোঁট জিভ

গলা—সব যেন প্রবল তৃষ্ণায় আকুল। অথচ বুকের মধ্যে সাত সমুদ্রের উতল-পাতাল ঢেউ মাতামাতি করছে অবুঝ আকাঙ্ক্ষার মতো। এ কি অসহ্য পরিস্থিতি! এ কোথায় তাকে নিয়ে এলো অনুভব? কেন, কি প্রয়োজন ছিলো এর? এর পরে কি করে সে রূপসার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে?

লজ্জা ঘেন্না রাগ ও অপমানে মরে যেতে ইচ্ছে করলো সুদূরের।

মেয়েটি কি তার মনের কথা বুঝতে পারলো? তাই বোধহয় সুদূরের মুখের কাছাকাছি মুখ এনে ও প্রায় ফিসফিসিয়ে বললো, 'ভয় নেই। এখেনে সবাই এথিক্স মেনে চলে। সো—' নাচের ভঙ্গিমায় বাদামী রঙের হাত দুটি ঘুরিয়ে বারবারা, কিংবা মিশেল, একটা চলতি গানের প্রথম লাইনটি গাইলো, 'ডোন্ট ওয়ারি, বি হ্যাপি!' তারপর উঁচু হিলের জুতোয় ক্লিক ক্লিক শব্দ তুলে আর নিটোল নিতম্বে অহঙ্কারী হিল্লোল জাগিয়ে সটান এগিয়ে গেলো সামনের দিকে।

হাত বাড়িয়ে সুদূরের একটা অবসন্ন হাত নিজের হাতে তুলে নিলো অনুভব, 'আয়।'

'না,' হাত ছাড়িয়ে নিলো সুদূর।

'কেন?'

'আমার অসহ্য লাগছে।'

'কি অসহ্য লাগছে?'

'সবকিছু। আমি আর এক মুহূর্তও এখানে থাকতে চাই না।'

'তুই আমাকে কথা দিয়েছিলি। মনে নেই?'

'কিন্তু ... '

'কথা বাড়াস না, আয়। প্লিজ।'

করিডোরের একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছে থমকে দাঁড়ালো মিশেল। তারপর ডান দিকের উঁচু কপাটের নবে হাত রেখে, এক চিলতে রহস্যময় হাসি ছড়ালো সুদূরের দিকে তাকিয়ে, 'নাউ, গেট রেডি টু ওয়্যাচ দা গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ।'

'শুরু হয়েছে?' জিগেস করলো অনুভব।

'জাস্ট নাউ।'

দরজা খুলে গেলো। অনুভবের পেছন পেছন প্রায় অন্ধকার ঘরটাতে ঢুকে প্রথমে প্রায় কিছুই দেখতে পেলো না সুদূর। তাদের সামনে দু সারি চেয়ার। অধিকাংশই ভর্তি। ডান দিকে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে পাশাপাশি কয়েকটা খালি চেয়ারের সন্ধান পেলো মিশেল। কিংবা এগুলোর সন্ধান ও হয়তো আগে থেকেই জানতো। প্রথমে বসলো অনুভব, তারপর সুদূর এবং সুদূরের পাশে মিশেল। বসেই মিশেল ফিসফিসিয়ে জানালো, সামনে এক সারি চেয়ার থাকলেও ওদের কোনো অসুবিধে হবে না। কিসের অসুবিধে? ওর দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করলো সুদূর। এবং পরক্ষণেই মিশেলের ইঙ্গিতে সামনের দিকে তাকিয়ে তার শরীরের ভেতরটা শিরশির করে উঠলো।

সুদূর দেখলো, তার চোখের সামনে আবছা নীলাভ আলোর জ্যোৎস্নায় পর পর তিনটে বড়ো বড়ো ডিভান পাতা রয়েছে। এবং মাঝখানের ডিভানটাতে সম্পূর্ণ

অনাবৃত শরীরে নিবিড় মৈথুনে মগ্ন হয়ে রয়েছে এক জোড়া মানব-মানবী।

নিজের চোখ দুটোকে আদপেই বিশ্বাস করতে পারছিলো না সুদূর। বুঝতে পারছিলো না সে জেগে রয়েছে, নাকি স্বপ্ন দেখছে। সন্দেহ হচ্ছিলো এটা তার চিরপরিচিত কলকাতা, নাকি সে ভুল করে এসে পড়েছে অন্য কোনো নিষিদ্ধ শহরে। এ কি আশ্চর্য দৃশ্য রচিত হয়েছে তার চোখের সামনে! একি বাস্তব, নাকি অভিনয়? চ্যানেলে হালকা মিউজিক ভেসে আসছে, আর তারই তালে তালে ছন্দিত হয়ে উঠছে ওই স্বপ্ননীল শরীর দুটো। ওদের কাছে বাদবাকি গোটা বিশ্বের যেন কোনো অস্তিত্ব নেই—কেউ নেই, কিছু নেই—শুধু ওরা দুজনে ছাড়া। পরস্পরকে ওরা চুমু খাচ্ছে, আদর করছে, সোহাগ জানাচ্ছে গভীর আশ্লেষে—আবার পরক্ষণেই আঁচড়াচ্ছে, কামড়াচ্ছে, উৎপীড়ন করছে কামনার্ত দুটো আদিম বন্য জন্তুর মতো। ওদের শীৎকার আর ঘনঘন গভীর নিঃশ্বাস নিঃশেষে মিশে যাচ্ছে দর্শকদের অস্ফুট উচ্ছ্বাসে।

'লাইভ শো। এ জন্যে ওরা ভালো টাকা পায়,' ফিসফিসিয়ে সুদূরকে বললো অনুভব। তারপর নিষ্পলক দৃষ্টি মেলে রাখলো সুদূরের দিকে।

'ওরা কারা?' জিগেস করলো সুদূর।

'বোধহয় অ্যামেরিকান ট্যুরিস্ট,' মিশেল বললো। 'স্যাডার স্ট্রীটের অনেক হোটেলের সঙ্গে আমাদের বোবস্থা করা আছে। পয়সার দরকার থাকলে অনেক ট্যুরিস্টই এভাবে শো করতে রাজি হয়।'

'ওরা কি হাজব্যাণ্ড অ্যাণ্ড ওয়াইফ?'

'নট নেসেসারিলি।'

দর্শকদের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নেয় সুদূর। নীলকান্ত আলোর ছটায় মুখের জ্যামিতি তেমন করে বোঝা না গেলেও এটুকু স্পষ্টই বোঝা যায় যে এঁদের মধ্যে মহিলার সংখ্যাও নেহাত কম নয়। সকলেই উদগ্রীব, সকলের মধ্যেই চাপা অস্থিরতা। কাব অবাধ্য হাত যে কার উন্মুখ শরীরের তল্লাশি নিচ্ছে, সে দিকে কোনো পক্ষেরই কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। সকলেই এক আকুল উৎকণ্ঠা নিয়ে একাগ্র হয়ে তাকিয়ে রয়েছে সামনের ওই ডিভানের দিকে, অপরিসীম ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করছে কোনো রোমাঞ্চকর চরম মুহূর্তের প্রত্যাশায়।

হঠাৎ আলোব রঙ একটু একটু করে লালচে হয়ে উঠতেই মৃদু হর্ষধ্বনি উঠলো দর্শকদের মধ্যে। আর সেই সঙ্গে সুদূর বুঝতে পারলো, মিশেল তার একটা হাত টেনে নিয়ে নিজের নরম বুকে চেপে ধরেছে। তার কানের লতিতে রঙিন ঠোঁট ছুঁইয়ে ও চুপিচুপি বলছে, 'ওদিকে দ্যাখো। কিন্তু আমি তোমাকে আরও বেটার ট্রিট দেবো, আই প্রমিস।'

দর্শকদের হর্ষধ্বনির কারণ এতোক্ষণে উপলব্ধি করলো সুদূর। সে দেখলো, আলোর রঙের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির ভূমিকাও বদলে গেছে। আগ্রাসী ভঙ্গিতে মেয়েটি এখন বিপরীত আসনে রত। বাজনার তালে তালে ক্রমশ আরও গতিময় হয়ে উঠছে ওর লীলায়িত পেলব শরীর। এবং সঙ্গমরত ওই নির্লজ্জ যুগলের উদ্দেশ্যে আবেশ পুলক ও উত্তেজনা মাখানো অসংখ্য অস্ফুট অব্যয় ছুঁড়ে ছুঁড়ে

দিচ্ছে সমবেত অভিজাত দর্শকমণ্ডলী।

সুদূরের মনে হয়, ঝাঁকে ঝাঁকে অসংখ্য অনাহূত ঝিঁঝি পোকা তার রক্তের গভীরে উচ্চকিত গুঞ্জন জাগিয়ে তুলেছে। নিজের অজান্তে তার অবাধ্য হাত ক্রমশ উৎসাহী হয়ে উঠছে, সজোরে চেপে ধরছে মিশেলের নিটোল স্তন দুটিকে। কোথায় যেন জাদুকরের ডুগডুগি বাজছে। সেই বাজনার তালে তালে ঘুম ভাঙছে নিশীথ অরণ্যের। হৃৎপিণ্ডের মধ্যে উদ্দাম করতালিতে মুখর হয়ে উঠছে শত শত সাঁওতাল শিশু। শ্বেত পাথরের আধারে হেমলক নিয়ে অপেক্ষা করছে অনিন্দিতা এক স্বচ্ছবসনা সুন্দরী। দুরন্ত এক স্বাস্থ্যবান শ্বেত অশ্ব অবাধ কেশরের ঐশ্বর্য বাতাসে উড়িয়ে, নিষ্ঠুরের মতো উদ্দাম গতিতে দিশাহীন হয়ে ছুটে চলেছে সুদূরকে পিঠে নিয়ে। সুদূর আর পারছে না, পারছে না ওই দুর্বার গতির সঙ্গে তাল রাখতে। সে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়তে চায়, বিশ্রাম চায়, একটু ঘুমোতে চায়।

আচমকা নিজের হাতটা মিশেলের শরীর থেকে টেনে এনে সচেষ্ট প্রয়াসে উঠে দাঁড়ায় সুদূর। তারপর অনুভবের দিকে তাকিয়ে সংক্ষেপে বলে, 'আমি যাবো। এক্ষুনি।'

অনুভব কি বিস্মিত হলো? বুঝতে পারলো না সুদূর। কিন্তু সে লক্ষ্য করলো, মুখে কিছু না বলে অনুভব চোখের ইঙ্গিতে মিশেলকে উঠতে বললো।

ঘরের বাইরে এসে দরজাটা টেনে দিলো মিশেল। তারপর দ্রুত পা চালিয়ে, সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া সুদূরের একটা হাত নিজের মুঠোয় তুলে নিলো, 'লেট আস গো দেয়ার।' ইঙ্গিতে একটা কুঠুরির দিকে দেখালো ও।

'নো, থ্যাংকস।'

'সারি?' মিশেলের কণ্ঠস্বরে বিস্ময়ের জোনাকি।

'প্লিজ লিভ মি অ্যালোন।'

'ডোন্ট বি সিলি, ডার্লিং!' মিশেলের ঠোঁটে মৃদু হাসির ছোঁয়া লাগে, 'আয়্যাম নট গোয়িং টু টেল ইট টু দা বার্ডস।'

সুদূর কোনো জবাব দেয় না। কিন্তু সে পা বাড়াবার আগেই চোখের পলকে এক হাতে পরনের ঢিলেঢালা টি শার্টটা ওপরের দিকে টেনে তুলে, অন্য হাতে নিজের অবারিত স্তন দুটিকে উঁচু করে তুলে ধরে মিশেল, 'ডোন্ট ইউ লাইক দেম? দে আর লাভলি আই বিলিভ!'

'ইয়েস, দে আর,' সুদূর বুঝতে পারে তার গলা খসখসে হয়ে উঠেছে।

'তাহলে?'

'প্লিজ লিভ মি অ্যালোন, আই সেইড।' ওপরের দিকে মুখ তুলে চোখ বন্ধ করে সুদূর।

'কাওয়ার্ড! মিশেলের ঠোঁট দুটি বিতৃষ্ণা কিংবা হতাশায় কুঁচকে ওঠে, 'আর ইউ আ ভয়ার? অর আ ইউনাক?'

সুদূরের চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই সারা মুখে রাশি রাশি বিরক্তির অভিব্যক্তি নিয়ে গটমট করে এগিয়ে যায় মিশেল। এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই সুদূর স্পষ্ট বুঝতে পারে, তার শরীর জেগে উঠেছে।

অনুভব এতোক্ষণ নির্বাক দর্শকের মতো নিস্পন্দ ছিলো। এবারে সে এগিয়ে গিয়ে সুদূরের কাঁধে হাত রাখলো, 'চল।'

'কোথায়?' ভীষণ চমকে ওঠে সুদূর।

'এ বাড়ির বাইরে।'

'না।'

'মানে?'

'তুই যা,' ফিসফিসিয়ে সুদূর বলে, 'আমার দেরি হবে।'

'না,' অনুভবের মুঠি দৃঢ় হয়ে সুদূরের কাঁধে চেপে বসে। 'কোনো সিন ক্রিয়েট করার চেষ্টা করিস না, সুদূর। ইটস বেটার টু গো নাউ।'

'অ্যাণ্ড আই সেইড, নো। আমি এখন যাবো না।'

'কেন?'

'স্ক্রু ইজ দা ওয়র্ড। আই শ্যাল টিচ হার আ গুড লেসন ... দ্যাট বিচ ... ' সুদূরের চোখ দুটো চকচক করে ওঠে, 'ইয়েস, আই ক্যান ডু ইট, অনুভব! বিলিভ মি, আই ফিল আই ক্যান ডু ইট ... নাউ ... '

'নট নাউ,' সুদূরের একটা হাত নিজের মুঠোয় টেনে নিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে সামনের দিকে এগিয়ে যায় অনুভব।

মিনিট দুয়েকের মধ্যেই বৃষ্টি ধরে গেলো, তবু ওয়াইপার দুটো বন্ধ করলো না অনুভব। কোথাও একটা লুজ কানেকশান আছে, গত দুদিন ধবে ওয়াইপার একবার বন্ধ করলে, সহজে ফের চালু করা যাচ্ছে না। অথচ যুদ্ধের সম্ভাবনা থাকলে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যথাসম্ভব প্রস্তুত থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ কিছুই বলা যায় না—এখন নেই, কিন্তু আকাশের যা অবস্থা তাতে যে কোনো মুহূর্তেই ফের বৃষ্টি নামতে পারে। তখন ওয়াইপার চালু না থাকলে ভীষণ ঝামেলা। ভিজিবিলিটি বিলো নরমাল হলে গাড়ি চালানো বন্ধ করে দিতে ইচ্ছে করে অনুভবেব।

এখন বৃষ্টি নেই, কিন্তু রাস্তায় লোকজন এবং যানবাহন দুই-ই বেশ কম। বৃষ্টি নেই, তবু পথঘাট এখনও দস্তুরমতো সপসপে। ধুলো ময়লার আবরণ কেটে গেছে অনেকটা। মায়ের মুখে অনুভব শুনেছে, আগে কর্পোরেশনের কর্মীরা নাকি রাত থাকতে উঠে হোস পাইপ দিযে হাইড্রান্ট থেকে গঙ্গার জল তুলে রাস্তা ধুইয়ে দিতো প্রতিদিন। লম্বা ঝাঁটা দিয়ে রাস্তা ঝাঁড় দিতো ঝাড়ুদাররা। রাস্তা সারাই হতো গভীর রাতে। আর সন্ধেবেলা কিছু কিছু মানুষ কাঁধে মই নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াতো। চিমনি সাফ করে রাস্তায় গ্যাস ফিলামেন্টগুলো জ্বেলে দিয়ে যেতো তারা।

মায়ের মুখে সেসব গল্প শোনা আজ কতোদিন আগেকার কথা! যেন গতজন্মের স্মৃতি। নস্টালজিয়া। কিন্তু কোনো দাম নেই ও সমস্ত সেন্টিমেন্টের। ওগুলো মানুষকে পেছনে টেনে রাখে। প্র্যাকটিক্যাল হতে গেলে ওগুলোকে অপ্রয়োজনীয় অ্যাপেনডিক্সের মতো ছেঁটে ফেলতে হয় জীবন থেকে। নইলে অহেতুক বোঝা বাড়ে।

ড্যাশবোর্ডে রাখা প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট ঠোঁটে ঝুলিয়ে প্যাকেটটা সুদূরের দিকে ঠেলে দেয় অনুভব। সুদূর হাত বাড়ায় না। উইণ্ডশিল্ড দিয়ে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকে সামনের দিকে।

'কিরে, ধরাবি না?' এক হাতে লাইটার জ্বেলে প্রশ্ন করে অনুভব।

'না।'

'কেন?'

'এমনি।'

'এমনি মানে?'

'এমনি মানে এমনি! জাস্ট এমনি। কোনো কারণ নেই। হয়েছে?'

মৃদু হেসে দু কাঁধে সামান্য ঝাঁকুনি তোলে অনুভব। তারপর আড় চোখে তাকায় সুদূরের দিকে।

'রাগ করেছিস?'

সুদূর কোনো জবাব দেয় না।

'কিরে, বলবি না?'

'কি?'

'রাগ করেছিস?'

'তুই কি ভেবেছিস আমাকে?' সুদূর তীক্ষ্ণ চোখে অনুভবের দিকে তাকায়, 'ছেলেমানুষ, না কি পুতুল?'

'কোনোটাই নয়,' সুদূরের কাঁধে নিজের বাঁ হাতটা মেলে দেয় অনুভব।

'তাহলে?'

'তাহলে কি?'

'কেন আমাকে ওখানে নিয়ে গিয়েছিলি? আর কেনই বা অমন করে ..

'ফিরিয়ে আনলাম, তাই তো?' সুদূরের মুখের কথা কেড়ে নেয় অনুভব। 'যদি বলি, তোকে ওখানে নিয়ে গিয়েছিলাম তোর অভিজ্ঞতার ঝুলিটা একটু ভারি করে দেবার জন্যে? একটা নতুন জিনিস, যা তোর কল্পনারও বাইরে ছিলো, তা তোকে দেখাবার জন্যে? তাহলে বিশ্বাস করবি?'

'না।'

'কেন?'

'এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে, কোনো উদ্দেশ্য আছে।'

'ঠিক বলেছিস।'

খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো অনুভব। তারপব আস্তে আস্তে, একটু একটু করে, নির্স্পৃহ ভঙ্গিতে বললো, 'নিয়ে গিয়েছিলাম তোর হারিয়ে যাওয়া আত্মবিশ্বাসকে ফিরিয়ে আনতে, অ্যাণ্ড আয়্যাম সাকসেসফুল—আয়্যাম রিলিভড। আর জোর করে কেন ফিবিয়ে আনলাম, তার জবাবটা তোকেই খুঁজে নিতে হবে।'

হাত বাড়িয়ে সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নেয় সুদূর। শরীরের মধ্যে একটা দমচাপা অস্বস্তি। পর পর কয়েক রাত ঠিকমতো ঘুম না হলে যেমন হয়। সমস্ত ঘটনাটার মর্মার্থ এখন একটু একটু করে স্পষ্ট হয়ে উঠছে তার কাছে। লজ্জা

লাগছে। অনুভবের ওপরে রাগ দেখিয়েছিলো বলে এখন রাগ হচ্ছে নিজের ওপরে।

'অনুভব—'

'বল।'

'তুই কিছু মনে করিস না। আমার মাথার ঠিক নেই।'

'এবারে মনে করবো, যদি তুই ফের এ ধরনের মেয়েলি ন্যাকামোপনা করিস।'

সাদার্ন অ্যাভিনিউতে ঢুকে খানিকটা এগিয়েই থমকে দাঁড়াতে হলো। একটা সরকারী বাস রাস্তার মাঝখানে তেরছা হয়ে থেমে রয়েছে। ব্রেক ডাউন বোধহয়। তবু, সম্ভবত চালকের পরামর্শমতো, কয়েকজন হতভাগা যাত্রী আপ্রাণ চেষ্টা করছে, ঠেলাঠেলি করে যদি ভাগ্যক্রমে বাসটার মৃতদেহে প্রাণ ফেরানো যায়। এখন টিপটিপে বৃষ্টি আর সেই সঙ্গে লোডশেডিং শুরু হলে, ওদের ভোগান্তির ষোলোকলা একেবারে পরিপূর্ণ হতো।

'আমি বরং এখানেই নেমে যাই, অনুভব।' সুদূর বললো, 'তুই গাড়ি ঘুরিয়ে নে।'

'কেন?'

'তোকে তো আবার উলটো দিকে যেতে হবে। টালিগঞ্জ ফাঁড়ি পেরিয়ে সেই নিউ আলিপুর।'

'তো?'

'এমনিতেই বেশ রাত হয়ে গেছে। তাছাড়া ও দিকের ওই ব্রিজটার মুখে মাঝেমাঝেই গাড়ির জট জমে। আরও দেরি হলে আরতি চিন্তা করবে।'

'চিন্তা করবে না, ওর অভ্যেস আছে। তাছাড়া ও জানে. আজ আমার ফিরতে দেরি হবে।'

'তাহলেও ... মিছিমিছি তুই এতোটা পথ আর কেন যাবি! এটুকু যেতে আমার কোনো অসুবিধে হবে না। একটা অটো ঠিকই পেয়ে যাবো।'

'কেন, এখন আমি তোর বাড়িতে গেলে খুব অসুবিধে হবে বুঝি?' সুযোগ পেয়ে রসিকতা করলো অনুভব।

'তুই কথা ঘোরাচ্ছিস, ' সুদূর আরক্তিম হলো।

'লজ্জা পেলি?'

'বাজে বকিস না।'

'তাহলে চুপ করে বসে থাক।'

গাড়ি ব্যাক করে কয়েকটা অলিগলি ঘুরে ফের সাদার্ন অ্যাভিনিউতে এসে পড়লো ওরা। তারপর দেখতে দেখতে বাড়ি।

সুদূর গাড়ি থেকে নামতেই অনুভব বললো, 'খুব বেশি রাত কিন্তু হয়নি। তোর হাতে এখনও অনেক সময়! আচ্ছা, গুড নাইট।'

'সেকি!' সুদূর অবাক হলো, 'তুই নামবি না?'

'নাঃ, আজ থাক।'

'এক কাপ চা অন্তত খেয়ে গেলে হতো না?'

'ক্ষেপেছিস? এখন চা বানাতে বললে তোর বউ আমাকে ঠ্যাঙাবে।'

'ওর সঙ্গে দেখা না করেই চলে যাবি?'

'আজ থাক। আজ শুধু এই রাত তোমার আমার।'

'তোকে একটা কথা জিগেস করবো ভাবছিলাম।'

'কি?'

'রূপ কি কিছু জানে?'

'কোন বিষয়ে?'

'আজকের ব্যাপারটা? মানে আমরা কোথায় গিয়েছিলাম ... '

মুহূর্তের জন্যে দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা চেপে ধরলো অনুভব। তার মানে সুদূর ধরেই নিয়েছে যে এই পূর্বপরিকল্পিত ঘটনার সমস্ত কথাই সে সুদূরের অগোচরে রূপসাকে জানিয়ে রেখেছে। সুদূর কি তাকে একটু খোঁচা দেবার চেষ্টা করলো? ও কি অনুতপ্ত? নাকি ভয় পাচ্ছে রূপসাকে?

'না। কিন্তু আমার ধারণা, ও আজকের প্রসঙ্গে তোকে কিছু জিগেস করবে না। হয়তো কিছু অনুমান করে নেবে।'

'আমার কিছু ভাবতে ভালো লাগছে না। আই ফিল গিলটি।'

'বোকা! এতো চিন্তা করছিস কেন? রিল্যাক্স। আজকের ব্যাপারটাতে তোর কোনো দায়িত্ব ছিলো না। তাহলে তুই নিজেকে দোষী ভাববি কেন?'

'জানি না,' সুদূর দীর্ঘশ্বাস ফেললো, 'কিন্তু ভাবনাটাকে তাড়াতে পারছি না।'

'স্টুপিড!' সামান্য হাসলো অনুভব, 'যা, আর কথা বাড়াস না। রূপসা তোর জন্যে অপেক্ষা করছে।'

'আচ্ছা, গুড নাইট।'

'গুড নাইট। অ্যাণ্ড অল দ্য বেস্ট।'

দ্রুত উধাও হতে থাকা গাড়িটার উদ্দেশ্যে একবার বোকার মতো হাত নাড়লো সুদূর। তারপর এক দুই তিন করে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে নিজের ফ্ল্যাটের দরজায় এসে দাঁড়ালো।

দরজা খুলতে বোধহয় খানিকটা বেশি সময় নিলো রূপসা। ও কি একটু গুছিয়ে নিলো নিজেকে? না কি সুদূরকেই সামলে নেবার সুযোগ দিলো খানিকটা? কি করছিলো ও এতোক্ষণ? ভাবতে ভাবতে জুতো খুললো সুদূর।

মিউজিক সিস্টেমটা নিশ্চুপ। তার মানে রূপসা গান বাজনায় তন্ময় ছিলো না। আসলে ও পারতপক্ষে যন্ত্রটাকে ছোঁয় না। হঠাৎ কোনো গান—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওয়েস্টার্ন—শুনতে ইচ্ছে হলে সুদূরকে ক্যাসেট চালাতে বলে। টেলিভিশনও বন্ধ। তার মানে এতোক্ষণ ও কোনো বই নিয়ে বিছানায় গড়াচ্ছিলো। হয়তো পড়ছিলো, কিংবা খোলা বই নিয়ে কিছু ভাবছিলো আপন মনে। অথবা একটা চেয়ার নিয়ে বসেছিলো ব্যালকনিতে—যেটা ওর একটা ভীষণ প্রিয় নেশা। কিন্তু শুয়ে থাক বা বসে থাক—আসলে ও কিছু ভাবছিলো। এবং কি ভাবছিলো, তা বোধহয় সুদূরের অজানা নয়।

বাথরুমে হাতমুখ ধুতে গিয়ে হঠাৎ স্নান করার কথা মনে হলো। ঠিক ইচ্ছে নয়, বরং তাগিদ বলা যেতে পারে। হাসপাতাল টাসপাতাল থেকে রোগী দেখে বাড়িতে

ফিরলে অনেক সময় মনে এ রকম তাগিদ জাগে। খানিকটা ক্লিন্নতার অনুভূতি। এতো রাতে সুদূর কোনোদিনই স্নান করে না। আগে খুব ইচ্ছে হলে মাকে জিগেস করতো, মা বারণ করতেন। বলতেন, 'তোমার অভ্যেস নেই, ঠাণ্ডা লেগে যাবে।' এখন রূপসাকে জিগেস করে। এবং প্রতিবার রূপসা একই ভঙ্গিতে জবাব দেয়, 'ইচ্ছে হলে, শরীরে সইবে বলে মনে করলে—করবে। এতে জিগেস করার কি আছে? তুমি কি ছেলেমানুষ?' জবাবটা পছন্দ হয় না সুদূরের। তবু পরের বার আবার জিগেস করে। আজ আর তা করলো না। আজ এই মুহূর্তে স্নান করা ভীষণ জরুরি। ঠাণ্ডা লাগলে লাগবে, কিচ্ছু করার নেই।

রূপসা টেবিল সাজিয়ে অপেক্ষা করছিলো। স্নানের পর নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করে টেবিলে বসেই সিগারেট ধরায় সুদূর। রূপসা টুকিটাকি কাজ সেরে নিচ্ছে। বারবার ঘোরাফেরা করছে রান্নাঘর আর খাওয়ার ঘরে। সুদূরের চোখ দুটো অনবরত ওকে অনুসরণ করতে থাকে। কাঁধের কাছে আচমকা থমকে যাওয়া প্রায় বাদামী রঙের ঈষৎ ঢেউ খেলানো চুল। মুখে ময়েশ্চারাইজারের স্নেহময় পিচ্ছিল প্রলেপ। পরনে স্ট্র্যাপ দেওয়া সুতির পাতলা রাত্রিবাস। অনাবৃত মসৃণ দুটি বাহু। নিটোল দুটি মুক্ত স্তনের মৃদু হিল্লোল। সুগঠিত উরু ও নিতম্ব। ধূসর চোখ দুটো যেন কোনো বিখ্যাত এলিজির শেষ দুটি পংক্তি—যা নিমেষের মধ্যে পড়ে ফেলা যায়, কিন্তু সঠিক কোনো অর্থ বোঝা যায় না। গোলাপী রঙের ঈষৎ পুরুষ্টু দুটি ঠোঁট যেন কোনো দুরন্ত নদীর স্তব্ধ হয়ে যাওয়া ঢেউ—যার মধ্যে আবেগ আছে কিন্তু উচ্ছলতা নেই, মমতা আছে কিন্তু প্রশ্রয় নেই। সব মিলিয়ে রহস্য আর আকর্ষণে ভরা জ্যোৎস্নাময় এক স্বপ্নের অরণ্য।

সুদূর একটু একটু করে ক্রমশ গভীর মুগ্ধতায় মগ্ন হয়ে যায়।

'অনেক রাত হয়েছে,' ফ্রিজ থেকে একটা জলের বোতল বের করে বললো রূপসা। 'তুমি জল খাবে?'

'না।'

'শুয়ে পড়োগে।'

'তুমিও চলো!'

'আমি হাতের কাজগুলো সেরে যাচ্ছি,' ঠোঁট থেকে জলের গ্লাস সরিয়ে রূপসা বললো।

'বেশ তো। তুমি কাজ করো, আমি বসছি।'

'খামোখা বসে থেকে কি লাভ?'

'বসে বসে তোমাকে দেখতে বেশ লাগছে।'

গ্লাসটা টেবিল নামিয়ে পূর্ণদৃষ্টিতে সুদূরের দিকে তাকালো রূপসা, 'কথাটা বিশ্বাস করতে লোভ হচ্ছে।'

'তার মানে, বিশ্বাস করলে না?'

'না।'

'কেন?'

'ইদানীং যে মানুষটা ডিভোর্স ছাড়া অন্য কোনো প্রসঙ্গে মুখ খুলতে চায় না, তার

মুখে কি এ কথাটা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়? না তা মানায়?'

'হয়তো মানায় না, হয়তো বিশ্বাসযোগ্য বলেও মনে হয় না।' মুহূর্তের অবকাশে সুদূরের স্নিগ্ধ মুখ শেষ বিকেলের মরা রোদের মতো বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। 'কারণ তোমার কাছে আমি প্রতিদিন একটু একটু করে নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু রূপ, এই একটু আগে আমি যে কথাটা বললাম তা কিন্তু ভীষণ সত্যি ছিলো। তোমার ভালোবাসার মতো সত্যি।'

'থ্যাংক ইউ।' নির্বিকার মুখে সুইচ বোর্ডের কাছে গিয়ে দাঁড়ায় রূপসা, 'আলো নেভাচ্ছি।'

নিরুত্তর হয়ে ওর মুখের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে সুদূর। তারপর শোবার ঘরের জানলার কাছে গিয়ে অস্থির ভঙ্গিতে দাঁড়ায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে আসে রূপসা। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে মাথায় চিরুনি চালাতে থাকে অনামনে। পায়ে পায়ে ওর পেছনে গিয়ে সুদূর আলতো করে ওকে জড়িয়ে ধরে। কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিসফিসিয়ে বলে, 'নো ওয়র্ডস টু সে, নো ওয়র্ডস টু কনভে/ দা ফিলিংস ইনসাইড আই হ্যাভ ফর ইউ/ ডিপ ইন মাই হার্ট।'

টেসি চ্যাপম্যানের গান। রূপসার ভীষণ প্রিয়। ভীষণ অবাক হয়ে আরশিতে সুদূরের দিকে তাকায় রূপসা।

ওর কাঁধ দুটো ধরে ওকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নেয় সুদূর। অন্যমনে কি যেন খোঁজে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে। পরক্ষণেই ত্রস্তহাতে টান মেরে খুলে দেয় ওর দু কাঁধে বিষণ্ণ হয়ে এলিয়ে থাকা রাত্রিবাসের গ্রন্থিল ফিতেগুলোকে।

সচেষ্ট প্রয়াস সত্ত্বেও দু হাতে রাত্রিবাসটাকে শরীরের সঙ্গে জড়িয়ে রাখতে ভুলে গেলো রূপসা। উপেক্ষিত আবরণ অর্থহীন বাহুল্যের মতো লুটিয়ে পড়লো পায়ের কাছে, অনাবৃত উদ্ধত যৌবন নিয়ে রূপসা দাঁড়িয়ে রইলো বিস্মিত ও বিহ্বল হয়ে। সুদূর অসংযত উন্মাদের মতো ওকে জাপটে ধরলো, তুমুল শিলাবৃষ্টির মতো অজস্র চুম্বন ছড়িয়ে দিতে লাগলো ওর ঠোঁটে আর গলায়। ওর স্তন আর উন্মুখ দুটি স্তনবৃন্তে। ওর উদ্বেলিত উরু আর উরুসন্ধিতে।

বিবশ চৈতন্য নিয়ে রূপসা অনুভব করলো, সুদূর ওর পায়ের কাছে হাঁটু মুড়ে বসে পড়েছে, দু হাতে ওকে বেষ্টন করে নিজের মুখটা সজোরে চেপে ধরেছে ওর নাভিমূলে। সুদূরের ঘন ঘন নিঃশ্বাসের উষ্ণ স্পর্শ ওকে ক্রমশ বিভোর করে তুলছে। এখন সমস্ত চেতনা জুড়ে শুধু এক প্রবল অস্থিরতা। সমস্ত শরীর যেন অকস্মাৎ জেগে ওঠা এক নিষ্ঠুর আগ্নেয়গিরি। থরথর করে কাঁপছে ত্রিভুবন। হা ঈশ্বর—কি দুরন্ত এই যন্ত্রণা, কি আশ্চর্য এই সুখ!

অকস্মাৎ রূপসা অনুভব করলো, ও বিছানায় শুয়ে রয়েছে আর একটা দুরন্ত হার্মাদের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে সুদূর ওর শরীরটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। ওকে সে লণ্ডভণ্ড করছে, তছনছ করছে। আঁচড়াচ্ছে, কামড়াচ্ছে। আদর করছে, সোহাগ জানাচ্ছে, ভালোবাসছে। কিন্তু রূপসা আর পারছে না, আর পারছে না সহ্য করতে। আর পারছে না অপেক্ষা করতে। এখন সম্পূর্ণ অসম্ভব ওর পক্ষে আরও ধৈর্য ধরে থাকা, আচ্ছন্নতার নাগপাশ থেকে চেতনাকে মুক্ত করে রাখা।

দুই আগ্রাসী বাহু এবং দুটি উত্তেজিত হাঁটুর বলিষ্ঠ কিলকে সুদূরের শরীরটাকে নিজের শরীরের সঙ্গে নিবিড় করে চেপে ধরলো রূপসা। চেপে ধরলো নিজের সমস্ত শক্তি ও সবটুকু আগ্রহকে একাগ্র করে।

অথচ ঠিক তখনই আচমকা কেমন যেন শান্ত হয়ে উঠলো সুদূর। নিষ্প্রাণ হয়ে উঠলো ওর গোটা শরীর। তারপরেই ছটফটিয়ে উঠলো সে।

'ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও রূপ—প্লিজ! আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।'

চকিত বিস্ময়ে শিথিল হলো রূপসা। আর সেই অবকাশে এক ঝটকায় উঠে বসে হাঁফাতে লাগলো সুদূর।

'কি হয়েছে?' ওর পিচ্ছিল পিঠে মুখ ছোঁয়ালো রূপসা।

'আমি পারছি না ... আমি পারবো না!' যেন অনেক দূর থেকে ভেসে এলো যন্ত্রণাবিদ্ধ একটা অসহায় মানুষের ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস।

খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো রূপসা। তারপর আলতো করে একখানা হাত সুদূরের কাঁধে রাখলো, 'তাতে কোনো ক্ষতি হয়নি। আমি অপেক্ষা করতে জানি। তুমি কেন লজ্জা পাচ্ছো আমাকে?'

রূপসার স্পর্শে শিউরে উঠলো সুদূর।

'মিথ্যে আশা নিয়ে আর কতোদিন তুমি অপেক্ষা করবে, রূপ? আরও কতো দিন এভাবে সহ্য করবে আমাকে?'

'যতো দিন তুমি স্বাভাবিক না হবে, ততোদিন।'

'তুমি আমাকে ঘৃণা করো, রূপ—প্লিজ। তুমি জানো না, আমার ভেতরটা ভারি নোংরা। আজেবাজে মেয়েদের সংস্পর্শে আমার শরীর জেগে ওঠে, অথচ তুমি ... তোমার কাছে ... জানি না কেন এমন হয়! সম্ভবত আমি একটা পারভার্ট। অ্যায়াম ট্র্যাপড ইন আ সার্কল অফ পারভার্শন।'

'আমি জানি না, এটা পারভার্শান কি না।' হাত বাড়িয়ে সুদূরের আনত মুখ নিজের দিকে তুলে ধরে রূপসা, 'কিন্তু যদি তাই হয়, সেটাও তো একটা অসুখ! মনের অসুখ। আমি জানি, চিকিৎসা করালে তুমি নিশ্চয়ই স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। বিশ্বাস রাখো, সুদূর—প্লিজ বিলিভ ইট!'

'আমি জানি না, আমি জানি না!'

রূপসার তরঙ্গিত বুকে মুখ রেখে অসহায় মৃণালের মতো থরথর করে কাঁপতে থাকে সুদূর।

'আর কতোদূর?' ছোট্ট রুমালে গলার ঘাম মুছে জিগেস করলো আরতি।

'এই তো, এসে গেছি প্রায়।' সামনের পথ থেকে চোখের দৃষ্টি গুটিয়ে এনে ওর দিকে এক পলক তাকালো অনুভব।

পশ্চিম আকাশে সূর্য এখন প্রায় অস্তমিত। দূর থেকে মাঝে মাঝে চিলের তীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে আসছে। অন্ধকারের স্পর্ধিত ষড়যন্ত্রে রোদের আলোকিত মহিমা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসায় ওরা বোধহয় ঈষৎ বিরক্ত। ভাদ্রের অসহ্য গুমোটে প্রকৃতি এখন অবসন্ন। আরতির সর্বাঙ্গে চিটপিটে ঘাম। ভেতরের জামাটা সম্পূর্ণ ভিজে

গেছে। সেই সঙ্গে বাতাসে মিশে থাকা গুঁড়ো গুঁড়ো ধুলোর অন্তরঙ্গ নৈকট্য একটা বিশ্রী ক্লেদাক্ত অনুভূতি ওর দেহ এবং মনে ক্রমশ ক্লান্তির বিষণ্ণ রেণু ছড়িয়ে দিচ্ছে। তবু এ পর্যন্ত ও কোনো বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেনি। মুখ বুজে সবকিছু সহ্য করে এসেছে। আসলে আজ ও দেখতে চায়, মানুষটা বাধা না পেলে কতোদূর খেয়ালী হয়ে উঠতে পারে।

ডান হাতে স্টিয়ারিং ধরে বাঁ হাতে আরতিকে কাছে টানলো অনুভব। সঙ্গে সঙ্গে হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিলো আরতি, 'অসভ্যতা করলে আমি এক্ষুনি গাড়ি থেকে নেমে যাবো।'

'সর্বনাশ! চলন্ত গাড়ি থেকে?' রসিকতা করলো অনুভব। 'আমার হাতে হাতকড়া পরাতে চাও নাকি?'

'বাজে কথা বলবে না, আমি একদম পছন্দ করি না। এই গরমে তোমার ইচ্ছেও করে!'

'করে,' মৃদু হাসলো অনুভব। 'একটা চুমু দেবে?'

'না।'

'তাহলে চা দাও। ঠোঁট দুটো বড্ড শুকিয়ে গেছে। ফ্লাস্কে আর চা আছে?'

'আছে।' পায়ের কাছে রাখা ছোট্ট বাস্কেট থেকে একটা কমলা বের করলো আরতি, 'কিন্তু এখন আর চা নয়। তার বদলে একটা লেবু খাও।'

'বিয়ার থেকে চা, চা থেকে লেবু!' এবারে শব্দ করে হাসলো অনুভব, 'এর পর চরণামৃত খেতে বলবে না তো?'

লেবুর খোসা ছাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে আরতি প্রসঙ্গ বদলাতে তৎপর হলো, 'আচ্ছা, ওখানে স্নানের সুবিধে পাওয়া যাবে তো? আমি কিন্তু পুকুরে বা ইঁদারার পাশে খোলা জায়গায় স্নান করতে পারবো না।'

'সুনন্দা নিশ্চয়ই তেমন জায়গায় স্নান করে না। কাজেই বাথটব বা শাওয়ার না পেলেও, বালতিতে তোলা জল আর চারদিক ঘেরা একটা কুঠুরি তুমি অবশ্যই পাবে।'

'তারপর?'

'তারপর আর কি? হ্যারিকেনের আবছা আলোয় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আমরা অন্ধকার থেকে ভেসে আসা ঝিঁঝির ডাক শুনবো। গল্প করবো। একটু দূরে রান্নাঘর থেকে সুনন্দার মাছ ভাজার গন্ধ ভেসে আসবে। তারপর মাটিতে আসন পেতে বসে সবাই মিলে গরম গরম ভাত, মুসুরির ডাল আর মাছভাজা খাবো। খাওয়াদাওয়ার পর সুনন্দা গান গাইবে, আমরা শুনবো। ভারি ভালো গান গায় সুনন্দা। রবীন্দ্রসঙ্গীত। আর সুধনা ... ওঃ, কতোদিন হয়ে গেলো ওর সঙ্গে দেখা হয় না!'

খানিকক্ষণ নিশ্চুপ থেকে অনুভবকে চিন্তা করার অবসর দিলো আরতি। তারপর বললো, 'একটা কথা জিগেস করবো। সহজ করে জবাব দেবে?'

'কি কথা?'

'শুনেছি উনি তোমার মামাতো ভাই। তোমাদের স্কুলজীবন এক সঙ্গে কেটেছে।

তারপর ওঁর বাবা কোথায় যেন বদলি হয়ে যান। বয়সে উনি তোমার চাইতে সামান্য বড়ো, কিন্তু তোমরা বন্ধুর মতো ছিলে। তাহলেও উনি তোমার চাইতে বড়ো তো?'

'অবশ্যই!'

'তাহলে?'

'তাহলে কি?'

'তুমি ওঁকে, ওঁর স্ত্রীকে নাম ধরে ডাকো কেন?'

'কি বলে ডাকবো?'

'বারে, সবাই যা বলে ডাকে! দাদা, বৌদি?'

'পাগল নাকি!' অনুভব হেসে ফেললো।

'হাসছো যে বড়ো?'

'প্রস্তাবটা শুনলে ওরাও হেসে ফেলবে।'

'কেন?'

'ওটা অবান্তর। তুমি কি জানো, বিদেশে নিজের দাদাকেও লোকে নাম ধরে ডাকে?'

'এটা তো বিদেশ নয়! তাছাড়া ওভাবে ডাকাডাকি করলে সম্পর্কও বোঝা যায় না, সম্মানও দেখানো হয় না।'

'সম্পর্কটা নিজেদের ব্যাপার, সেটাকে জাহির করার কোনো প্রয়োজন নেই। আর তুমি সম্মানের কথা বলছো? দাদা বৌদি বলে ডাকলেই কি বেশি সম্মান দেওয়া হয়? আর নাম ধরে ডাকলে সম্মানটা কমে যায়? তাই যদি হয়, তাহলে অমন ঠুনকো সম্মান বরং না থাকাই ভালো।'

'কিন্তু লোকে কি ভাবে, বলো তো?'

'দু পক্ষের সম্মতি থাকলে তৃতীয় পক্ষের ভাবাভাবিতে কিছুই এসে যায় না।'

'কি জানি, আমার যেন কেমন লাগে।'

'ওটা তোমাদের সংস্কার।'

'সংস্কার কি খারাপ?'

'সংস্কারের অর্থ যা কিছু জীর্ণ, যা কিছু অচল—তাকে মেরামত করা, তাকে ব্যবহারের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা। কিন্তু আমাদের সমাজে সংস্কারের নামে যেগুলো চালু রয়েছে, সেগুলো বহুদিন আগেকার কিছু রীতি—যার অধিকাংশই এখন অচল, অর্থহীন, ব্যাকডেটেড। যুগের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছুরই পরিবর্তন হয়। তাই একটু সাহস করে ওগুলোকেও বদলে নেওয়া দরকার।'

'তার মানে তুমি বলতে চাইছো অতীতে ওগুলোর দরকার ছিলো, কিন্তু আজ ওসব অকেজো। তাই তো?'

'নট নেসেসারিলি। আসলে আমার ধারণা, তখনকার দিনে সমাজের চূড়োয় যাঁরা বাস করতেন তাঁরা নিজেদের স্বার্থ বা সুবিধে বজায় রাখার জন্যে সংস্কারের নামে কিছু রীতি তৈরি করে সাধারণ মানুষকে বেঁধে রাখতে চাইতেন। সেদিন প্রতিবাদের সাজা ছিলো বড়ো ভয়ঙ্কর। একঘরে হয়ে থাকা যে কি বিষম ব্যাপার তা

শহরে বাস করে আজও অনুমান করা যায় না।'

'তার মানে, ভয় ভেঙে গেছে বলেই আজ তোমরা সাহসী হয়েছো।'

কোনো জবাব না দিয়ে অনুভব মৃদু হাসলো। বেচারী আরতি! ও জানে না, এই ভয় ভাঙার জন্যে ইতিহাস কতো দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসেছে, কতো মূল্য দিতে হয়েছে সাধারণ মানুষকে।

আরতি ফের কিছু বলতে যাচ্ছিলো। কিন্তু তার আগেই হঠাৎ মৃদু ঝাঁকুনি তুলে গাড়িটা থমকে দাঁড়ালো। আরতি দেখলো, রাস্তার বাঁ-ধারে দু চারটে টিনের চালাঘর। তার মধ্যে একটা বোধহয় চায়ের দোকান। উনুনে জল ফুটছে। বাইরের বেঞ্চিতে গুটিকয়েক মানুষ। সামনের খুঁটিতে সাদা রঙের একটা ছাগল বাঁধা। এক কোণে শিমূল গাছের তলায় গোল হয়ে শুয়ে থাকা একটা মাদি কুকুর মাছির জ্বালাতনে অতিষ্ঠ হয়ে মাঝে মাঝে লেজ কামড়াচ্ছে।

অনুভবকে গাড়ির দবজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াতে দেখে মানুষগুলো সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো। আরতি বুঝতে পারলো, ওদের কৌতূহলী চোখ পালাক্রমে অনুভব, তার সাদা মারুতি এবং মারুতিতে বসে থাকা মেয়েমানুষটির দিকে অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আঁচল সামলে ও নিজেও এবারে গাড়ি থেকে নেমে অনুভবের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

কপালে লুটিয়ে থাকা অবিন্যস্ত চুলগুলোকে উদাসী অবহেলায় পেছনে সরিয়ে দিয়ে অনুভব জিগেস করলো, 'আচ্ছা, সুধন্য সেনগুপ্তর বাড়িটা কোন দিকে হবে জানেন?'

লোকগুলোর মধ্যে কেউ কোনো জবাব না দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময়ে ব্যস্ত হয়ে রইলো।

'আমি অনেক দিন আগে এখানে এসেছিলাম,' অনুভব ফের বললো। 'এর মধ্যে সবকিছু এতো বদলে গেছে ... চিনতে পারছি না ঠিক।'

লোকগুলো তবু চুপ করেই রইলো। আরতির মনে হলো ওরা এখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

'আপনারা কেউ ওঁকে চেনেন?' ফের জিগেস করলো অনুভব।

'কার কতা বললেন, আজ্ঞে?' এতোক্ষণে একজন মুখ খুললো।

'সুধন্য, সুধন্য সেনগুপ্ত।'

'সুধন্য সে-ন-গুপ্ত?'

'এটা ফুলডিঙি তো?' অনুভব অধৈর্য হয়ে উঠলো।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তাহলে? আপনারা কেউ সুধন্য সেনগুপ্তকে চেনেন না? ভারি আশ্চর্য তো!'

লোকগুলো অনুভবের কথায় বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয়েছে বলে মনে হলো না। ওরা যেমন বসেছিলো তেমনিই বসে রইলো। কয়েক মুহূর্ত সকলেই নির্বাক। হঠাৎ একজন নীরবতা ভেঙে বললো, 'উনি বোধহয় আমাদের মাস্টার বাবুর কথা বলছেন।'

অনুভব আলোর রেখা দেখতে পেয়ে উদ্দীপ্ত হলো, 'হ্যাঁ, এখানকার হেড

মাস্টার। বড়ো স্কুলের হেড মাস্টার। রোগা লম্বা চেহারা, চোখে চশমা। আমার চাইতে একটু ফরসাই হবে।'

আরতির বিরক্ত লাগছিলো। সকাল থেকে প্রায় এই সন্ধ্যা অব্দি দীর্ঘ সময় একটানা হাত পা গুটিয়ে গাড়িতে বসে থাকা, নিষ্ঠুর সূর্যের ঝাঁঝালো আলো ও উত্তাপ, ক্লান্তিকর ঘাম, রুক্ষ ধুলো এবং সবশেষে এই অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকগুলোর নির্বিকার নির্লিপ্ত মনোভাব ওর ধৈর্যকে এখন সহ্যের শেষ সীমানায় পৌঁছে দিয়েছে। তাছাড়া অনুভবের একটা মাত্রাহীন খেয়ালকে প্রশ্রয় দিয়ে ও যে নিতান্তই বোকার মতো কাজ করে ফেলেছে, এ কথাটা মাঝে মাঝেই ওকে ক্ষিপ্ত ও অনুতপ্ত করে তুলছিলো।

ইতিমধ্যে গাড়ির আশেপাশে কয়েকটি নাবালকের ভিড় জমে উঠেছে। ওদের মধ্যে কেউ কেউ হাত বুলিয়ে গাড়ির মসৃণতা উপলব্ধি করার চেষ্টা করছে। অন্যেরা 'দেবতার মতো সুন্দর' শহুরে মানুষ দুটোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে মুগ্ধ দৃষ্টিতে। আরতির সব চাইতে কাছাকাছি দাঁড়ানো ছেলেটি হঠাৎ বলে উঠলো, 'আমি চিনি।'

'কাকে চেনো?' অনুভব ঘুরে দাঁড়ালো, 'সুধন্যকে?'

'হ্যাঁ, আমাদের হেড স্যার।'

'ওঁর বাড়ি চেনো?'

'হ্যাঁ, চিনি। একটু এগিয়ে ডান দিকে—নদীর কাছে। সাঁকোর আগে।'

'ছেলেটাকে নিয়ে গেলে ভালো হতো কিন্তু,' আরতি মৃদুস্বরে বললো, 'বাড়ি চিনতে অসুবিধে হতো না।'

'জানি। কিন্তু যাবে কি?'

'জিগেস করে দেখবো?'

'দ্যাখো—'

আরতি গাঢ় চোখে ছেলেটির দিকে তাকালো, 'তুমি আমাদের সঙ্গে গিয়ে বাড়িটা একটু চিনিয়ে দেবে? একটা টাকা দেবো।'

'না।'

'দু টাকা?' আরতি বেপরোয়া হয়ে ওঠে।

'না, টাকা নেবো না।'

'কেন, লজ্জা করছে?'

'না, টাকা নিলে স্যার বকবেন।'

'ও, এই কথা।' আরতি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো, 'আরে উনি তা জানবেন কি করে? আমরা ওঁকে কিছু বলবোই না।'

'টাকা নিতে নেই,' ছেলেটি তেমনি গোঁজ হয়ে রইলো।

'তাহলে?' হতাশ হয়ে অনুভবের দিকে তাকালো আরতি।

মুহূর্তের মধ্যে মুখে ঝলমলে হাসি ফুটিয়ে ছেলেটির কাঁধে হাত রাখলো অনুভব, 'বাঃ, তুমি খুব ভালো ছেলে তো! একটুও লোভ নেই। কোন ক্লাসে পড়ো?'

'ফাইভ। আমার দাদা সেভেনে পড়ে।'

'ভেরি গুড। তুমি একটু যাবে আমাদের সঙ্গে? তোমাদের হেড স্যার কিন্তু তাহলে খুব খুশি হবেন।'

এরপর ছেলেটির পক্ষে গাড়িতে চেপে না যাবার কোনো কারণই থাকতে পারে না। সুধন্য আর সুনন্দা এই অভাবিত বিস্ময়ে রীতিমতো উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। ওদের আনন্দটা যে যথার্থই আন্তরিক তা ওদের মুখ দেখে স্পষ্টই বুঝতে পারলো আরতি। চোখে মুখে একটু জল দিয়ে চা খেতে খেতেই সন্ধ্যা পেরিয়ে গেলো। সুনন্দা তক্ষুনি স্নান করতে পাঠিয়ে দিলো আরতিকে। টিউব ওয়েলের ঠাণ্ডা জলে গা ধুয়ে ভারি আরাম লাগলো আরতির। সুনন্দা আলমারি থেকে ওকে একটা ছাপার শাড়ি নামিয়ে দিয়েছে। শাড়িতে ন্যাপথলিনের গন্ধ। বুক ভরে ঘ্রাণ নিলো আরতি। ভারি ভালো লাগছে গন্ধটা। ওর নিজের আলমারিগুলোতে বিদেশী পারফিউমের হালকা নির্যাস। কিন্তু এ গন্ধটা যেন এক ঝলক হারিয়ে যাওয়া মন্থর স্মৃতি। ওর মায়ের কাঠের আলমারিতে ঠিক এই গন্ধটা আজও আছে। বালিকা বয়সে মা আলমারি খুললেই তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াতো আরতি। আলমারিতে কতো বিচিত্র জিনিসই না থাকতো! মায়ের বিয়ের চেলি, কড়ির ঝাঁপি। রুপোর কাজল-লতা। দিদিমার সেলাই করা সুন্দর একখানা নকশি কাঁথা। তার এক কোণে সবুজ সুতোয় নাম লেখা 'সরযূ'। একটা পুরনো অ্যালবাম। তাতে মা-বাবার বিয়ের ছবি। হানি মুনের ছবি। তাজমহলের সামনে বাবা আর মা। জীবনে ওই একবারই মা নাকি কলকাতার বাইরে গিয়েছিলো।

আরতির আজও পরিষ্কার মনে আছে সব।

স্মৃতি এক আশ্চর্য সুগন্ধ। মাঝে মাঝে হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে এসে বাস্তবের রুক্ষতাকে অসহায় করে তোলে। তখন নতুন নতুন আকাঙ্ক্ষার জন্ম হয়। বকুল বকুল নেশা জাগে! সর্বাঙ্গ নতুন করে ফুটে উঠতে চায়।

শাড়িটা গায়ে জড়িয়ে স্নানঘর থেকে বেরুলো আরতি। নারকেল গাছগুলোর মাথার ওপরে পিতলের থালার মতো বিশাল একটা চাঁদ উঠেছে। আজ বুঝি পূর্ণিমা।

মাটির বুকে এক সারি ইট বেছানো পথে পা টিপে টিপে একটু একটু করে এগুলো আরতি। রান্নাঘরের দরজায় লণ্ঠন হাতে দাঁড়িয়েছিলো সুনন্দা। ওকে দেখে মিষ্টি করে হাসলো, 'হয়ে গেলো?'

'হ্যাঁ।'

'এবারে বেশ ফ্রেশ লাগছে, তাই না?'

'একদম ফ্রেশ!'

'এবারে ঘরে গিয়ে মাথাটা আঁচড়ে, ঘাড়ে গলায় একটু পাউডার দিয়ে এসো। আরও ভালো লাগবে। আয়নার কাছেই টেবিলের ওপরে পাউডারের কৌটোটা রয়েছে। বুঝলে?'

'আচ্ছা।'

'তারপর সোজা এ ঘরে চলে আসবে কিন্তু। রান্না করতে করতে তোমার সঙ্গে ভালো করে আলাপ করবো, কেমন? না কি এখনও তোমার বরের কাছ থেকে

নড়তে ইচ্ছে করে না?'

'কি যে বলো!' আরতি লজ্জা পেলো। 'আমি এখুনি আসছি।'

'দ্যাখা যাবে!' সুনন্দা শব্দ করে হাসলো। তারপর উঁচু করে তুলে ধরলো লণ্ঠনটা, 'সাবধানে যেও কিন্তু। ইট থেকে নামলেই পায়ে কাদা লেগে যাবে। আর তুমি গিয়েই অনুভবকে স্নান করতে পাঠিয়ে দিও। তাড়া না লাগালে ওরা কিন্তু আজ গল্প করেই সারাটা রাত কটিয়ে দেবে।'

সুনন্দার হাসিটা ভারি মিষ্টি। অকপট। মানুষটাও তাই। সামান্য পরিচয়েই কেমন আপন করে নিয়েছে আরতিকে। যেন আগে থেকেই এর প্রস্তুতি ছিলো। বেশ ঘরোয়া। এদের সঙ্গে অনুভব তেমন কোনো যোগাযোগ রাখে না কেন? আরতি আপন মনে কথাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে। বাইরে বেশ হাওয়া দিচ্ছে। নারকেল গাছগুলো পাতার ঝালর দুলিয়ে চলেছে একটানা। ঘরে এসে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকায় আরতি। চাঁদের আলোয় দূরের নদী অব্দি সবকিছু আবছা আবছা স্বপ্নের মতো মনে হয়। নদীর কাছে, একেবারে ধার ঘেঁষে, বিশাল বাঁশবন। অন্ধকারের আনাচে কানাচে অসংখ্য জোনাকি। চাঁদের উত্তাপহীন আলো আর জোনাকির বিক্ষিপ্ত প্রকাশে বাঁশবনটাকে কেমন যেন অপ্রাকৃত বা রহস্যময় বলে মনে হয়। ওদিকে একবার তাকালে আর চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না। নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসে। নিজেকে বড়ো একলা বলে মনে হয়। অকারণে চোখে জল আসে।

আরতি শুনতে পেলো অনুভব বলছে, 'জানিস সুধন্য, মাঝে মাঝে এই চাকরি, এই প্রতিপত্তি, এতো টাকাপয়সা—সবকিছুই আমার কাছে অর্থহীন বলে মনে হয়। মনে হয়, এ আমি চাইনি, কোনোদিনও চাইনি। কিন্তু তাহলে কিসের নেশায় ছুটে বেড়ালাম এতোদিন? আজও কেন ছুটে মরছি অকারণে? তখন তোর কথা বড়ো বেশি করে মনে পড়ে। ইচ্ছে করে সবকিছু ছেড়েছুড়ে কোথাও পালিয়ে যাই। অনেক দূরে কোথাও।'

'তুই তো কোনোদিনও এসকেপিস্ট ছিলি না!' সুধন্য ভরাট গলায় বললো, 'তাহলে এ ধরনের মানসিকতাকে তুই প্রশ্রয় দিস কি করে? যখন সবকিছু একঘেয়ে লাগে তখন দুটো দিন এখানে এসে কাটিয়ে গেলেই পারিস? না হয় একটু কষ্ট করে থাকতে হবে, এই তো?'

'ঠাট্টা করছিস?'

'ঠাট্টা হবে কেন?'

'ভেবে দ্যাখ সুধন্য, গত তিন বছরের মধ্যে আমিই বার পাঁচেক তোর কাছে ছুটে এসেছি। তুই কিন্তু একবারও যাসনি। কেন?'

সুধন্য খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর থেমে থেমে বললো, 'কি জানি, হয়তো যাওয়া যায় না বলে! হয়তো আমার দারিদ্রের অভিমান ... কিংবা ... '

'থাক, আমি তোর কৈফিয়ত শুনতে চাইনে। আমি বহুবার তোকে আমার কাছে চলে আসার জন্যে সাধাসাধি করেছি। একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হয়ে যেতো। কিন্তু তুই আমার কথা গ্রাহ্য করিসনি। আমাকে দূরে সরিয়ে রেখেছিস। আসলে ... আসলে আমার মনে হয়, দারিদ্রের মধ্যে বাস করাটাই তোর কাছে একটা

নিদারুণ বিলাস।'

'আমি জানি, তোর কথা শুনলে আজ আমার দারিদ্র্য থাকতো না। কিন্তু ভেবে দ্যাখ তো, তাহলে আমার মনটা কি আরও অনেক বেশি দরিদ্র হয়ে যেতো না? তাছাড়া তোর সঙ্গে আমার এই সম্পর্ক ... এটা কি তখনও ঠিক এমনিই থাকতো? জানি না। ভাবতে ভয় হয়।'

হঠাৎ আরতির মনে হলো, এসব কথা ওর শোনা উচিত নয়। তাই পাশের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বললে, 'শুনছো, সুনন্দাদি তোমাকে স্নানে যেতে বললো—'

ওরা দুজনেই মুখ নিচু করে বসে রইলো। কেউ কোনো জবাব দিলো না।

আরতি স্পষ্ট বুঝতে পারলো, এখানে ওর কোনো স্থান নেই। ফের রান্নাঘরে গিয়ে হাজির হলো ও।

কড়াতে জল ঢেলে সুনন্দা বললো, 'সারাটা দিন যা ধকল গেছে তোমাদের! ঝোলটা ফুটে উঠলেই সবাইকে খেতে বসিয়ে দেবো। দেখতে দেখতে রাতও তো খুব একটা কম হলো না!'

আরতি কিছু বললো না।

'তোমাদের কি কালই চলে যাবার প্ল্যান?'

'আমি কিছু জানি না,' আরতি ঠোঁট ওলটালো।

'প্ল্যান থাকলে বাতিল করতে হবে। কাল তোমাদের যাওয়া হচ্ছে না।'

'আমার থাকতে কোনো অসুবিধে নেই। ভালোই লাগবে। বেশ অন্য রকম।'

'তাই?' সুনন্দা মুখ টিপে হাসলো, 'তাহলে তো হয়েই গেলো। অনুভবটা প্রতিবারই এসে যাই যাই করে। কিন্তু ধরে বেঁধে দুটো দিন রেখে দিতে পারলে, পরে ঠেলে পাঠাতে হয়।'

আরতি চুপ করে রইলো।

'ওদের কথাবার্তা কিছু শুনলে?' জিগেস করলো সুনন্দা।

'হুঁ।'

'কিছু বুঝলে?'

'অদ্ভুত লাগলো। মনে হলো ওরা খুব আপন, খুব কাছের।'

'এককালে শুনেছি দুজন দুজনকে ছেড়ে থাকতে পারতো না। আজকাল বছরে দেখা হয় দু-একবার। যেদিন দেখা হয়, সেদিন দুজনই দুজনকে পাগলের মতো যা ইচ্ছে হয় বলে। একজন অন্যজনকে দোষ দেয়। মুখ গোমড়া করে থাকে। তারপর আবার যে-কে-সেই।'

'তুমি কিছু বলো না?'

'পাগল হয়েছো? ওর মধ্যে যেতে আছে কখনও?'

'কি কাণ্ড, না?'

সুনন্দা মৃদু হাসলো। উনুনের আঁচে ওর শ্যামল মুখখানা ঘেমে উঠেছিলো। আঁচলে মুখ মুছে বললো, 'এখানে এসে তোমার নিশ্চয়ই খুব অসুবিধে হচ্ছে, তাই না? সত্যি; অনুভবটা যে কি! তুমি নতুন মানুষ, আজ প্রথম এলে—আগে থেকে একটা খবর পেলে তবু যা হোক ..'

'আমার কিন্তু একটুও অসুবিধে হচ্ছে না,' সুনন্দাকে থামিয়ে দিলো আরতি। 'সত্যি বলতে কি, এখানে এসে যে এতো ভালো লাগবে তা আমি আগে ভাবতেই পারিনি। মনে হচ্ছে সবটাই যেন একটা গল্প।'

সুনন্দা কোনো জবাব দিলো না।

আরতি বাইরের দিকে তাকালো। কি অপরূপ জ্যোৎস্না! বনহংসীর পালকের মতো স্বপ্নিল হয়ে উঠেছে বিশ্বচরাচর। নারকেল গাছগুলো তেমনি অক্লান্ত ভঙ্গিতে পাতার ঝালর দুলিয়ে চলেছে একটানা। আর দূরাগত সমুদ্রের আহ্বানের মতো ঝিঁঝিগুলো একই সুরে ডেকে চলেছে অবিরাম।

'তোমাদের তো দু বছর হতে চললো, তাই না?' সুনন্দা জিগেস করলো।

'হ্যাঁ।'

'এবার তাহলে আর একজন আসুক!'

আরতির স্বপ্নের অরণ্যে একরাশ জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়লো।

'মা হতে ইচ্ছে করে না তোমার?' সুনন্দা ফের ফিসফিসিয়ে প্রশ্ন করলো, 'একটা ছোট্ট শরীরের ভার বইতে ইচ্ছে করে না নিজের শরীরে?'

'করে!'

'তবে? আর দেরি করছো কেন?'

'আর তুমি? তোমার ইচ্ছে করে না?'

'করে।'

'তবে?'

'সে বোধহয় এসে গেছে।' সুনন্দার মুখে যেন আগুনের ছোঁয়া লাগলো।

অকারণে লজ্জা পেলো আরতি। প্রসঙ্গে বদলে আচমকা বললো, 'তুমি কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি রান্না সেরে ফেললে।'

'তাড়াতাড়ি আর হলো কোথায়! বেশ রাত হয়ে গেছে। এখনি সবাইকে খেতে বসিয়ে দেবো।'

খাওয়াদাওয়া সেরেই অনুভব অন্ধকারে কোথায় যেন বেরিয়ে গেলো। ইতিমধ্যে সকলের অগোচরে আকাশে অনেক মেঘ জমেছিলো। এবারে আচমকা বৃষ্টি নামলো। ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শে আরতির শরীর একটু শিরশিরিয়ে উঠলো। শাড়ির আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে নিজেদের ঘরে গিয়ে ঢুকলো ও। পাশের ঘর থেকে সুধন্য ঈষৎ গলা চড়িয়ে জিগেস করলো, 'আরতির কি ঘুম পেয়ে গেলো নাকি?'

'একটুও না,' জবাব দিলো আরতি।

'জানো, একবার এমনি এক ঝড়-বাদলের রাতে আমি আর অনুভব ইছামতিতে নৌকো চেপেছিলাম। ওঃ, সে এক দারুণ অভিজ্ঞতা!'

সুনন্দা বললো, 'অনুভবটা আচ্ছা পাগল। এই বৃষ্টিতে ও গেলো কোথায়? টর্চটা পর্যন্ত নিয়ে গেলো না।'

'এসে যাবে এখুনি,' সুধন্য বললো।

বলতে বলতেই অনুভব কাকভেজা হয়ে ঘরে এসে ঢুকলো। বললো, 'গাড়িটা ঢেকে এলাম। বেদম বৃষ্টি হচ্ছে। ঘরে বসে অতোটা বোঝা যায় না।'

'তুই টর্চ নিয়ে গেলি না কেন?' সুধন্য বললো, 'সুনন্দা বকাবকি করছিলো।'

'ওসবে কান দিতে নেই। এক হাতে টর্চ নিয়ে আমি গাড়ি ঢাকতাম কি করে?'

'আমি ছাতা নিয়ে তোর সঙ্গে যেতাম, টর্চও ধরতাম। বললি না কেন?'

'ওতে মিছিমিছি দুজনকেই ভিজতে হতো।'

সুনন্দা এতোক্ষণ কিছু বলেনি। এবারে বিরক্ত হয়ে বললো, 'সাপ খোপের গায়ে পা পড়তো যদি?'

'তোমাদের বিপদ হতো।' অনুভব শব্দ করে হাসলো, 'খুব ঝামেলায় পড়তে।'

'খুব বীরত্ব হয়েছে! মাথাটা ভালো করে মুছে নাও। অভ্যেস নেই, ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে।'

'লাগলে লাগবে। তোমরা ভিজতে চাইলে আমি তোমাদের সঙ্গে আর এক রাউণ্ড ভিজতে রাজি। যাবে নাকি?'

সুধন্য হো হো করে হাসলো, 'তুই ওর উইক পয়েন্টটা ধরে ফেলেছিস। আসলে ও তোকে হিংসে করছে, নিজে ভিজতে পারেনি বলে।'

সুনন্দা বাদে ওরা সবাই হাসলো। ভেজা পোশাক বদলে অনুভব বললো, 'জানো রতি, সুনন্দা ভারি সুন্দর গান গায়। এখন ও যদি আমাদের 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার' গেয়ে শোনায়, তাহলে কেমন লাগবে বলো তো?'

সুধন্য ও ঘর থেকে বললো, 'দারুণ! বহুদিন আমি ওর গান শুনি না।'

'খুব ভালো হয়,' আরতি বললো।

'ভালো হয়ে আর কাজ নেই,' সুনন্দা অহেতুক গলা চড়ালো। 'সারাদিন তোমাদের অনেক তাণ্ডব গেছে। এখন আর একটিও কথা নয়। চুপ করে শুয়ে পড়ো।'

তখন আকাশ ঝেঁপে বৃষ্টি নেমেছে। টিনের চালে কারা যেন মাদল বাজাচ্ছে অনবরত। এমন রাতে ঘুমোতে ইচ্ছে করে না। মনে হয় সময়টা তাহলে অনর্থক নষ্ট হবে। অন্তত অনুভবের তাই মনে হয়। এক সময় সে নিচু গলায় বললো, 'জানো রতি, মাঝে মাঝে নিজেকে আমার বড়ো একা, বড়ো নিঃসঙ্গ আর ভীষণ নির্জন একটা দ্বীপ বলে মনে হয়। তোমার হয় না?'

'না।'

'একবারও কি মনে হয় না যে এতো আয়োজন—সুখের এতো আয়োজন—সবই আসলে অর্থহীন?'

'না।' আরতি ক্রমশ বিস্মিত ও আতঙ্কিত হয়ে ওঠে।

'আমার মনে হয়। অথচ আমার কোথাও তো কোনো অভাব নেই!' অনুভবের কণ্ঠস্বর দিশেহারা মানুষের উদ্বিগ্ন আর্তির মতো ক্লান্ত ও অসহায় বলে মনে হয়।

খানিকক্ষণ বাদে একটা প্রতিশ্রুতিব কথা মনে পড়ে আরতির। চুপিচুপি বলে, 'তুমি বলেছিলে এখানে এসে আমাকে একটু আশ্চর্য উপহার দেবে। দিলে না তো।'

'দেবো।'

'কখন?'

হাত বাড়িয়ে আলোর শিখাটাকে ম্লান করে দেয় অনুভব। তারপর পাঞ্জাবির

পকেট থেকে অতি সন্তর্পণে কলাপাতার ছোট্ট মোড়কটা বের করে, তা থেকে একমুঠো উজ্জ্বল জোনাকি আরতির অন্ধকারের মতো গভীর চুলের অরণ্যে ছড়িয়ে দেয়।

'এমা, এ কি করলে তুমি!' আরতি বিরক্ত হয়, 'এখন আমি চুল থেকে এগুলোকে কি করে তাড়াই!'

অথচ আরতির ওই জোনাক-জ্বলা অন্ধকার চুলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনুভবের মনে হয়, নিঃসঙ্গতা সুখ দুঃখ ইত্যাদি শব্দগুলোর অর্থ নিতান্তই আপেক্ষিক। আসলে সুখে আছি মনে করলেই বোধহয় সুখের অনেক কাছাকাছি থাকা যায়।

কিন্তু তবু, সেই স্বার্থপর মুহূর্তে, অনুভবকে সম্পূর্ণ বিপন্ন করে দিয়ে তার সত্তার গভীরে কোথায় যেন এক তীব্র হাহাকার জেগে ওঠে। অনুভব চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পায়, হেমন্তের বিবর্ণ জ্যোৎস্নায় আকীর্ণ এক নিষ্পত্র বনভূমিতে আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে নিঃসঙ্গ। তার সামনে—ঠিক মুখোমুখি—পাহাড়ের মতো উঁচু, কুয়াশায় আবছা হয়ে থাকা প্রাচীন এক সুমহান গির্জার বন্ধ দরজার ওধার থেকে ভেসে আসছে অর্গানের সুগম্ভীর অথচ বুক তোলপাড় করা আশ্চর্য এক সুরেলা দীর্ঘশ্বাস। আর তারই সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত কণ্ঠ মিলিয়ে বহুদূর থেকে কে যেন চাপা কান্নার মতো অস্ফুট অসহায়তায় গাইছে—আর ইউ সাম হোয়্যার ফিলিং লোনলি/ অর সাম ওয়ান ইজ লাভিং ইউ?'

৭

সেদিন রাতে ছাড়া ছাড়া অনেকগুলো স্বপ্ন দেখলো সুদূর।

একবার দেখলো, দুরন্ত এক সাদা ঘোড়ার পিঠে চেপে অলৌকিক জ্যোৎস্নায় মূর্ছাহত এক মরুভূমির দিকচিহ্নহীন পথ পেরিয়ে ক্রমাগত সে উদ্দাম গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। প্রতি মুহূর্তেই সে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়তে চাইছিলো, কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও তা পারছিলো না। একবার আবছা আবছা তার মনে হলো, এই তেজী ঘোড়া—এই উদ্দাম স্ট্যালিয়ন—এ তো পৌরুষত্বের প্রতীক। তবে কেন আমি এর কাছ থেকে মুক্তি পেতে চাইছি? কিন্তু তার পরেই আকাশ-ছোঁয়া বিশাল এক গির্জার মুখোমুখি হলো সে। তখন হঠাৎ ঝড় উঠলো। ঘূর্ণি হাওয়ার দাপটে গির্জাটাকে ঘিরে রাখা প্রাচীন বনস্পতিগুলি দেখতে দেখতে নিষ্পত্র হয়ে গেলো। মড়মড় শব্দে ভেঙে পড়লো শতাব্দীর মতো বৃদ্ধ এক ক্লান্ত মহীরুহ। প্রকৃতির সেই নির্মম তাণ্ডবকে উপেক্ষা করে নিরলস সেই শ্বেত অশ্ব সুদূরকে পিঠে নিয়ে নির্দ্বিধায় টগবগিয়ে গির্জার ভেতরে গিয়ে ঢুকলো। গির্জার সমস্ত আসন তখন

শূন্য। শুধু সামনের উঁচু বেদীতে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর করুণাময় মূর্তি আর তাঁর পায়ের কাছে প্রজ্জ্বলিত দুটি মোমবাতি। সুদূর তখন কাতর কণ্ঠে বললো, 'প্রভু, তোমার প্রসাদ-ধন্য এই দুরন্ত শ্বেত অশ্বের কবল থেকে তুমি আমাকে মুক্তি দাও। এর শক্তি ও গতির ঐশ্বর্যে আমি আতঙ্কিত। আমি জানি না, ও আমাকে কোন অভিশপ্ত নগরীতে নিয়ে চলেছে। হে প্রভু, প্রবল তৃষ্ণায় আমি যখন কাতর, ও তখন উল্কার বেগে আমাকে নিয়ে মরীচিকার দিকে ছুটে গেছে। আমি কোনো এক সুরম্য পুষ্প বিতানে ক্ষণিকের জন্যে বিশ্রাম চেয়েছিলাম। কিন্তু তোমার মন্ত্রপূত এই অশ্ব—ও আমার ভাষা বোঝেনি—ও আমার অনুভূতিকে এতোটুকুও গ্রাহ্য করেনি। পথ হারানোর আশঙ্কা সত্ত্বেও আমি তাই বারবার ওর পিঠ থেকে নেমে আসতে চেয়েছি, কিন্তু প্রতিবারই ব্যর্থ হয়েছি। হে ঈশ্বরপুত্র, এই আলোকময় তেজোময় নির্দয় অশ্ব থেকে তুমি আমাকে বিচ্যুত করো!

কিন্তু যীশু কিছু বলার আগেই সুদূর দেখলো, তার সামনে এক সারি সিঁড়ি সটান আকাশের দিকে উঠে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে সুদূরের মনে হলো, এই সেই সিঁড়ি—রামায়ণের রাবণ রাজা যা তৈরি করতে চেয়েছিলেন, তামাম পৃথিবীর মূল্যবোধহীন মানুষ যার সাহায্যে অনায়াসে চলে যেতে পারবে চিরসুখের আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গলোকে। কিন্তু সে সিঁড়ি তো কোনোদিন শেষ হয়নি! তবে? কোথায় গেছে এ সিঁড়ি? কোন মেঘলোকে? কি আছে সেখানে? সুদূর ওপরের দিকে তাকালো—যতোদূর দৃষ্টি যায় শুধু সিঁড়ি আর সিঁড়ি। সীমাহীন, সংখ্যাহীন, অন্তহীন। দেখতে দেখতে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে অনেকটা উঠে পড়লো সে। নিচের দিকে তাকাতে এখন রীতিমতো ভয় হয়, অথচ ওপরের ছবিটা এখনও এতোটুকু স্পষ্ট হয়নি। সুদূরের গা হাত পা ঝিমঝিম করছে, মাথার ভেতরটা একেবারে হালকা, পেটের মধ্যে সবকিছু কেমন যেন গুলিয়ে উঠছে বারবার। নিচ থেকে কে যেন তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করে কাকে ডাকছে। কে যেন তাকে নিচে নেমে যেতে কাতর আহবান জানাচ্ছে ক্রমাগত। কে যেন বলছে, 'আয়, ওরে ফিরে আয়। ওরে, ও পথ তোর নয়—তুই পারবি না!'

কে ডাকে অমন করে? কে? আমার শৈশব? কিন্তু আমার তো শৈশব নেই! ছিলোও না কোনোদিন। জন্মের কয়েক বছরের মধ্যেই যে জাতক তার জন্মদাতাকে হারায়, তার কোনো শৈশব থাকে না। তবে কে ডাকে অমন করে? মা? মা, তুমি?

আমি জানি মা, আমি জানি, তুমি চিরদিন আমাকে শিশু করে রাখতে চাও। কিন্তু বাবার বন্ধু দীপক কাকু কিন্তু একদিন বুঝেছিলেন, আমি আর শিশুটি নেই। আমি তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। উনি আমাকে গাল টিপে আদর করতে এলে আমি শিঁটিয়ে থাকতাম। কিন্তু সেদিন আমার যে কি হলো, আমি ওঁর হাতটা টেনে ধরে কামড়ে রক্ত বের করে দিলাম। তোমরা দুজনেই সেদিন খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়েছিলে আমার দিকে, কিন্তু কেউই আমাকে কিছু বলোনি। তার পর থেকে আমি আর কোনোদিনও দীপক কাকুকে অসময়ে আমাদের বাড়িতে দেখতে পাইনি। আসলে ওঁর ওপরে আমার রাগ ছিলো। যেদিনই স্কুল থেকে ফিরে ওঁকে আমাদের

বাড়িতে দেখতাম, সেদিনই লক্ষ্য করতাম—মাগো, তোমার মুখটা একটু লালচে। আমি বুঝতে পারতাম, ওটা খুশির আভা। তোমার ওই মুখে আমি তখন স্পষ্ট একটা ছবি দেখতে পেতাম। সোনার সিঁড়ির ছবি। তাই আজ আমাকে এই সিঁড়ি ভেঙে উঠতেই হবে। আমি দেখতে চাই, এ সিঁড়ির শেষে কি আছে। তুমি আমায় বারণ কোরো না, মা—বারণ করলেও আমি তা শুনবো না। আজ আমি আর অবোধ শিশু নই।

সুদূর সিঁড়ি ভেঙে একটু একটু করে আরও ওপরে উঠতে থাকে। আরও আরও ওপরে। এবারে সে দেখতে পায়, সিঁড়ি যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে একটা বিশাল চত্বর। ওই কি তবে সুখের স্বর্গ? ওখানে কি লাইভ শো হয়? সুদূর দেখতে পায়, চত্বরের চারধারে লোহার বেষ্টনী আর সেই বেষ্টনীতে ভরাট বুক ঠেকিয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করছে আশ্চর্য এক নারী। ওর বুকের ওমে কবোষ্ণ হয়ে উঠেছে বেষ্টনীর ওই বিশেষ অংশটি। ব্লেসেড ডেমোজেল। সুদূর পুলকিত হয়ে ওঠে। কিন্তু তারপরেই এক নিদারুণ হতাশায় সে আতঙ্কিত হয়।

একি, ও কে ওখানে! তুমি ওখানে কেন, রূপ? ওখানে তো তোমার থাকার কথা নয়! তুমি ফিরে যাও, চলে যাও ওখান থেকে। তুমি আমার সর্বাঙ্গ শিথিল করে তুলছো। তোমাকে নয়--আমি ওখানে মিশেলকে দেখতে চাই। কিংবা সোনালিকে। অথবা ... অথবা এমন কাউকে, যে আমার নয়। তুমি চলে যাও। তোমাকে দেখে আমার ক্লান্ত লাগছে। আমার হাত পা অবশ হয়ে আসছে। তুমি থাকলে আমি কিছুতেই ওখানে গিয়ে উঠতে পারবো না—আমি পড়ে যাবো, অবলম্বনহীন শূন্যতা থেকে আমি আছড়ে পড়বো নিষ্ঠুর মাটির কঠিন বুকে। তুমি যাও রূপ, প্লিজ!

ঘুমের মধ্যেও প্রবল উদ্বেগে ঘামে ভিজে উঠলো সুদূর। তারপরেই সে দেখলো মিশেল মদির হেসে বলছে, 'আর ইউ রেডি, ডিয়ার?' সুদূর পায়ে পায়ে এগুতে লাগলো ওর দিকে। কিন্তু তারপরই হঠাৎ আবার দেখলো, প্রায় শেষ হয়ে আসা একটা সুবর্ণ সোপানের ধ্বংসস্তূপকে অবহেলায় লাঞ্ছিত করে একটা উন্মত্ত সাদা ঘোড়া তাকে পিঠে নিয়ে বিদ্যুতের মতো তীব্র গতিতে অজানার উদ্দেশ্যে উধাও হয়ে ছুটে চলেছে।

ঠিক তখনই ঘুম ভেঙে গেলো সুদূরের।

চোখ মেলে সে দেখলো, নীলাভ আলোর জ্যোৎস্নায় নীলকান্ত মণির মতো অপরূপ হয়ে ঘুমোচ্ছে রূপসা। কিন্তু নীলা সকলের সয় না, আমারও সইবে না—ভাবলো ও। নিজেকে বললো, ওর স্পর্শ তোমার অস্তিত্বে সেই শিহরণ জাগাতে পারে না, যে শিহরণে পৌরুষ উদ্দীপ্ত হয়। তার কারণ ও তোমার স্ত্রী, তোমার বৈধ স্ত্রী। ওকে দেখে তুমি শামুকের মতো গুটিয়ে যাও, কারণ ও তোমার অসম্পূর্ণতার খবর জানে। ওর সংস্পর্শ তোমার মনে হীনম্মন্যতার মালিন্য এনে দেয়, কারণ তোমার বিশ্বাস ও তোমাকে করুণা করে।

অথচ তুমি জানো, তুমি সক্ষম।

কিন্তু তার প্রমাণ কোথায়?

ঢাকুরিয়া ব্রিজ থেকে নেমেই মিনিবাসটা অচল হয়ে গেলো। হুড়মুড় করে নেমে পড়লো সবাই। পরবর্তী কয়েকটা মিনিটে আর পা রাখার জায়গা পাওয়া যাবে না। তাই অযথা তাড়াহুড়ো না করে ফুটপাথে উঠে দাঁড়ালো রূপসা।

এদিকটা ওর ভীষণ পরিচিত। ছেলেবেলায় লেক গার্ডেনসের ভাড়া বাড়িতে থাকার সময় মা প্রতিদিন ওকে সাঁতার শেখাতে নিয়ে যেতো। ফেরার পথে ওই দোকানটার একটা মিষ্টি ছিলো ওর প্রতিদিনকার বরাদ্দ। একটু ঘুরে তাকালো রূপসা। ওই তো সেই দোকানটা, যেখান থেকে মা-বাবার সঙ্গে এসে ও কতো ছবি তুলিয়েছে। বাবার তখন ক্যামেরা ছিলো না। তাই নিয়ে প্রায়ই অনুযোগ জানাতো ও। ক্যামেরা থাকলে আরও কতো ছবি তোলা যেতো ইচ্ছেমতো!

দীর্ঘশ্বাস ফেলে দূরের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নেয় রূপসা। আকাশে মেঘের ছিটেফোঁটা নেই। পশ্চিম দিক থেকে দুরন্ত রোদ এসে ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে। রীতিমতো গরম। রাস্তার ওধারে মধুসূদন মঞ্চ, তার পাশে দক্ষিণাপন শপিং কমপ্লেক্স। একদিন সময় করে ওদিকটা একটু ঘুরে দেখতে হবে। কিন্তু এখন নষ্ট করার মতো সময় একটুও নেই। অথচ এই রোদের মধ্যে অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আপাতত আর করারও কিছু নেই।

একটা যাত্রীহীন অটো কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে আসছিলো। রূপসা হাত দেখালো।

'কোথায় যাবেন?'

'গলফ গ্রীন।'

'মিনিবাস স্ট্যাণ্ড অব্দি যেতে পারি। দশ টাকা লাগবে।'

তর্ক করা বৃথা। তর্ক করতে গেলে অযথা সময় নষ্ট, সুযোগটাও হাতছাড়া হতে পারে। তাই বিনা বাক্যব্যয়ে উঠে বসলো রূপসা। পথে একবার গাড়ি থামিয়ে একটা ক্যাডবেরি আর এক প্যাকেট বিস্কুট কিনলো। তারপর লর্ডসের মোড় পেরিয়ে দেখতে দেখতে গলফগ্রীন মিনিবাস স্ট্যাণ্ড। এখান থেকে দূরত্বটা তেমন বেশি নয়। রোদ থাকলেও হেঁটে যেতে তেমন অসুবিধে হলো না। নির্দিষ্ট ফ্ল্যাটের দোতলায় উঠে ডান দিকের বন্ধ দরজায় ডোর বেলের বোতামে মৃদু চাপ দেবার আগে হাতঘড়িতে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো রূপসা। তিনটে বেজে পনেরো। যাক, দেরি হয়নি তাহলে।

সোনালিই দরজা খুললো। সম্ভবত ওর জন্যেই অপেক্ষা করছিলো উৎকর্ণ হয়ে, তাই একটুও দেরি করেনি। রূপসাকে দেখে ওর ঠোঁটের এক চিলতে হাসিটা যেন ফুটে উঠতে গিয়েও হারিয়ে গেলো। এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে মৃদু কণ্ঠে শুধু বললো, 'আয়।'

সোনালির পরনে বাটিকের কাফতান। চুল অবিন্যস্ত। মুখে প্রসাধনের লেশমাত্র নেই। ও কি শুয়েছিলো এতোক্ষণ? শুয়ে শুয়ে অপেক্ষা করছিলো অনামনে?

বসার ঘরে ঢুকে ফ্যান চালালো সোনালি, 'তুই ভীষণ ঘেমে গেছিস। আগে বসে একটু হাওয়া খেয়ে নে, তারপর জল দিচ্ছি।'

হাতের ব্যাগ সেন্টার টেবিলে রেখে রূপসা শরীর এলিয়ে বসলো, 'টোটা এখনও স্কুল থেকে ফেরেনি?'

'আজ তো শনিবার, স্কুল ছুটি। কেন যে ওদের ছুটি দেয়, বুঝি না। রোববারেও খোলা থাকলে বেঁচে যেতাম।' এতোক্ষণে এই প্রথম সোনালির ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটলো, 'ওর লং ভ্যাকেশনগুলো আমার কাছে আতঙ্ক।'

'সে কোথায়?'

'ঘুমোচ্ছে। নইলে তোকে শোবার ঘরেই নিয়ে যেতাম। কাজের মেয়েটা এখনও আসেনি। এর মধ্যে বদমাশটা উঠে পড়লেই মুশকিল। তোর সঙ্গে একটাও কথা বলতে দেবে না।'

'তোর কাজের মেয়ে সারাদিন থাকে না?'

'না রে! সকালে আসে, এগারোটার সময় টোটাকে স্কুলের বাসে তুলে দিয়ে চলে যায়। আবার তিনটের সময় স্কুল বাস থেকে ওকে কালেক্ট করে বাড়িতে নিয়ে আসে—কাজকর্ম সেরে টোটাকে ঘুম পাড়িয়ে চলে যায় রাত নটা নাগাদ।'

'তাহলে তোর আর মুশকিলটা কোথায়? ঝামেলার সবটাই তো ও সামলায়।'

'একটা দিন এখানে থেকে যা, তাহলে বুঝতে পারবি। ওসব বলে বোঝানো যায় না।'

'বুঝেছি,' রূপসা হাসলো। 'তুহিন কখন ফিরবে?'

'তুই এসেছিস আমার কাছে। এখুনি তুহিনের খোঁজ করছিস কেন?' সোনালি একটা নির্দোষ খোঁচা মারলো।

'বারে, কতোদিন ওর সঙ্গে দেখা হয় না। খোঁজ করবো না?'

'আহারে! ভীষণ মন কেমন করছে বুঝি? তা অফিসে ফোনটোন করে, দেখা করলেই পারিস?'

'জেলাস?' রূপসা ফের হাসলো।

'মোটেও না। বরং নিশ্চিন্ত থাকতাম।'

'কেন?'

'বুঝতাম, ও আঘাটায় ডোবেনি। মজা পেতাম।'

'সত্যি সত্যি কিছু হলে মজা বেরিয়ে যেতো। যাকগে, আগে কাজের কথা বল। হঠাৎ তুই ফোন করে আমাকে আসতে বললি কেন?'

'নইলে তো তুই ভুলেও এ পথে আসবি না—তাই।'

'বাজে বকিস না। এই গরমে তেতেপুড়ে এসে বাজে কথা শুনতে একটুও ভালো লাগে না। আসল কথাটা কি বলো তো?'

'বলবো,' সোনালির শ্যামল মুখে আচমকা রঙের ছোঁয়া লাগে। 'দাঁড়া, তার আগে তোর জন্যে একটু চা করে আনি। বাথরুমে যাবি?'

'না। তুই অমন ছটফট না করে, একটু স্থির হয়ে বোস তো। এক্ষুনি আমার চা না হলেও চলবে।' ব্যাগ থেকে ক্যাডবেরি আর বিস্কুটের প্যাকেটটা নামায় রূপসা, 'এগুলো টোটার।'

'এসব আবার আনতে গেলি কেন?'

'বেশ করেছি। খামোখা চ্যাঁচাস না। তোর জন্যে তো আনিনি! তুই বরং আমাকে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়া, গলাটা পুরো ঝামা হয়ে গেছে।'

'তুই একটু বোস, আমি এক্ষুনি নিয়ে আসছি।'

সোনালি ঘর থেকে বেরুতেই ফের ডোরবেল বাজলো এবং পরক্ষণেই ওর উৎফুল্ল কণ্ঠস্বর শোনা গেলো, 'বাঃ, তোর লক্ষ্মী নামটা সার্থক! একেবারে ঠিক সময়মতো এসে গেছিস। শোন, আমার একটা বন্ধু এসেছে—খুব পুরনো বন্ধু। ভালো করে একটু চা বানা, কেমন? দেখিস, বদনাম হয় না যেন।'

রুমালে মুখ মুছে ঘরের চারদিকে চোখ বোলালো রূপসা। আড়ম্বরহীন, কিন্তু ঘরের প্রতিটি জিনিসে রুচির স্পর্শ। সামনের দেয়ালে একটা মধুবনী পেইন্টিং। মেঝেতে শীতলপাটি। এক কোণে দুটো ইনডোর প্ল্যান্ট। সোনালিটা চিরদিনই খুব গোছানো মেয়ে।

জল এনে সোনালি বললো, 'ও ঘরে চল। আরাম করে বিছানায় বসে গল্প করবো।'

'টোটা?'

'পাজিটা উঠে পড়েছে। শান্তি নেই।'

বলতে বলতেই টোটা ঘরে এসে ঢোকে।

'আমি তখন জল খাইনি।'

'কখন?' সোনালি জিগেস করে।

'তখন।'

'বুঝেছি।' সোনালি মুখ টিপে হাসে, 'তার মানে এখন তুমি জল খাবে, তাই তো?'

'এখন আমি জল খাবো।'

'আগে লক্ষ্মী মাসীর কাছে গিয়ে মুখ ধুয়ে নাও, তারপর জল খাবে।' সোনালি বললো, 'ঘুম থেকে উঠে, মুখ না ধুয়ে জল খেতে নেই।'

'মুখ না ধুয়ে জল খেতে আছে।'

'শুরু হলো বদমাইশি।' সোনালি চোখ পাকালো, 'ছি, কথা শোনো! কথা না শুনলে এই সুন্দর মাসীটা কিন্তু তোমার ওপরে ভীষণ রাগ করবে।'

'সুন্দর মাসীটা রাগ করে না।'

'হ্যাঁ, তোকে বলেছে!'

'বলেছে।'

'কেন ওকে বকাবকি করছিস?' রূপসা হাসি মুখে উঠে দাঁড়ালো, 'চলো টোটা, আজ আমি তোমাকে মুখ ধুইয়ে দেবো। তারপর তুমি সোনা ছেলে হয়ে, বসে বসে এই ক্যাডবেরি আর বিস্কুটগুলো কুটকুট করে খাবে। কেমন?'

'কুটকুট করে খাবো।' টোটার খুব পছন্দ হলো প্রস্তাবটা।

টোটাকে মুখ ধুইয়ে, বিস্কুট খাইয়ে, ওরা দুজনে চা আর নুডলস খেলো। খেতে শুরু করে রূপসা বুঝতে পারলো, ইতিমধ্যে ওর বেশ খিদে পেয়ে গিয়েছিলো। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সোনালির দিকে তাকালো ও, 'তুহিন কখন ফিরবে বললি

না তো?'

'ওর ফিরতে ফিরতে সেই সাড়ে ছটা। তার আগে আসবে বলে মনে হয় না।'

'তাহলে আজ আর ওর সঙ্গে দেখা হলো না।'

'কেন, এতো তাড়া কিসের? একটু বসে গেলেই পারিস?'

'নারে, ভাবছি আজ একবার গড়িয়ায় যাবো। মা-বাবার সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয় না। ভারি অন্যায় করছি। শনি-রোববার ওঁরা ইউশুয়ালি বাড়িতেই থাকেন। কাজেই রিস্কটা নেওয়া যায়।'

'তাহলে আটকাবো না।' সোনালি চেয়ার ছেড়ে উঠে লক্ষ্মীকে বললো, 'তুই এবারে টোটাকে একটু বেড়িয়ে নিয়ে আয়। নইলে শয়তানটা একদম কথা বলতে দেবে না, সারাক্ষণ জ্বালিয়ে মারবে।'

নিপুণ তৎপরতায় টোটার পোশাক বদলে, মাথা আঁচড়ে, ওর গাল টিপে একটা চুমু দিলো সোনালি। লক্ষ্মীকে বললো, 'খবর্দার, কমপাউণ্ডের বাইরে যাবি না কিন্তু! আর সন্ধ্যে হলেই চলে আসবি, বুঝলি?'

বাইরের দরজায় ল্যাচ লাগিয়ে, রূপসাকে নিয়ে শোবার ঘরে ঢুকলো সোনালি। বন্ধ করে রাখা ফ্যানটা ফের চালু করে বললো, 'নে, এবারে খাটে পা তুলে আরাম করে বোস। একটা লবঙ্গ দেবো তোকে?'

'নাঃ, বড্ড ঝাল লাগে।'

'ননীর পুতুল!'

রূপসা হাসলো। ও বেশ বুঝতে পারছিলো, সোনালি ওকে যা বলার জন্যে এতোক্ষণ ধরে প্রস্তুতি নিচ্ছে, এবারে তা বলতে হবে ভেবে মৃদু অস্বস্তি অনুভব করছে। এখন ওকে সহজ করে তোলার প্রচেষ্টায় কিছু বলতে গেলে বিপরীত ফল হতে পারে। তার চাইতে বরং যেচে ওই প্রসঙ্গটা না তোলাই ভালো।

'তুই হয়তো অধৈর্য হয়ে উঠেছিস, রূপা। তাই না?' অবশেষে বিনা প্ররোচনাতেই নীরবতা ভাঙলো সোনালি। 'হয়তো ভাবছিস, তোকে আমি কি এমন কথা বলবো যার জন্যে এতো আয়োজন। কিন্তু বিশ্বাস কর, কথাটা আমি যে কি করে গুছিয়ে বলবো, যা বলতে চাইছি তা আদৌ তোকে বুঝিয়ে বলতে পারবো কি না—এ সব আমি এখনও জানি না। এমন একটা অপ্রস্তুত অবস্থার মুখোমুখি হওয়া বড়ো কঠিন।'

'তাহলে নাই বা বললি,' সোনালি বললো। 'নিজেকে যেচে অপ্রস্তুত করা, সে ভারি বিড়ম্বনা! না, সোনা, তুই যা বলার জন্যে আমাকে ডেকে এনেছিস তা না বললেও আমি কিছু মনে করবো না।'

'সে তোর মহত্ত্ব। কিন্তু আমি তোকে না বলে পারবো না। অন্যায় হবে।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো সোনালি, 'আসলে আমি তোকে যা বলবো তা তোর ওয়াইলডেস্ট ইম্যাজিনেশনেও নেই। ভাবতে গেলে এখনও আমার গায়ে কাঁটা দেয়। এ ব্যাপারটা তোর জানার কথা নয় এবং আমার দিক থেকেও উদ্যোগী হয়ে তোকে তা জানাবার মতো কথা নয়। কারণ আমি নিজে এ ব্যাপারে ডাইরেক্টলি ইনভলভড। তবু আমি মনে করি, আমার পক্ষে অস্বস্তিকর হলেও কথাটা তোকে

জানানো দরকার। কারণ ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে তুই কোনো ভাইটাল ডিসিশন নিতে গেলে, এ ব্যাপারটা হয়তো তোর কাছে একটা ইমপর্টান্ট ফ্যাকটর হয়ে উঠবে।

'গত সপ্তাহের বুধবার—দিনটা আমার সারা জীবন মনে থাকবে—বেলা তখন প্রায় সাড়ে এগারোটা। টোটা স্কুলে চলে গেছে। তুহিন অফিসে। বাড়িতে যথারীতি আর কেউ নেই। আমি তখন বাথরুমে যাবার আগে ইচ্ছেমতো আলসেমি করছি আর তার ফাঁকে ফাঁকে সংসারের টুকিটাকি কাজগুলো সেরে নিচ্ছি। একবার টোটার খেলনা গুছোচ্ছি, পরক্ষনেই টি.ভি.র ধুলো ঝাড়ছি—এমনি সমস্ত হাবিজাবি কাজ। এমন সময় হঠাৎ ডোরবেলটা বেজে উঠলো। পরপর দুবার। আমি অবাক হলাম, খানিকটা বিরক্তও বটে। এই অসময়ে আবার কে এলো? কোনো বাজে কোম্পানির সেলস গার্ল নিশ্চয়ই। একবার মনে হলো হয়তো টোটার স্কুল-বাস আসেনি, লক্ষ্মী ওকে নিয়ে ফিরে এসেছে। আবার ভাবলাম, তুহিন হয়তো অফিসের কোনো জরুরি কাগজ ভুল করে বাড়িতে ফেলে গিয়েছিলো। পরক্ষণেই মনে হলো, কেউ কোনো খারাপ খবর নিয়ে আসেনি তো? কিন্তু একছুটে দরজার কাছে গিয়ে পিপহোলে চোখ রাখতেই আমি অবাক হয়ে গেলাম। দেখলাম, দরজায় সুদূর।'

'সুদূর!' রূপসার চোখ দুটো চকিত বিস্ময়ে প্রখর হলো।

'অবাক হচ্ছিস?' সোনালি ম্লান হাসলো, 'আমিও তখন ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।'

'তারপর?'

'আমার তখনকার অবস্থাটা তুই একবার কল্পনা করে দ্যাখ। সারাটা মুখ ঘামে ধুলোয় বিজবিজে, চুল উশকো খুশকো, পরনে স্লিভলেস নাইটি, ভেতরে কিছু নেই। যতো ঘনিষ্ঠই হোক, সুদূর একটা পুরুষমানুষ। ওই অপ্রস্তুত অবস্থায় দরজা খুলে ওর সামনে দাঁড়াতে আমার একটুও ইচ্ছে করছিলো না। লজ্জা লাগছিলো। কিন্তু ততোক্ষণে ঘন্টিটা ফের বেজে উঠেছে। ভেবে পাচ্ছিলাম না, কি করি। তবু, দেরি হচ্ছে জেনেও, একছুটে শোবার ঘরে গিয়ে হাউস কোটটা কোনোমতে গায়ে চড়িয়ে এসে দরজা খুললাম। তারপর ওখানে দাঁড়িয়েই জিগেস করলাম, 'এ কি রে, তুই'?

'আমার গলায় বিস্ময় চাপা ছিলো না। কিন্তু সুদূর তা গায়ে না মেখে ভুরু কুঁচকে উলটে জিগেস করলো, 'তুই কি ঘুমোচ্ছিলি নাকি'?

'না তো'!

'তাহলে'?

'তাহলে কি'?

'দরজা খুলতে এতো দেরি হলো যে'?

'বারে, হাতে কাজ থাকে না বুঝি'? আমার রাগ হলো। ফের জিগেস করলাম, 'কিন্তু তুই এই অসময়ে'?

'কেন, অসময় বলে প্রবেশ নিষেধ'? সুদূর ম্লান হাসলো।

'আমার কেমন যেন মনে হলো, ও ভীষণ ক্লান্ত। চোখ মুখ লালচে। কেমন যেন একটা উদভ্রান্তভাব। বললাম, 'এখন নিষেধ বললেও তুই শুনবি নাকি? আয়, ভেতরে এসে বোস'।

'ও আমার পেছন পেছন সামনের ঘরে ঢুকে ঝুপ করে সোফায় বসে পড়লো। শরীর এলিয়ে। যে সোফাটাতে তুই একটু আগে বসেছিলি।

'জিগেস করলাম, 'তোর কি শরীর খারাপ লাগছে'?

'নাঃ, খামোখা শরীর খারাপ লাগবে কেন'?

'তবে কি রূপার সঙ্গে খুব ঝগড়া হয়েছে? অফিসে না গিয়ে এই রোদে রোদে ঘুরছিস কেন'?

'সুদূর এবারে সোফায় মাথা এলিয়ে চোখ বুজলো, 'তুই যদি এভাবে কনটিনিউয়াস জেরা না করিস, তাহলে আমি কিছুক্ষণ এখানে থাকবো'।

'আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। বুঝতে পারছিলাম না, কি বলবো। কি করবো তাও ভেবে পাচ্ছি না। মনে হলো হয়তো মন মেজাজ খুব খারাপ, বাড়ি থেকে বেরিয়েও অফিসে যাবার মুড নেই—তাই ও ঘুরতে ঘুরতে স্রেফ খানিকটা সময় কাটাবার জন্যে এখানে এসে হাজির হয়েছে। ঠিক করলাম, ওকে আর ঘাঁটাবো না। যতোক্ষণ ইচ্ছে হয়, বসে বিশ্রাম করুক। তাই বললাম, 'ঠিক আছে। তুই তাহলে বোস, আমি ততোক্ষণে চট করে স্নানটা সেরে আসি'।

'কিন্তু আমি মুখ ফিরিয়ে দরজা অব্দি যেতেই ও পেছন থেকে ডাকলো, 'সোনা'—

'কি বলছিস'? আমি ঘুরে দাঁড়ালাম।

'তুই কি খুব বিরক্ত হয়েছিস'?

'না তো'!

'তাহলে আমাকে এক গ্লাস জল দে, প্লিজ'।

'সারি, আমারই জিগেস করা উচিত ছিলো,' আমি লজ্জা পেলাম। 'একটু সরবৎ করে দেবো'?

'না, স্রেফ এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল'।

'ফ্রিজ থেকে ওকে জল এনে দিলাম। ঢক ঢক করে এক নিঃশ্বাসে জলটা শেষ করে, গ্লাসটা ও আমার হাতে না দিয়ে ঠক করে সেন্টার টেবিলে নামিয়ে রাখলো। তারপর আচমকা সোফা থেকে উঠে, আমার ঠিক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, আমার চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। কতোক্ষণ, তা আমি তোকে ঠিক বলতে পারবো না রূপা। সেটা এক সেকেণ্ড হতে পারে, আবার এক মিনিটও হতে পারে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিলো যেন অনন্তকাল। ওঃ, সে কি মারাত্মক দৃষ্টি! মনে হচ্ছিলো ওর চোখ দুটো যেন ধারালো দুটো স্ক্যালপেল। আমার চোখ ভেদ করে ও যেন আমার ভেতরটাকেও দেখতে পাচ্ছে স্পষ্ট। ওর দৃষ্টির তীব্র তাপে আমার ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে, পুড়ে যাচ্ছে, গলে যাচ্ছে একটু একটু করে। আমার ভীষণ ভয় করছিলো। আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। ইচ্ছে করছিলো ছুটে পালিয়ে যাই ওর দৃষ্টির আড়ালে। কিন্তু আমার পা দুটোতে কোনো সাড় ছিলো না। মনে হচ্ছিলো, আর কিছুক্ষণ ও আমার চোখের দিকে এমন করে তাকিয়ে থাকলে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবো, আমার সমস্ত চেতনা নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে যাবে।

'ঠিক সেই মুহূর্তে—যখন আমার চোখের সামনে সবকিছু ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে উঠছে, চিন্তাশক্তি হারিয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে, মাথার ভেতরটা একেবারে

হালকা—হঠাৎ সুদূর একটা বিকৃত ফ্যাঁসফেসে গলায় অস্ফুটে আমার নাম ধরে ডাকলো, 'সোনা'!

'আমি কেঁপে উঠলাম, কিন্তু ওর ডাকে সাড়া দিতে পারলাম না। তেমন শক্তি আমার মধ্যে তখন এক বিন্দুও ছিলো না।'

'ও তখন ধীরেসুস্থে হাত বাড়িয়ে আমার কাঁধ দুটো আঁকড়ে ধরলো, 'তুই তো আমার বন্ধু, আমার সত্যিকারের বন্ধু। তাই না'?

'আমি ঘাড় নেড়ে সায় জানালাম।

'ও বললো, 'তাহলে তুই আমাকে একটু সাহায্য কর, সোনা—তুই আমাকে মিথ্যে হয়ে হয়ে যেতে দিস না! বিশ্বাস কর আমি বাঁচতে চাই, আমি বাঁচতে ভালোবাসি। একবার ... শুধু একবার ... তুই আমার মিথ্যে বিশ্বাসটাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলতে সাহায্য কর। প্লিজ'!

'রূপা, ও আমার কাছে সাহায্য চেয়েছিলো। নিজেকে প্রমাণ করার জন্যে একটা সুযোগ চেয়েছিলো। কিন্তু তখন ওর গলায় প্রার্থনার সুর ছিলো না। থাকলে, হয়তো আমি ওকে উপেক্ষা করতে পারতাম। ও আমার করুণা চায়নি, কারণ করুণা যে চায় তার কাছে ভিক্ষের ঝুলি থাকে। কিন্তু সেদিন ওর কাছে যা ছিলো, তার নাম গাণ্ডীব—তা দিয়ে কুরুক্ষেত্র জয় করা যায়।

'তারপর আমার আর কিছু মনে নেই। শুধু আবছা আবছা একবার মনে হয়েছিলো, আমার বোধহয় প্রতিরোধ করা উচিত, ওকে বাধা দেওয়া উচিত। কিন্তু আমি সেসব কিছুই করিনি। আসলে তখন ওকে বাধা দেবার মতো কোনো চেষ্টা করা বোধহয় আমার সাধ্যের আওতায় ছিলো না। কখন যে আমরা বাইরের ঘর থেকে ভেতরের ঘরে এসেছি, কখন যে আমার শরীরের ঘাম ওর ঘামের সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেছে—আমি জানি না। আমি তখন ভেসে গিয়েছিলাম রূপা! ও আমাকে সম্পূর্ণ ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো। যেন একটা ঘোরের মধ্যে হয়ে গেলো সমস্ত ব্যাপারটা।

'তোকে এসব বলতে আমার বোধহয় লজ্জা পাবার কথা। কিন্তু বিশ্বাস কর, আমার একটুও লজ্জা লাগছে না। ঘোরটা যখন ভাঙলো, মনে হলো বড়ো সুন্দর ছিলো স্বপ্নটা। বড়ো ভালো। কিন্তু যে কোনো সুন্দর স্বপ্নের মতোই সেটা বড়ো তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেলো! দুঃখ হলো, কারণ মানুষ সারা জীবনে একটা বিশেষ স্বপ্ন হয়তো শুধু একবারই দেখে। তারপর মনে হলো, একদিন তোর কাছে আমি হেরে গিয়েছিলাম, কিন্তু শেষ অব্দি আমিই তোকে হারিয়ে দিলাম। আমার আগে সুদূরকে তুই পেলি না। একটা সাংঘাতিক অহংকারের বোঝায় আমি তখন পরিপূর্ণ হয়ে উঠলাম।

'অথচ তার পর থেকে আমি শুধু ভাবছি, কেন তখন আমার মধ্যে হঠাৎ করে অমন একটা তাণ্ডব আগুন জ্বলে উঠলো। আমি—যে আমি আজ দীর্ঘদিন হলো বিবাহিতা, যার বিয়ের উৎস ভালোবাসা এবং দাম্পত্য জীবন সুখময়, যার একটা নিজস্ব সংসার আছে—সে কেন, কি করে, কিসের প্রত্যাশায় ...

'কিন্তু ভেবে আমি কোনো কিনারা পাইনি, রূপা।

'হয়তো এসব শুনে আমার সম্পর্কে তোর মনে একটা বিশ্রী ধারণার সৃষ্টি হলো। হয়তো ভবিষ্যতে তুই আমার সঙ্গে আর কোনো রকম যোগাযোগও রাখবি না। তবু তোকে আমি সব কথা খুলে বললাম তার কারণ, বুঝতেই পারছিস, তুই ওর সম্পর্কে যা জানিস সেটাই শেষ কথা নয়। হি মে বি ইনফার্টাইল, বাট ডেফিনিটলি হি ইজ নট ইমপোটেন্ট—নট অ্যাট অল।'

অনেকক্ষণ একটানা কথা বলে চুপ করলো সোনালি। ওর নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম। দু গালে রক্তিম আভা। হয়তো উত্তেজনার প্রসাদ। রূপসা পাথরের মূর্তির মতো স্থির। নির্বাক ও নিস্পন্দ। শুধু সময়ের পাথর ভেঙে ভেঙে মাথার ওপরে ফ্যানটা ঘুরে চলেছে অবিরাম। ক্লান্তিহীন।

আড় চোখে একবার সারাটা বিছানায় চোখ বুলিয়ে নেয় রূপসা। এই সেই শয্যা! মাত্র কয়েক দিন আগে এখানে, এই শয্যায়, সুদূর আর সোনালি গোটা পৃথিবীকে ভুলে গিয়ে শুধু নিজেদের নিয়ে এক উদ্দাম আকাঙ্ক্ষার খেলায় তন্ময় হয়ে গিয়েছিলো। এই সেই শয্যা।

আর ভাবতে পারে না রূপসা।

মুখ নিচু করে হাতের নখ খুঁটছিলো সোনালি। এক সময় মুখ তুলে বললো, 'আমি জানি না, এরপর সুদূর আর কোনোদিনও এ বাড়িতে আসবে কি না। বা এলেও, আমি তাকে দরজা খুলে ভেতরে ডেকে নিতে পারবো কি না। তবে যা ঘটে গেছে, তার জন্যে আমার মনে কোথাও এতোটুকু গ্লানি লেগে নেই। এটা আমার অকপট স্বীকারোক্তি।'

রূপসা কোনো জবাব দিলো না।

'তোর মনে কি কোনো অনুভূতিই খেলা করছে না?' সোনালি প্রশ্ন করলো, 'রাগ কিংবা ঘৃণা? অথবা বিরক্তি?'

'না', সোনালির চোখের দিকে তাকালো রূপসা। 'তবে জীবনে এই প্রথম, তোকে আমার হিংসে করতে ইচ্ছে করছে।'

এ কথার কোনো জবাব হয় না। সোনালি তাই কিছু বলতে পারলো না। কিন্তু রূপসাব জন্যে ও বুকের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট বেদনা অনুভব করলো।

'তোকে একটা কথা জিগেস করবো?' রূপসা ফের বললো।

'কি?'

'তুহিনকে তুই এ ব্যাপারে কিছু বলেছিস?'

'না।'

'কেন?'

'যতো আধুনিকই হোক না কেন, মধ্যবিত্ত মানসিকতার কোনো মানুষই বোধহয় এ ধরনের ঘটনাকে খুব একটা সহজ ভাবে মেনে নিতে পারে না। অন্তত আমার তাই ধারণা। ওদের শরীরে এখনও গত শতাব্দীর রক্ত বইছে। মুখে স্বীকার না করলেও মনে মনে আজও ওরা স্ত্রীকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে মনে করে। তাই বলিনি। কি হবে মিছিমিছি ওর অহংকারে আঘাত দিয়ে? ব্যাপারটা জানলে প্রথমেই ওর মনে হবে, ও হেরে গেছে। ওর মনে প্রশ্ন জাগবে, 'আমার ত্রুটিটা কোথায়?

সুদূরের মধ্যে এমন কি আছে যা আমার নেই? যা আমি সোনাকে দিতে পারিনি'? অথচ প্রশ্নটা ত্রুটির নয়, হারজিতেরও নয়। প্রশ্নটা অনুভূতির। কিন্তু তা ওকে বোঝানো যাবে না। অশান্তি হবে। অকারণে কষ্ট পাবে মানুষটা। হয়তো বন্ধুকেও আর বন্ধু বলে মনে করবে না।'

'তুহিন যদি অমন কিছু করে বসতো, তুই সহজ হয়ে তা মেনে নিতিস?'

'জানি না। তবে চেষ্টা করতাম। কারণ তাতে আমার কোনো ক্ষতি হতো না। তাছাড়া কিছু কিছু ঘটনা ঘটে যায় যা মানুষ যুক্তি বুদ্ধি বা শক্তি দিয়েও এড়াতে পারে না, কিংবা হয়তো এড়াতে চায় না বলেই পারে না।'

সচেষ্ট প্রয়াসে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলো রূপসা, 'তোকে দুটো অনুরোধ করবো?'

'কি?'

'এতোদিন যখন বলিসনি, তখন তুহিনকে তুই আর এ ব্যাপারে কিছু বলিস না। অহেতুক জটিলতা বাড়িয়ে সতিাই কোনো লাভ নেই।' নিচের ঠোঁটের একটি প্রান্ত দাঁত দিয়ে চেপে এক মুহূর্ত নির্বাক হয়ে রইলো রূপসা। তারপর যেন কি এক নিদারুণ যন্ত্রণায় হৃৎপিণ্ডটাকে বিষে নীলাক্ত করে অস্ফুটে বললো, 'আর সুদূর যদি ফের কখনও এখানে আসে, তুই ওর মুখের সামনে দরজা বন্ধ করে রাখিস না। ওকে ভেতরে এনে বসাস। ও জল চাইলে এক গ্লাস জল এনে দিস। আব যদি পারিস, ওর সঙ্গে একটু মিষ্টি করে কথা বলিস। প্লিজ।'

অফিসে না গিয়ে প্রায় সারাটা দিন একা একা ছটফট করে কাটালো রূপসা। গত কয়েকদিন ধরেই রাতে ঠিকমতো ঘুম হচ্ছে না। আর ঘুম না এলে যা হয়—অজস্র চিন্তা তখন ডালপালা ছড়িয়ে জটিল অরণ্যের মতো সমস্ত অস্তিত্বকে গ্রাস করতে এগিয়ে আসে, পথ খুঁজতে গিয়ে বারবার পথ হারাতে হয়, সঠিক পথের সন্ধান পেলেও সন্দেহ মেটে না—ফলে ক্লান্তি আসে। ক্লান্তি জমে ওঠে স্নায়ুতে পেশীতে। ভালো লাগে না, কিছুই ভালো লাগে না, কিছুতেই না। সবকিছু ভেঙেচুরে তছনছ করে দিতে ইচ্ছে করে। চলে যেতে ইচ্ছে করে। চলে যেতে ইচ্ছে করে অনেক অনেক দূরে, যে দিকে দু চোখ যায়। কিন্তু কোথায়, কাব কাছে? এইসব অসহায় পরিস্থিতিতেই কি মানুষ ঈশ্বরে আস্থা রেখে শান্তি পেতে চায়? সবই ভবিতব্য বলে নির্দ্বিধায় মেনে নেয়? কিন্তু সেটা তো সমাধান নয়, সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া। নিজের ওপরে আস্থা হারিয়ে ফেলা। হেরে যাওয়া।

কিন্তু 'পরাজয়' শব্দটা যে বড়ো নিষ্ঠুর, বড়ো কঠিন! আরও কঠিন শোভন-ভঙ্গিতে তা স্বীকার করে নেওয়া। শেষ অব্দি তুমি কি তাহলে হেরে যাবে, রূপসা?

জেদি রূপসার বুকের ভেতর থেকে ক্লান্ত রূপসা তখন মুখ বাড়িয়ে বলে, 'অযথা জীবনের জটিলতা আর বাড়িও না। এখনও সময় আছে। এখনও তুমি অনিশ্চয়তার দিগন্ত থেকে ফিবে আসতে পারো, রূপসা। আর বেশি দিন হয়তো এ সুযোগ তোমার অপেক্ষায় থাকবে না।'

রূপসা তখন দিশেহারা হয়ে ওঠে। বিছানায় শুয়ে থাকতে অসহ্য লাগে। বারবার ঘড়ি দেখে মনে মনে হিসেব কষে, আর কতোক্ষণে ভোর হবে। আর সেই

অবসরে মাথার মধ্যে ঝড়ের গতিতে একটানা ছুটে চলে স্মৃতির দ্রুতগামী মেল ট্রেন।

বাবা-মা ওর সব কথা জানেন না। জানলেও, তাঁরা নিজেদের সিদ্ধান্ত ওর ওপরে জোর করে চাপিয়ে দিতে চাইতেন না। তবে রূপসার মুখ দেখে ওঁরা নিশ্চয়ই অনুমান করে নিয়েছেন, কোথাও একটা গোলমাল রয়ে গেছে। বাবা একদিন বলেছিলেন, 'জীবনে ভুল সবাই করে, কিন্তু সবাই তা স্বীকার করতে পারে না। নিজের কাছেও না। অথচ তা পারলে, ভুলটা শুধরে নেবার পথ খোঁজা যায়।'

অনুভব বলেছিলো, ওরা রুমালে চোখের জল মুছে বলবে, রূপসা এক আদর্শ ভারতীয় নারী।

অথচ সোনালি—সোনালি সেদিন বলেছে, 'তুই ওর সম্পর্কে যা জানিস, সেটাই শেষ কথা নয়।'

তাহলে? তাহলে এখন কি সিদ্ধান্ত নেবে রূপসা? সুদূরের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলার কথা ভাবতে গেলে আজও ওর বুকের ভেতরটা মুচড়ে ওঠে। অথচ ও বুঝতে পারে, এভাবে আর বেশি দিন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না—তা উচিতও নয়। দিনে দিনে দিনান্তের গ্লানি ক্রমশ আবর্জনার স্তূপের মতো একটু একটু করে বেড়ে উঠবে, ফলে দুর্গন্ধে নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসবে, তিক্ততা বাড়বে, প্রেম হারিয়ে যাবে অনিবার্য রূঢ়তায়।

পরপর কয়েকটা নির্ঘুম রাতের অভিজ্ঞতা রূপসাকে রীতিমতো আতঙ্কিত করে তুলেছিলো। রাতগুলোকে মনে হচ্ছিলো বিভীষিকাময় দুঃস্বপ্নের মতো। তাই গতকাল অফিস থেকে ফেরার পথে ও কয়েকটা ঘুমের বড়ি কিনে এনেছিলো। কিন্তু তাতেও খুব একটা কাজ হয়নি। বারবার তন্দ্রা এসেছে, আর ভেঙে ভেঙে গেছে। আধো ঘুম আধো জাগরণের সেই অস্পষ্ট মুহূর্তগুলোতে রূপসার বারবার শুধু মনে হয়েছে, আর দেরি নয়--অবিচল হয়ে একটা শেষ সিদ্ধান্ত এবারে নিতেই হবে। তা সে যতোই কঠিন হোক না কেন।

তারপর প্রতিদিনকার মতো ভোর হয়েছে। বিছানা ছেড়ে উঠে একটা প্রাণহীন, অনুভূতিহীন রোবটের মতো রূপসা সকালের কাজকর্মগুলো সেরে নিয়েছে। সুদূরকে ব্রেকফাস্ট সাজিয়ে দিয়ে, নিজে শুধু এক কাপ চা নিয়ে অনড় হয়ে বসে থেকেছে বিপরীত দিকের চেয়ারে। সুদূর খেতে খেতে একবার আড় চোখে তাকিয়েছে ওর দিকে। তারপর, যেন কর্তব্যের খাতিরেই, ঔৎসুকাহীন কণ্ঠে প্রশ্ন করেছে, 'তুমি খাচ্ছো না যে?'

'পরে খাবো,' সংক্ষেপে জবাব দিয়েছে রূপসা।

'স্নানও তো করোনি।'

'না।'

'অফিসে যাবে না?

'না।'

'কেন, শরীর খারাপ নাকি? চোখ দুটো তো লালচে লাগছে,' এতোক্ষণে সরাসরি ওর মুখের দিকে তাকায় সুদূর, 'জ্বর হয়নি তো?'

'না,' রূপসা তবু নির্বিকার।

'তবে?'

রূপসা কোনো জবাব দেয় না।

'অন্য কোথাও যাবে নাকি?'

'না।'

'তাহলে?'

রূপসার বলতে ইচ্ছে করছিলো, 'কৈফিয়ত দিতে আমার ভালো লাগে না, সুদূর। অনর্থক কথা বাড়িও না। প্লিজ!' কিন্তু অতি কষ্টে নিজেকে প্রশান্ত রেখে ও বলছে, 'অফিসে যেতে ইচ্ছে করছে না, তাই যাবো না। তুমি খাও, আমি বাথরুমে যাবো।'

সুদূর আর কিছু জিগেস করেনি। ও অফিসে বেরিয়ে যাবার আগেই অনর্থক বাথরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করেছিলো রূপসা। এবং সেখানে, সেই একান্ত নির্জনে, চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতে দিতে ও স্থির করেছিলো—আর দেরি নয়, শেষ সিদ্ধান্ত ওকে এবারে নিতেই হবে। এবং তা আজই।

অথচ তারপর প্রায় সারাটা দিনই কেটে গেছে প্রখর অনিশ্চয়তায়। সময় যতো এগিয়েছে রূপসা ততোই অস্থির হয়ে উঠেছে, ততোই বিপন্ন বোধ করেছে। কিন্তু কিছুতেই কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেনি। একবার ভেবেছে, চিরদিনেব মতো কলকাতার পাট তুলে দিয়ে দূরে কোথাও চলে যাবে। সম্ভব হলে বিদেশে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়েছে মা বাবাকে এখানে ফেলে রেখে দূরে কোথাও চলে যাওয়া ওর পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়, উচিতও নয়। রূপসা ছাড়া ওঁদেব আর কেউ নেই। দূরে চলে গেলে ওঁদের প্রয়োজনের সময় কাছে থাকা যাবে না। অদূর ভবিষ্যতে ওঁদেরও নিজের কাছে নিয়ে যাওয়াটা কতোদূর সম্ভব হবে, তা এই মুহূর্তে একেবারেই অস্পষ্ট। সুদূরের সঙ্গে যৌনতাহীন দাম্পত্য সম্পর্ক হয়তো কিছু দূর পর্যন্ত মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু সেখানে সব চাইতে বড়ো বাধা সুদূরের হীনম্মন্যতা। মানুষটা কিছুতেই ওকে শান্তিতে তিষ্ঠোতে দেবে না। তাছাড়া অতীতকালের যুবতী বিধবাদের মতো রূপসাও কি দেহ ও মনের দাবীকে উপেক্ষা করে বঞ্চিত হয়ে কাটিয়ে দিতে পারবে সারাটা জীবন? সেটা সম্ভব হলেও বারবার নিজের মনে এ প্রশ্ন কি জাগবে না যে কেন এই অহেতুক কৃচ্ছ্রসাধন? কি অর্থ এই অর্থহীন আত্মত্যাগের? তখন যদি স্বেচ্ছায় ও কাউকে নিজের জীবনে ডেকে আনে কিংবা অতর্কিতের পথ ধরে কেউ যদি ওর দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়, তখন জটিলতা কি আরও বাড়বে না?

অবিশ্যি সুদূর যে অক্ষম নয়, তা এখন প্রমাণিত। সোনালির স্বীকারোক্তিই তার সব চাইতে বড়ো প্রমাণ। কিন্তু রূপসার কাছে সে আজও এক অসমর্থ পুরুষ। ভেজিটেবল। এর নিশ্চয়ই কোনো গভীর তাৎপর্য আছে। কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ আছে। ওর অক্ষমতাটা এ ক্ষেত্রে মানসিক। সঠিক চিকিৎসা হলে হয়তো ওর পক্ষে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা অসম্ভব নয়। কিন্তু সে ব্যাপারে ওকে রাজি করানো আজও সম্ভব হয়নি। অন্তত রূপসা তা পারেনি। তাহলে বাকি রইলো আর একটি মাত্র পথ। বিচ্ছেদ। ডিভোর্স। সমস্ত আন্তরিক আয়োজনের

এক নিষ্ঠুর পরিসমাপ্তি।

কিন্তু তারপর?

রূপসা বাস্তবকে অস্বীকার করতে পারে না। ও জানে, ডিভোর্সের পর ও হয়তো আবার বিয়ে করবে। নতুন সংসার হবে। সন্তান আসবে। সুদূরকে হারাবার বেদনা তখন আর ততোটা তীব্র বলে মনে হবে না। তবে সুদূর থাকবে, ভীষণভাবে বেঁচে থাকবে ওর হৃৎপিণ্ডের গভীরে। মাঝে মাঝে তাতে রক্তক্ষরণ হবে, কিন্তু কেউ তা জানবে না। কোনোদিনও না।

আর সুদূর? হয়তো সেও ফের বিয়ে করে স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। সন্তান তার কোলে আসবে না, কিন্তু এমন দুঃসহ টেনশনেও তাকে আর ভুগতে হবে না কোনো দিন। অতএব এটাই সব চাইতে ব্যাশনাল সলিউশন। এতে দু পক্ষেরই মঙ্গল।

কিন্তু সত্যিই কি তাই হবে? যদি না তা নয়?

সুদূরের চরিত্র যে বড়ো দুর্বল! রূপসাকে হারিয়ে ও যদি বিশৃঙ্খল হয়ে ওঠে? যদি বোকার মতো ভেঙে তছনছ করে দেয় নিজের জীবনটাকে? যদি খারাপ মেয়েমানুষ কিংবা কোনো মারাত্মক নেশার জালে আচ্ছন্ন করে ফেলে নিজেকে?

করলে, করবে। তাতে রূপসার কোনো দায়-দায়িত্ব থাকতে পারে না। ও চেষ্টা করেছে, বহু চেষ্টা করেছে সুদূরকে স্বাভাবিক করে তোলার। কিন্তু সুদূর ওর সঙ্গে কোনো সহযোগিতা করতে চায়নি, মূর্খের মতো নিজেকে গুটিয়ে রেখেছে। কাজেই ডিভোর্সের পর সে যদি নিজের ধ্বংস নিজেই ডেকে আনে, তাতে রূপসার কোনো দায়িত্ব থাকবে না। তাতে ওর কিছুই এসে যাবে না।

কিন্তু সত্যিই কি তাই? তোমার কি তাতে কিছুই এসে যাবে না, রূপসা? ডিভোর্স হলেই কি সমস্ত সম্পর্ক, পারস্পরিক সমস্ত চিন্তা-ভাবনার অবসান হয়ে যাবে এক নিমিষে?

ভাবতে ভাবতে কান গরম হয়ে ওঠে রূপসার। ফের বেসিনের কল খুলে চোখে মুখে জলের ঝাপটা দেয় ও। ঘাড়ে গলায় কানে ভিজে হাতের স্পর্শ লাগায়। বুকের মধ্যে কে যেন ক্রমাগত অসহায় কণ্ঠে চিৎকার করছে, 'বিদায় ভালোবাসা, বিদায়!' যে বাতাস ফুল ফোটানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো, আজ তা বিফল দীর্ঘশ্বাস হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে মহাশূন্যের অনন্ত বিস্তারে। হারিয়ে যাচ্ছে নিঃসঙ্গ রণভূমির বিক্ষত বেদনায়। এখন অবশিষ্ট শুধু ক্লান্ত অবসাদ।

চোখ ফেটে জল এলো রূপসার।

ঘড়িতে বেলা আড়াইটে। আকুল উদ্বেগে টেলিফোনের ডায়াল ঘুরিয়ে রিসিভারে কান রাখলো ও।

'সিগমা,' রিসেপশনিস্টের রিনরিনে কণ্ঠস্বর।

'অনুভব, অনুভব সেন।'

'প্লিজ হোল্ড অন। দা লাইন ইজ এনগেজড।'

কতোক্ষণ, আরও কতোক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে অনুভব? তুমি কি জানো না, অপেক্ষা করার মতো ধৈর্য আমার চরিত্রে কস্মিন কালেও নেই? তুমি কি জানো না,

এই মুহূর্তে তোমাকে কি ভীষণ দরকার আমার?'

'হ্যালো,' নির্লিপ্ত কণ্ঠস্বর অনুভবের।

'অনুভব?'

'কথা বলছি।'

'অনুভব, আমি রূপসী।'

'বলো,' একটুও অবাক হলো না অনুভব। যেন ও জানতো, রূপসা ওকে ফোন করবে। আজ। এখন।

'তুমি কি খুব ব্যস্ত?'

'এতোক্ষণ ব্যস্ত ছিলাম। তোমার ফোনটা আসার আগে পর্যন্ত।'

'এখন?'

'তুমি কি জানো না, তোমার ডাক এলে অন্য কোনো ব্যস্ততা আমাকে ছুঁতে পারে না?'

'তোমাকে আমার ভীষণ দরকার, অনুভব। ভীষণ!'

'কখন?'

'আজ। এখুনি।'

'আমি কি তোমার অফিসে যাবো?'

'আমি অফিসে নেই।'

'তবে?' অনুভব অবাক হলো।

'আমি বাড়ি থেকে বলছি।'

'শবীর ভালো আছে তো?' অনুভব এবারে উদ্বিগ্ন, 'কি হয়েছে তোমার?'

'জানি না, আমি কিচ্ছু জানি না!' ছোট্ট একটু নীরবতা মুহূর্তের জন্যে ওদের বিচ্ছিন্ন করে রাখে। তারপরেই বুলবুলির মতো মিহি সুরে রূপসার কণ্ঠ ভেসে আসে আবার, 'তুমি কি আজ একটু সময় করে আমার কাছে আসতে পারবে?'

'পারবো।'

'কখন?'

'ধরো, সাড়ে পাঁচটা?'

'রাবিশ! আরও অতোক্ষণ?'

'সেদিনই তো তুমি বলেছো, পাঁচটার আগে হলে ... '

'সে তো সেদিনের কথা! দিন কি বদলায় না, অনুভব?'

'ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। এখুনি। খুশী তো?'

'অনুভব—'

'বলো।'

'আমি যে আর পারছি না, অনুভব!'

'ডোন্ট বি সিলি। তুমি একটু অপেক্ষা করো, কেমন?'

'এসো। তাড়াতাড়ি। যতো শীগগিরি সম্ভব। মনে থাকবে?'

'ইয়েস, মাই ডিয়ার।'

খানিকক্ষণ দুজনেই নিশ্চুপ। তারপর রূপসা অস্ফুটে জিগেস করে, 'তুমি কি

লাইনটা ছেড়ে দিয়েছো, অনুভব?'

'না, আগে তুমি ছাড়বে।'

'আমার ইচ্ছে করছে না ছাড়তে। তুমি বরং কিছু বলো অনুভব, আমি শুনবো। তুমি কেন বুঝতে পারছো না, আমার যে কি ভীষণ একা লাগছে!'

'নাউ—বি আ গুড গার্ল, রূপসী! তুমি রিসিভার রাখো। আমি দেখতে দেখতে তোমার কাছে পৌঁছে যাবো। ততোক্ষণে তুমি বরং একটু ফ্রেশ হয়ে নাও, কেমন?'

'পারবো না।'

'রোদটা পড়লে আমরা বেড়াতে যাবো।'

'আমি কোথাও যাবো না। তুমি যেও।'

'তুমিও যাবে।'

'জানি না। আমি রাখছি।'

মুহূর্তের ব্যবধানে সংযোগ ছিন্ন হলো। রূপসা তবু উঠলো না। বাথরুমে গিয়ে ফ্রেশ হলো না। মাথায় চিরুনি ছোঁয়ালো না। মুখ পরিষ্কার করে, শরীরে সুগন্ধি ছড়িয়ে, পোশাকও বদলালো না। আধশোয়া হয়ে আগের মতোই এলিয়ে রইলো বিপর্যস্ত শয্যায়।

এখুনি ডোরবেল বাজবে। অনুভব আসবে। একরাশ আকুলতা নিয়ে ওকে জিগেস করবে, 'কি হয়েছে, রূপসী?' তখন তাকে কি জবাব দেবে ও? কই, এখনও তো কিছু হয়নি! তবে চরম কিছু হওয়ার প্রস্তাবনায় চঞ্চল কিংবা অস্থির হয়ে উঠেছে ওর সমস্ত সত্তা। ঝড়ের সংকেত পেলে যেমন উদ্বেগে অশান্ত হয়ে ওঠে আকাশ বাতাস সমুদ্র আর সবুজ অরণ্য।

কিছু কিছু ক্লান্ত সময় উদ্বেগে আকীর্ণ হলেও পলকে উধাও হয়ে যায়। কিছু কিছু বিপন্ন সময় ক্লান্তিতে অবসন্ন হলেও উদ্বেগের ডানায় ভর রেখে অনায়াসে বিদ্যুতের গতি খুঁজে পায়।

অবশেষে টংলিং সুরে দরজার ঘন্টি বাজলো। রূপসা ম্লান মুখে দরজা খুলে এক পাশে সরে দাঁড়ালো। এবং ভেতরে ঢুকে ওর দিকে একটা কাজুর প্যাকেট এগিয়ে ধরলো অনুভব, 'সিনসিয়ারলি ইওরস!'

'থ্যাংকস,' এক হাতে প্যাকেটটা নিয়ে অন্য হাতে দরজায় ল্যাচ লাগালো রূপসা। অনুভব জানে, আজ ওর মন ভালো নেই। অনুভব জানে, ও কাজু ভালোবাসে। তাই মনে করে নিয়ে এসেছে। তাই এই সামান্য উপহারই এক অসামান্য ভালো লাগার রেশ হয়ে সোহাগের মতো মৃদু সৌরভ ছড়িয়ে দিয়েছে রূপসার অনুভূতিতে।

অনুভবকে লিভিংরুমে বসিয়ে রূপসা চায়ের জল বসালো। ওখানে কেউ বসলে, কাজের সঙ্গে সঙ্গে কথাবার্তা চালাতেও কোনো অসুবিধে হয় না। অনুভব অনর্গল কথা বলছে। জবাবের অপেক্ষা না করে। অফিসের কথা, বাড়ির কথা, অর্থহীন কথা। আনলাইক অনুভব, ভাবলো রূপসা। আসলে ও আমাকে অন্যমনস্ক করে রাখতে চাইছে। আমার মনকে হালকা করে তোলার চেষ্টা করছে। কিন্তু তা হবার নয়, অনুভব! আজ একটা শেষ সিদ্ধান্ত আমাকে নিতেই হবে। আজই। এবং সেই সিদ্ধান্তের ওপরেই নির্ভর করবে আমার ভবিষ্যৎ জীবন।

চায়ের কাপ থেকে ঠোঁট তুলে রূপসার দিকে তাকালো অনুভব, 'এই উলমি ঝুলমি চেহারায় তোমাকে কিন্তু দারুণ লাগছে!'

পরিবেশ হালকা করার চেষ্টা করছে অনুভব। রূপসা জোর করে ঠোঁটে হাসি ফোটালো, 'বাজে কথা।'

'মোটেই না।'

'নির্লজ্জ ফ্ল্যাটারি।'

'ভুল।'

'তবে?'

'নির্জলা সত্যি। মনে হচ্ছে, দ্য মোস্ট ডিজারেবল উওম্যান ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। অন্তত আমার চোখে।'

'তুমি ইচ্ছে করে ভুল করছো। ওটা 'ডিজারেবল' নয়, 'মিজারেবল' হবে।'

'আই বেগ টু ডিফার। আমার কিন্তু ভীষণ আদর করতে ইচ্ছে করছে তোমাকে।'

'কিন্তু করবে না।'

'প্রায়ই করি। তুমি জানতে পারো না।'

'এসব কথা এখন আমার ভালো লাগছে না, অনুভব! কোনো কথাই শুনতে ইচ্ছে করছে না।'

'তাহলে শুধু আর একটা কথা বলি?'

'কি?'

'আমি স্বর্গ বা নরকের অস্তিত্ব মানি না। দেবতা বা অপদেবতায় আমার আস্থা নেই। জন্মান্তরও আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু সত্যি যদি পুনর্জন্ম বলে কিছু থাকে তাহলে আমি চাইবো, প্রতি জন্মে তোমার সঙ্গে আমার যেন এমনি কোনো আশ্চর্য বন্ধন থাকে—যে বন্ধনকে সম্পর্কের সংজ্ঞা দিয়ে সীমাবদ্ধ করা যায় না। তার চাইতে প্রথাগত কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আমি কিছুতেই চাইবো না।'

'কেন?'

'নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় প্রাত্যহিকতার মালিন্য জমে। তোমার আমার সম্পর্কে কোনো মালিন্যের ক্লান্তি বা তিক্ততা আমি সহ্য করতে পারবো না।'

'তুমি এসকেপিস্ট, তুমি ভীরু।'

'এতোদিন জানতাম, আমি বোকা। এবারে তার সঙ্গে আরও দুটো বিশেষণ যোগ হলো। নেভার মাইণ্ড!' মৃদু হেসে উঠে দাঁড়ালো অনুভব, 'অনেক হয়েছে। নাউ প্লিজ গেট রেডি।'

'কেন?'

'চলো, একটু বেড়িয়ে আসি।'

'না, আজ আমি বেরুবো না অনুভব। প্লিজ, আমাকে জোর কোরো না।'

'কেন, শুধু শুধু বাড়িতে বসে থেকে মন খারাপ করে কি লাভ?'

'তুমি কিছু বুঝতে পারছো না, অনুভব। তুমি জানো না, আজ আমি নিজের সঙ্গে একটা শেষ বোঝাপড়া করে নিতে চাই।'

'আজই?' অনুভব পূর্ণদৃষ্টিতে রূপসার দিকে তাকালো, 'এতোদিনেও তুমি যা করতে পারোনি, আজ হঠাৎ চট করে তা করতে গেলে কোথাও যদি কোনো ভুল থেকে যায়?'

'অনুভব, আজ হোক বা কাল হোক একটা সিদ্ধান্ত আমাকে নিতেই হবে। দেন হোয়াই নট টু ডে?'

'বেশ,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো অনুভব। 'কিন্তু আমি এ ব্যাপারে কিভাবে তোমাকে সাহায্য করতে পারি?'

'তুমি কেন, কেউই কিছু করতে পারে না। তুমি বরং এখন এসো।'

'সেকি! তাহলে আমাকে ডেকে পাঠালে কেন?'

'তোমাকে যখন ফোন করেছিলাম তখন কাউকে আমার ভীষণ দরকার ছিলো। আরও পরিষ্কার করে বলা যায়, আই নিডেড ইউ। তুমি সব কাজ ফেলে রেখে আমার কাছে ছুটে এসেছো, ইটস সো কাইণ্ড অফ ইউ। থ্যাংক ইউ অনুভব, থ্যাংক ইউ ফর এভরিথিং।'

'ইউ আর অলওয়েজ ওয়েলকাম,' ম্লান হাসলো অনুভব।

এ সেই পুরনো রূপসী। আনকমপ্রোমাজিং। আ বাণ্ডল অফ কনট্রাডিকশনস। এখন ওকে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করা অর্থহীন।

'তুমি কি কিছু মনে করলে? আমার কথায়?'

'এ সমস্ত কথাবার্তা—এগুলো পার্ট অফ ইওর ক্যারেকটার। এগুলোকে ফেস ভ্যালু অনুযায়ী নিলে, বহুদিন আগেই তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা চুকে যেতো। না, আমি কিছু মনে করিনি।'

'আসলে মনে করলেও আমার কিছু করার নেই, অনুভব। এখন আমি একটু একা থাকতে চাই। অল অ্যালোন।'

'ঠিক আছে।' দরজার একেবারে কাছাকাছি গিয়েও ঘুরে দাঁড়ালো অনুভব, 'একটা কথা ছিলো।'

'কি?'

'তুমি যদি অনুমতি দাও, সুদূরকে আমি কলকাতার সব চাইতে বড়ো ডাক্তারদের দেখাবো। তাঁরা সাজেস্ট করলে, ওকে বম্বে দিল্লি বা ম্যাড্রাসে নিয়ে যাবো। দরকার হলে বিদেশেও। ওকে রাজি করাবার ভার আমার।'

'না।'

'না!' অনুভব বিস্মিত হলো, 'কেন?'

'আমি তোমাকে আর এক্সপ্লয়েট করবো না।'

'এক্সপ্লয়েট! একে তুমি এক্সপ্লয়টেশন বলো? ছি, রূপসী। আমি না তোমার বন্ধু?' অনুভব প্রায় ধমকে ওঠে, 'বন্ধুর প্রয়োজনে বন্ধু যদি পাশে এসে না দাঁড়ায়, তাহলে কি মূল্য আছে সে বন্ধুত্বের?'

'তুমি আমাকে ভুল বুঝছো, অনুভব!' যেন অনেক দূর থেকে রূপসার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'আসলে ... আসলে এমনিতেই অনেক ঋণ জমে গেছে। তোমার কাছে আমি ঋণের বোঝা আর বাড়াতে চাই না।'

'একে ঋণ বলে না।'

'বলে। কৃতজ্ঞতাও এক ধরনের ঋণস্বীকার।' রূপসা প্রায় ফিসফিসিয়ে বলে, 'তুমি কি জানো না, মেয়েদের অনেক ঋণই শরীর দিয়ে শোধ করতে হয়?'

মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে যায় অনুভব।

'আমার সম্পর্কে তোমার কি শুধু ওই ধারণা?'

'না। কিন্তু তা না হলে আমি যে শান্তি পাবো না, অনুভব!' রূপসার গলা স্পষ্টতই কেঁপে ওঠে, 'আমি কি পাথর?'

'বেশ!' লাচ ঘুরিয়ে দরজাটা ঈষৎ খুলেও ফের ঘুরে দাঁড়ায় অনুভব, 'তাহলে আজ, এই মুহূর্তে, আমি সমস্ত ঋণ থেকে চিরদিনের মতো তোমাকে মুক্তি দিয়ে গেলাম।'

'অনুভব!'

রূপসার কণ্ঠস্বরে কি অনুনয়ের স্পর্শ ছিলো? না রূপসী, এ সুর তোমার কণ্ঠে মানায় না। অনুভবের বুকের মধ্যে রক্তক্ষরণ হয়। চকিতে ফের রূপসার দিকে ঘুরে দাঁড়ায় সে।

রূপসা তখন দাঁড়িয়ে রয়েছে আবিষ্টের মতো। ঠোঁট দুটি কাঁপছে মৃদু মৃদু। দুই বাহু সম্পূর্ণ প্রসারিত। চোখের কোলে ঝিলমিলে অশ্রুবিন্দুর সুস্পষ্ট আভাস। জীবনে এই প্রথম অশ্রুমুখী রূপসাকে দেখলো অনুভব। পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতেই রূপসা ঝাঁপিয়ে পড়লো তার বুকে। দু হাতে তাকে নিবিড় করে আঁকড়ে ধরলো যেন কি এক কদ্ধ আক্রোশে।

'আমি পারবো না, অনুভব! সুদূরকে আমি কিছুতেই ছেড়ে দিতে পারবো না! কিছুতেই না।'

হায়, হায় অনুভব! অন্য এক পুরুষের জন্যে তোমার বুকে আকুল হয়ে কাঁদছে রূপসী। অনুভব, এই জন্যেই কি বেঁচে থাকা?

ধীরে ধীরে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় অনুভব। গুঁড়ো গুঁড়ো চুলগুলোকে সরিয়ে দেয় ওর ছোট্ট কপাল থেকে। চুমু দেয় অকৃত্রিম মমতায়। ওর কপালে চোখে গালে। ওর ঠোঁটে চিবুকে গলায়। এক প্রবল অস্থিরতায় অনুভবের মুখ আরও নিচে নেমে আসে, আশ্রয় খোঁজে। আর সেই মুহূর্তে যেন এক প্রবল ঝাঁকুনিতে আচমকা ঘুম ভেঙে সজাগ হয়ে ওঠে রূপসা। প্রাণপণে অনুভবের মুখখানা ও সজোরে চেপে ধরে নিজের বুকের কোমল ও কবোষ্ণ বন্ধুরতায়। দু চোখ কখন যেন প্রত্যাশায় বন্ধ হয়ে আসে। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বারবার ও অস্ফুট স্বরে শুধু বলে, 'আমাকে তুমি মেরে ফ্যালো, অনুভব! মেরে ফ্যালো, প্লিজ!'

ওরা কেউ খেয়াল করেনি, ল্যাচমুক্ত দরজাটা ঈষৎ উন্মুক্ত ছিলো। এই সময়, যখন অনুভব আর রূপসার কাছে সমস্ত পৃথিবী লুপ্ত হয়ে গেছে, তখন মৃদু ধাক্কায় দরজাটা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে হঠাৎ সুদূর ভেতরে এসে ঢুকলো। রূপসার শরীর ভালো নেই সন্দেহ করে তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছিলো সে।

আচমকা, যেন তৃতীয় নয়নের সাহায্যে, তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি অনুমান করে সজাগ হলো রূপসা। দেখলো, দু চোখের দৃষ্টিতে রাশি রাশি বিস্ময় আর প্রচ্ছন্ন

ঈর্ষা নিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সুদূর। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় ওরা দুজনে বিচ্ছিন্ন হয়ে দাঁড়ালো। সুদূর মৃদু হাসলো রূপসার দিকে তাকিয়ে। তারপর ওদের পাশ দিয়ে লিভিং রুমে যেতে যেতে বললো, 'আমি কিছু মনে করি নি। তবে ব্যাঘাত ঘটাবার জন্যে দুঃখিত।'

'সুদূর,' অনুভব শুকনো গলায় ডাকলো।

'বলতে পারিস,' সোফায় বসে জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে জবাব দিলো সুদূর। ওদের দিকে না তাকিয়ে।

'তুই যা দেখেছিস তা মিথ্যে নয়। তবে এর পেছনে কোনো পরিকল্পনা ছিলো না।' অনুভব বললো, 'এটা একেবারে হঠাৎ ... বলতে পারিস একটা অ্যাকসিডেন্ট।'

'জাস্ট ওয়ান অফ দোজ অ্যাকসিডেন্টস, তাই না?' পর্দা সরিয়ে ভেতরের ঘরে পা বাড়ায় সুদূর, 'কিন্তু আমি তোদের দোষ দিচ্ছি না।'

'তুই হয়তো ... '

'থাক, যথেষ্ট হয়েছে!' অনুভবকে থামিয়ে দেয় রূপসা। 'সাফাই দিয়ে নিজেকে তুমি ছোটো কোরো না, অনুভব। তোমার যা বলার, তুমি বলেছো। এরপর ওর যা ভাবার, ও ভেবে নিক। তবে ও যাই ভাবুক না কেন, তাতে আমার কিছুই এসে যাবে না। আই ডোন্ট কেয়ার এনি মোর। হোয়াই শুড ইউ?'

'কিন্তু ... '

'ব্যাস,' হাত তুলে ফের ওকে থামিয়ে দেয় রূপসা। 'তুমি এখন এসো, অনুভব। পরে এক সময় আমি হয়তো তোমার সঙ্গে যোগাযাগ করবো।'

'বেশ,' থমথমে মুখে রূপসার দিকে তাকায় অনুভব। 'চলি তাহলে। জানি না, হয়তো তোমার খুব ক্ষতি করে গেলাম।'

'এসো। মিথ্যে ভেবে মন খারাপ কোরো না।'

দরজা বন্ধ করে লিভিংরুমের সোফায় বসে একটা ম্যাগাজিন তুলে নেয় রূপসা। অন্যমনস্ক হাতে পৃষ্ঠা উলটে যায় একের পরে এক। মাথার আনাচে কানাচে, শরীরের প্রতিটি কোষে, প্রতিটি সূক্ষ্ম তন্তুতে কেমন করে যেন জেগে উঠেছে উদ্ধত এক তাণ্ডব কোলাহল। রক্তের বিন্দুতে বিন্দুতে আগ্নেয়গিরির সুতীব্র আলোড়ন। বুকের মধ্যে দুন্দুভি বাজছে একটানা। কানের ভেতরে অনবরত ঝাঁঝাঁ শব্দ।

রূপসার ঠোঁট দুটি ক্রমশ দৃঢ় হয়ে ওঠে। না, আর কোনো ভাবনা নয়। আর পেছনের দিকে ফিরে তাকানো নয়। আমার সিদ্ধান্ত নেওয়া শেষ। দ্য আলটিমেট ডিসিশন।

সুদূর বেডরুমের পর্দা সরিয়ে লিভিংরুমে এসে ঢোকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ বিস্ময়ে লক্ষ্য করে রূপসাকে। রক্তিম মুখ, কপালে বিন্দু বিন্দু স্বেদলেখা, ঈষৎ স্ফুরিত অধর। ফুলে উঠেছে ওঁর নাকের পাতা দুটি। বিক্ষুব্ধ দুটি ভরাট বুক ওঠানামা করছে আমন্ত্রণী আহবানের মতো। কি ভাবছে ও এখন? কি ভাবছো তুমি, রূপ? তুমি জানো না, তুমি আমার ভালোবাসা। আমি আকাশের মতো ভালোবাসি তোমাকে। তুমি জানো না, তোমাকে কি অপরূপ লাগছে এই মুহূর্তে। যে কোনো পুরুষের রক্তে মাতন তোলার মতো অসাধারণ। না, অনুভবের কোনো

দোষ নেই।

আচমকা সুদূরের দু চোখে দুটো নতুন আলোর শিখা ঠিকরে ওঠে। উত্তাপময় আলো। একাগ্র দৃষ্টিতে রূপসার দিকে তাকিয়ে থাকে সে। কি নিদারুণ ঐশ্বর্যময় শরীর রূপসার! কি প্রচণ্ড ওর আকর্ষণ! অনুভবের স্পর্শে ওর দেহে এখন পারিজাতের সুগন্ধি আবেদন। রূপসা এখন পরস্ত্রীর মতো দুর্নিবার। অবৈধ আনন্দেব মতো মোহময়।

বুকভরা অনিবার্য প্রত্যয় নিয়ে, ধীব অথচ সুনিশ্চিত পদক্ষেপে, একটু একটু করে রূপসার দিকে এগিয়ে যায় সুদূব।